"স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই;
নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই"

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস - ২০২৪

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য
খাদ্য মন্ত্রণালয়

"স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই;
নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই"

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস - ২০২৪

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য
খাদ্য মন্ত্রণালয়

‘আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে,
আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের
অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।’

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং সুস্থ সবল জাতি গঠনে নিরাপদ খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই।’

-শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই:
নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই"

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪

স্মরণিকা

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রকাশকাল

০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

ডিজাইন

টিআর কর্পোরেশন
মোঃ ছাদিকুর রহমান রিপন
মোবাইল: ০১৬৮০ ৮৭৮ ১৮৪

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি
সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব মো. আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

জনাব আব্দুন নাসের খান
সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

সম্পাদনা পরিষদ

১	জনাব নাজমা বেগম সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	আহবায়ক
২	জনাব মোঃ কাওছারুল ইসলাম সিকদার অতিরিক্ত পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৩	জনাব রেবেকা খান উপপরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৪	জনাব বি. এম. মশিউর রহমান উপপরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৫	জনাব উম্মে সালিক রুমাইয়া এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৬	জনাব ফারজানা ইয়াসমিন সহকারী সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৭	জনাব মোছাঃ রৌশন আরা বেগম নিরাপদ খাদ্য অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৮	জনাব সুমেন মজুমদার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৯	জনাব অভিরূপ সাহা চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১০	জনাব এস. এম. শিপন, গবেষণা কর্মকর্তা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
১১	জনাব মোঃ আসলাম উদ্দিন মনিটরিং অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
১২	জনাব আবুল হাসনাত জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য সচিব ও সম্পাদক

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৯ মাঘ ১৪৩০
০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

বাণী

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৪' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই; নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নেই' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের কোনো বিকল্প নেই। নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়; তেমনি অনিরাপদ খাবার গ্রহণের কারণে দেহে নানাবিধ মরণব্যাধি বাসা বাঁধে। জনস্বাস্থ্য ও খাদ্যের পুষ্টিমানের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও নিরাপদ খাদ্যের জন্য প্রয়োজন খাদ্য উৎপাদনে নিরাপদ প্রযুক্তি ও নিরাপদ খাদ্য উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও বেগবান করা জরুরি। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নজরদারি এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে আমি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাই।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে সকলের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ। সরকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্তি, চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসকল কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। মেধা ও মননে একটি উৎকর্ষ ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে সকলের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করাই হোক জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসে আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ মাঘ ১৪৩০
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাণী

বাংলাদেশের জনগণের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে সপ্তমবারের মতো 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য "স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই; নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই" সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান সংবিধানে মৌলিক বিষয়গুলি যেমন: অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি খাদ্য নিরাপত্তার উপর বিশেষভাবে জোর দেন এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। খাদ্য নিরাপত্তার পর আমাদের সরকারের দৃষ্টি এখন পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যে। তারই ফলশ্রুতিতে মহান জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'।

খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষায় কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ও রেগুলেটরি সংস্থা হিসেবে ২০১৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে দেশে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরলস কাজ করছে। জন্মলগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠানটি একদিকে যেমন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে; অন্যদিকে আইনের প্রয়োগসহ বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কার্যক্রমও সম্পাদন করছে। মানুষের মধ্যে সর্বাত্মক সচেতনতা না আসলে একটি পরিপূর্ণ নিরাপদ খাদ্য সংস্কৃতি গড়ে উঠবে না। জনসচেতনতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সভা-সেমিনার অনুষ্ঠান, উঠান বৈঠক, টিভিসি প্রচার ও গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য 'নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা' নামক একটি পরিপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে তা সারাদেশে বিতরণ করা হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক যে-কোনো বিষয় জানতে বা অভিযোগ জানাতে 'খাদ্যকথন' নামে একটি এপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণের জন্য গত বছর চালু করা হয় টোল ফ্রি নম্বর কল সেন্টার '১৬১৫৫'; যেখানে দেশের সকল প্রান্তের মানুষ সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত যে-কোনো পরামর্শ গ্রহণ বা অভিযোগ জানাতে পারছেন। কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালনের লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২২-২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। খাদ্যের নিরাপদতার সঠিক মান নির্ধারণ ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ১৩টি বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতন করতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কনটেন্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দক্ষতার সাথে খাদ্য স্থাপনা মনিটরিং ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভেজালবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৬৫টি ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা এবং ১১ হাজার ৭৫৪টি খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন করা হয়। এছাড়া বিগত অর্থবছরে ১৫৬টি খাদ্যস্থাপনাকে এ+, এ, বি এবং সি ক্যাটাগরিতে গ্রেডিং প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের সাথে দেশীয় খাদ্যপণ্যের মানের সমন্বয় ঘটানোর জন্য দেশী-বিদেশী সদস্যের অন্তর্ভুক্তিতে ২৭টি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে 'Harmonization' সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তুতপূর্বক তা পর্যালোচনার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)- তে প্রেরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, করোনা মহামারী, গাজায় ইসরায়েলি অত্যাসান ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক খাদ্য সংকটের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই যেটুকু পতিত জমি আছে তা সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি খাদ্য নিরাপদ রাখার ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। আমি আশা করি, জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অংশীজনের প্রায়োগিক ভূমিকার মাধ্যমে আমরা খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই; নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই"-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আগামী ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পালিত হতে যাচ্ছে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪'। পুষ্টিকর নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার প্রত্যয় নিয়ে দেশে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত এবং এবারের প্রতিপাদ্যটি সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ দিবস উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদাপূরণ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। আমরা জানি মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রথমটি হলো খাদ্য। আর খাদ্য হতে হবে নিরাপদ অন্যথায় তা হতে পারে জীবনের জন্য বিষাদময় ও দুর্বিষহ। যথাযথভাবে এ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইতোমধ্যে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। একটি টেকসই উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি খাদ্যের পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়করণ, মজুদ সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৪ একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ যা খাদ্যের মান উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনগণ উন্নত বিশ্বের সকল নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে বলে আমি আশাবাদী।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এদেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে সুখী সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নিষ্কণ্টক অগ্রগতির জন্য জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৪ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি "জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪" উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি

মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই, নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই'- প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সপ্তমবারের অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪। আমি এ দিবস উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। একটি জাতি যদি যথাযথভাবে উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে চায়, সমৃদ্ধ হতে চায়, তার জন্য প্রয়োজন পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪ এর জন্য নির্ধারিত প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং বর্তমান সরকারের কর্মযজ্ঞ তথা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সাথে সংগতিপূর্ণ।

স্বাধীনতা বাঙালি জাতির মহোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেবল এই অর্জনের রূপকারই নয়, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার গুরুদায়িত্বও পালন করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার রূপকল্প-২০৪১ তথা স্মার্ট ও উন্নত বাংলাদেশ- এর ঘোষণা করেছে এবং তা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু একটি সমৃদ্ধ, সুস্থ-সবল ও স্মার্ট জাতি গঠনে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে তা হলো পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য। কারণ বর্তমান প্রজন্মের জনস্বাস্থ্য তথ্য শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য এই নিরাপদ খাদ্য প্রয়োজন। বর্তমান প্রজন্মকে কর্মমুখর রাখা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর জীবন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের কোন বিকল্প নেই। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথেও সরাসরি সংশ্লিষ্ট নিরাপদ খাদ্য।

দেশের সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব, যথাযথভাবে এ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইতোমধ্যে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। একটি টেকসই উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি খাদ্যের পুষ্টিমান ও নিরাপদতা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাস্তবায়নে এবং এই আইনের আওতায় খাদ্য পুষ্টিমান ও নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে সরকারের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী ও সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমান সময়ে কর্তৃপক্ষ দেশে খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষার্থে নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশবাসী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট আশার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। অদূর ভবিষ্যতেও কর্তৃপক্ষ তার উদ্ভাবনী ও গতিশীল বিজ্ঞানসম্মত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশবাসীর কাছে সমাদৃত হবে; গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় দিবসে আমি সে প্রত্যাশাই করি।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪ একটি যুগোপযোগী আবশ্যিক উদ্যোগ, যা সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতন করে তুলবে।এজন্য খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতে সরকারের ঐকান্তিক সদিচ্ছায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সর্বসাধারণসহ খাদ্য-শৃঙ্খলের সাথে সম্পৃক্ত সকলের মাঝে তুলে ধরার প্রয়াসে অনুষ্ঠিতব্য 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪' এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির সাংবিধানিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার অভিলক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের মত এবারও 'নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৪' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য **'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই; নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই'**-যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। দিবসটি উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনার** লক্ষ্য দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট রাষ্ট্রে পরিণত করা। এই লক্ষ্য পূরণে সুস্থ ও কর্মক্ষম জাতি গঠন আবশ্যক। এ জন্য নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির কোন বিকল্প নেই। দেশের আপামর জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টির অন্যতম প্রধান উৎস হলো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ। পাশাপাশি এ খাত রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে নিরাপদ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন, সরবরাহ, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ ও পরিবহন অত্যন্ত জরুরি। সে লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নানা কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করেছে। নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালনা করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রণয়ন করা হয়েছে মৎস্য ও মৎস্য পণ্য মাননিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০। এছাড়াও মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০, মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১০, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিকসহ ক্ষতিকর রাসায়নিকের রেসিডিউ দূষণ মনিটরিংয়ের জন্য ২০০৮ সাল হতে প্রতিবছর ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান প্রণয়ন ও তা অনুসরণ করা হচ্ছে। একইসাথে নিরাপদ প্রাণিজ পণ্য উৎপাদনে সম্প্রতি দেশে আর্ন্তজাতিক মানের প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে।

নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকল্পে সরকারের গৃহিত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' প্রণয়ন এবং এর আওতায় খাদ্য পুষ্টিমান ও নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে সরকারের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ২০১৫ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সীমিত জনবল নিয়েই খাদ্যে ভেজালবিরোধী প্রচারাভিযান পরিচালনাসহ ভেজাল ও দূষিত খাদ্য বিক্রয়, আমদানি, মজুদ ও প্রক্রিয়াকরণ বন্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও বিএসটিআইসহ মোট সাতটি সরকার সংস্থার সমন্বয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে সমন্বিত বাজার মনিটরিং কার্যক্রম ইতোমধ্যে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

দেশের সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে সরকারের গৃহিত পদক্ষেপসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনসহ দেশবাসীর মাঝে তুলে ধরার প্রয়াসে অনুষ্ঠেয় 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৪' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৪' এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ আব্দুর রহমান এমপি)

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই; নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই'-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে সপ্তম বারের মতো জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন দেশের মানুষ যাতে তিন বেলা পেট ভরে খাবার পায়। স্বাধীনতার পরপরই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য তিনি নানাবিধ যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু কৃষিবিপ্লবের মাধ্যমে সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আমলে কৃষি উন্নয়নের যে ভিত্তি রচিত হয়েছিল, সেটিকে অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এর ফলে বিগত ১৫ বছরে কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য নিরাপত্তায় অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে।

বর্তমান সরকার দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় কার্যক্রম বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্পাদনে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা প্রদান এবং আইনানুগভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। এছাড়া, পুষ্টিখাতকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে 'খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নীতি, ২০২০' এবং 'জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫'-সহ বিভিন্ন সেক্টরাল পলিসির আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০' এবং সম্প্রতি 'উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে। একইসঙ্গে, দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার ফসলের আধুনিক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উপর ব্যাপক জোর দিয়েছে। এতে করে খাদ্যের অপচয় কম হচ্ছে, অনিরাপদ খাদ্যের ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে এবং খাদ্যবাহিত রোগের বিস্তার ধীরে ধীরে কমছে।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২১/১/২৪

ড. মোঃ আব্দুস শহীদ, এমপি

সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই; নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই'- প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৭ম বারের বাংলাদেশে উদযাপিত হতে যাচ্ছে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪'। দেশের জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের প্রত্যয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছর ০২ ফেব্রুয়ারিকে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এবারের প্রতিপাদ্যটি বর্তমান সময়ে সরকারের সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে কর্মযজ্ঞ তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রায়োগিকতায় ঋদ্ধ। সময়োপযোগী প্রতিপাদ্য নিয়ে অনুষ্ঠিতব্য এ দিবস উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এঁর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। আর সুস্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করা। নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার। বাংলাদেশের বর্তমান জনবান্ধব সরকার জনগণের এই অধিকার সংরক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জনগণের সাংবিধানিক এই অধিকার পূরণে এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রণীত নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবায়নের নিমিত্ত ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য হচ্ছে সুস্থ ও সমৃদ্ধ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের নিয়ামক। এক্ষেত্রে শৈথিল্যের কোন সুযোগ নেই। খাদ্য উৎপাদন হতে শুরু করে খাদ্য গ্রহণ পর্যন্ত খাদ্য-শৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে খাদ্যের পুষ্টিমান ও নিরাপদতার গুরুত্ব পৌঁছে দেয়া আবশ্যক। এ লক্ষ্যে অংশীজনসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনে ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুসরণে এবং খাদ্য-শৃঙ্খলের সকল স্তরে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার দ্বারা জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু এবং খাদ্যের নিরাপদতার মান নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষ তার প্রোএক্টিভ ভূমিকায় কার্যকর সমন্বয়ক তথা এপেক্স বডি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি। একই সাথে সমৃদ্ধ জাতি গঠনে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবস উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস- ২০২৪ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাণী

দেশের জনগণের জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের প্রত্যয়ে 'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই; নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই'- প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ পালিত হতে যাচ্ছে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস। সময়ের চাহিদা এবং সার্বিক নানান মাত্রিকতায় বর্তমান প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত উপযোগী এবং উন্নত, স্মার্ট ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের সাথে প্রাসঙ্গিক। মহান ভাষার মাসে অনুষ্ঠিতব্য এ দিবসের প্রাক্কালে সর্বস্তরের জনসাধারণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার দর্শনকে বাস্তবে রূপ দেবার লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ মর্যাদায় উন্নীতকরণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উন্নত বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার মূল ভূমিকা পালন করবে সুস্থ ও কর্মক্ষম প্রজন্ম। সুস্থ ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার প্রধান অনুসঙ্গ হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যগ্রহণ। এই ধারাবাহিকতায় সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খলে দূষণ ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে প্রণীত হয় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩। আইনটির বাস্তবায়নে ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সালে 'জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য'- রূপকল্পকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি, গবেষণা এবং ভেজাল বিরোধী প্রচারণাসহ ভেজাল ও দূষিত খাদ্য বিক্রয়, আমদানি, মজুদ ও প্রক্রিয়াকরণ বন্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; শিক্ষার্থীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগীতা, পাঠ্যপুস্তকে নিরাপদ খাদ্যের অন্তর্ভুক্তি; স্থানীয় গৃহিণীদের নিয়ে উঠান বৈঠক সারা দেশে আয়োজিত হচ্ছে। বর্তমান সময়ে কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপ ও কার্যক্রমসমূহ ঝুঁকিভিত্তিক এবং কার্যকর টেকসই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা গঠনকে কেন্দ্র করে নির্ধারণ করা হয়। কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে পাঁচ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২১-২৬ এর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশে খাদ্যের নিরাপদতার কার্যকর মান নির্ধারণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন পদ্ধতি এবং নিরাপদতার মানসমূহ দেশে প্রচলিত মানসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে খাদ্য নিরাপদতার বিভিন্ন রেগুলেশন ও প্যারামিটার Harmonize করা হয়েছে এবং সেগুলো নিয়মিতভাবে WTO তে নোটিফাই করা হচ্ছে, যাতে করে বৈশ্বিক নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্যে বাংলাদেশও সমানভাবে অংশীদারিত্ব বজায় রাখতে পারে এবং বাংলাদেশের পক্ষে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-ই হল প্রথম প্রতিষ্ঠান যেটি WTO এর SPS কমিটিতে নোটিফাই করেছে। এছাড়া পারিবারিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধিতে 'নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা সারা দেশে সাধারণ জনগণের মধ্যে বিতরন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে কর্তৃপক্ষ খাদ্যপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে যাচাইয়ের মাধ্যমে হেলথ সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি বাংলাদেশের প্রতিটি জনগণের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পদার্পণে এবং বৈশ্বিক চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে অর্থনীতির উন্নয়ন ও কৃষিজ খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, খাদ্য শৃঙ্খলের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে একসূত্রে আবদ্ধকরণ ও দেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে একনিষ্ঠভাবে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মুজিবুষের মূল চেতনাকে ধারণ করে একটি সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনের জন্য বর্তমান সরকারের সকল অনুজ্ঞা ও অঙ্গীকারের সফল বাস্তবায়নের পথে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুস্থ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের অভীষ্টকে সামনে নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত চর্চা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪'- এ সকলের সক্রিয় সম্পৃক্ততা কামনা করছি।

মো: আব্দুল কাইউম সরকার

সদস্য
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
ও
আহবায়ক
প্রকাশনা কমিটি

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের জনগণের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করণের প্রত্যয় নিয়ে সপ্তমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪'। মহান একুশের চেতনা সমৃদ্ধ ফেব্রুয়ারি মাসে "স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই; নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই"- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবারের জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবস উপলক্ষে মহান এ ভাষার মাসে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। একটি সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গঠনের পূর্বশর্ত হলো জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা এবং সুষম পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি। সকল সময়ে সকল নাগরিকের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবনযাপনের প্রয়োজনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকারের গৃহীত রূপকল্প অনুযায়ী, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন রয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সমগ্র খাদ্যশৃঙ্খলের শুরু হতে ভোক্তার দোরগোড়ায় দূষণ ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে এবং তার যুগোপযোগী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে প্রণীত হয় 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩'। এই আইন বাস্তবায়নে ০২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ 'জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য' রূপকল্পকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি বাংলাদেশের সকল মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। বাংলাদেশ সরকার এই অধিকার সংরক্ষণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪ এর সফল আয়োজন বাংলাদেশে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। দেশে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার সুদৃঢ়করণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পর্যায়ে চিহ্নিত সমস্যাবলি থেকে উত্তরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪' বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অব্যাহত অগ্রগতির জন্য জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও মানবসম্পদ সমৃদ্ধ করতে সপ্তমবারের মতো আয়োজিত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

নাজমা বেগম, এনডিসি

জনসংযোগ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

সম্পাদকীয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা দানাদার খাদ্য উৎপাদনে দেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ; কিন্তু খাদ্যে ভেজালরোধ ও জনসাধারণের পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার প্রয়াসে দরকার ছিলো একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। তারই ফলশ্রুতিতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত বাসনায় মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এবং ২০১৫ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি'জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্যের অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। ২০১৮ সাল থেকেই প্রতিষ্ঠার দিনটিকে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এবারের প্রতিপাদ্য "খাদ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই; নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই"- যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি।

পুষ্টিসমৃদ্ধ ও নিরাপদ খাদ্য যে-কোনো দেশের মানবশক্তির মূল নিয়ামক। কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম সাঁকো হলো দক্ষ মানবসম্পদ। মানবসম্পদকে দক্ষ করবার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পথচলাকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর বাসনা নিয়ে স্মরণিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অসীম ইচ্ছাশক্তি ও স্বল্প সাধ্য নিয়ে, সীমিত সময়ের মধ্যে আমরা এ দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়েছিলাম। অসংখ্য সীমাবদ্ধতা স্বত্ত্বেও প্রকাশনা উপ-কমিটির প্রতিটি সদস্যের নিরলস প্রচেষ্টায় স্মরণিকাটি সফলতার বদন দেখতে পেয়েছে, তাতে আমরা ভীষণ আনন্দিত।

প্রকাশনাটিকে তথ্য, তত্ত্ব ও প্রাসঙ্গিকতায় সমৃদ্ধ করতে আমাদের প্রচেষ্টার কোন কমতি ছিলো না। গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, খাদ্য ব্যবসায়ী, খাদ্য আন্দোলনে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ও আগ্রহী পাঠকমহলসহ সকলের জন্য বইটি সহায়ক হবে বলে আশা রাখি। স্মরণিকার গুণগত মান বজায় রাখার ব্যাপারে সর্বাত্মক আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের কোন অভাব ছিল না। তারপরও বানানজনিত ভুল, অবকাঠামোগত বিন্যাস, মুদ্রণজনিত ত্রুটি এবং অন্যান্য অনেক ভুল হয়তো আমরা খালি চোখে দূর করতে পারিনি। তাই আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাঁরা স্মরণিকার জন্য নিবন্ধ লিখেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। বইটিতে প্রকাশিত কোন নিবন্ধের তথ্য ও মতামত একান্তই লেখকের। তারপরও কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা বা অসামঞ্জস্যতা অথবা তথ্যগত ভুল পরিলেক্ষিত হলে, তার দায় একান্তই আমাদের।

স্মরণিকাটি প্রকাশের পেছনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রচেষ্টা ছিলো বর্ণনাতীত। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব নাজমা বেগম, আহবায়ক, প্রকাশনা কমিটি-এঁর ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত উৎসাহপূর্ণ ও প্রশংসিত। প্রুফ রিডিং, লেখা ও বাণী সংগ্রহ, প্রচ্ছদ প্রস্তুতসহ সার্বিক সহযোগিতায় প্রকাশনা কমিটির প্রতিটি সদস্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের তীব্র বাসনা ও অনন্য উৎসাহ স্মরণিকা প্রকাশের কার্যক্রমকে আরো গতি দান করেছে। আমি তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আবুল হাসনাত

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	লেখক পরিচিতি	পৃষ্ঠা
০১	সুস্থ, সবল ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ: প্রেক্ষিত টেকসই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা	মো. আব্দুল কাইউম সরকার চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	২৩
০২	খাদ্যের নিরাপদতা এবং আমার ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা	কেরদৌস আহমেদ, এমপি মাননীয় সংসদ সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	৩২
০৩	নিপাহ ভাইরাস; খেজুরের কাঁচা রস পরিহার করুন	ডা. এ বি এম আবদুল্লাহ ইমেরিটাস অধ্যাপক প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক	৩৪
০৪	আগামী দিনের বাংলাদেশ ও নিরাপদ খাদ্য	ড. আতিউর রহমান সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	৩৬
০৫	Who asked BFSA to Harmonize Food Standards with Codex?	Sanjay Dave Chairman, Codex Alimentarius Commission	৩৯
০৬	The Essentials for Transformation of National Food Systems	Natia Mgeladze Global Lead IFC Food Safety, Food Loss Prevention Food Fortification Advisory	৪২
০৭	An Overview of the New Zealand Food Safety System	Bruce Burdon Manager Market Access Liaison & Cooperation, Ministry for Primary Industries, New Zealand	৪৪
০৮	Food Safety: A Global Issue With Local Solutions - The Danish Food Safety System	Mr. Troels Vensild Director For International Cooperation The Danish Veterinary and Food Administration	৪৭
০৯	খাবার আগে ভাবুন!	ধ্রুব সাহা সম্পাদক, ডিবিসি টেলিভিশন	৪৯
১০	Priority Areas of Food Safety in Bangladesh	Dr. Muhammad Shahadat Hossain Siddiquee Professor Department of Economics, University of Dhaka	৫১
১১	নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আন্তঃসংস্থা কার্যক্রম সমন্বয়ঃ কতিপয় বিবেচ্য বিষয়	মুশফাক হাসান মুহঃ ইফতিখার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	৫৩
১২	নিরাপদ খাদ্য ও দারিদ্র্য	মোঃ রেজাউল করিম সাবেক সদস্য (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	৬১
১৩	Antibiotic resistance in food: A growing concern in Bangladesh	Sangita Ahmed, PhD Professor Department of Microbiology, University of Dhaka	৬৪
১৪	পানি শোধনে স্যানিটাইজারের ব্যবহার এবং ফলমূল ও শাক-সবজি হতে অণুজীব দূরীকরণ কেন প্রয়োজন?	মো: জাহিদুল হক খান মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পোস্টহ্যারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, বিএআরআই	৬৬
১৫	নিরাপদ মাঠ ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা (Bangladesh GAP)	ড. এ এইচ. এম. সোলায়মান অধ্যাপক, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৬৯
১৬	খাদ্যের নিরাপদতা: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত	ড: মো শহিদুল বারী প্রধান বিজ্ঞানী, উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৭২
১৭	Aiming for a Robust, Coordinated, and Collaborative Food Control System in Bangladesh	Prof. Samuel Godefroy Food Control Regulatory Advisor U.S. Department of Agriculture Bangladesh Trade Facilitation Projecct	৭৫
১৮	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মাটি ও পানিতে ভারি ধাতুর (হেভি মেটাল) ফাইটোরিমেডিয়েশন ঃ একটি পরিবেশবান্ধব, কার্যকর ও টেকসই ডিটক্সিফিকেশন পদ্ধতি	ড. মোঃ যাকারিয়া রশিদ মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	৭৭

ক্রমিক	বিষয়	লেখক পরিচিতি	পৃষ্ঠা
১৯	Designer Eggs Production and Its Health Benefit	**Professor Dr. Md. Elias Hossain** Department of Poultry Science Bangladesh Agricultural University	৮২
২০	নিরাপদ দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যই হোক আমাদের আদর্শ খাদ্য	**ড. সহদেব চন্দ্র সাহা** পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	৮৫
২১	Food Safety: Navigating the Regulatory Landscape in Bangladesh	**Debabrata Roy Chowdhury** Director Legal Regulatory & Corporate Affairs and Company Secretary	৮৮
২২	Food Safety: WHO Global Strategy	**Faria Shabnam** National Professional Officer-Nutrition WHO Country Office of Bangladesh	৯১
২৩	খাদ্যদূষণ: পথে ঘাটে	**রেজাউল করিম সিদ্দিকী** সাধারণ সম্পাদক, বিসেফ ফাউন্ডেশন, উপস্থাপক, মাটি ও মানুষ	৯৩
২৪	নিরাপদ মাংসের প্রাপ্যতা ও ভোগে করণীয়	**মো. কাওছারুল ইসলাম সিকদার** উপসচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	৯৫
২৫	নিরাপদ খাদ্য, স্মার্ট বাংলাদেশ ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা	**ড. খালেদা ইসলাম** পরিচালক, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৯৯
২৬	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ভূমিকা, সুযোগ ও সম্ভাবনা	**শেখ মো: আমিনুর রহমান** ব্যবস্থাপনা পরিচালক পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক	১০২
২৭	Food Safety and Trade: Bangladesh's Shrimp Export Perspective	**Md. Moshiul Alam** Joint Chief Bangladesh Trade and Tariff Commission	১০৫
২৮	সমন্বয়ের ভিত্তিতে নিরাপদ খাদ্য: সবাই মিলে, সবার জন্য	**আতাউর রহমান মিটন** সভাপতি বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এবং সহ-সভাপতি, বিসেফ ফাউন্ডেশন	১০৯
২৯	Importance of Nutrition and Food Safety in Food System	**Mostafa Faruq Al Banna** Research Director (Nutrition) FPMU, Ministry of Food	১১১
৩০	প্রাণিসম্পদ ভ্যালুচেইনে খাদ্য নিরাপদতা	**ড. শেখ শাহিনুর ইসলাম** উপপরিচালক, প্রাণিস্বাস্থ্য, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১১৪
৩১	The Crucial Nexus: Food safety, Hygiene and Sanitation	**Dr Sharmin Zaman Emon** Senior Scientist Centre for Advanced Research in Sciences, University of Dhaka	১১৮
৩২	Necessity of Accredited Food Testing Laboratories in Bangladesh	**Mohammed Abbas Alam** Assistant Director Bangladesh Accreditation Board	১২০
৩৩	চটকদার শব্দ-ফাঁদে খাদ্য কিনে প্রতারিত হচ্ছেন না-তো?	**মো. শওকত আলী** চীফ করেসপন্ডেন্ট, দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড	১২২
৩৪	স্ট্রিট ফুড নামক "ভ্রাম্যমান মরণফাঁদ" বর্জনের সময় এখনই	**নওশিন ফারজানা ইভা** ডায়েটিশিয়ান, ল্যাব এইড হাসপাতাল	১২৪
৩৫	Battling the silent culinary culprits: The Crucial Role of Pest Control in Restaurant Kitchens	**Md Nazmul Islam** District Food Safety Officer Bangladesh Food Safety Authority, Cox's Bazar	১২৬
৩৬	Harmony in Sustenance; Food Business Operator's Pledge to Food Safety	**Sk. Md. Ferdous Arafat** Law Officer Bangladesh Food Safety Authority	১২৮
৩৭	খাদ্য সরবরাহ পরিসেবা (Food Delivery Services): সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য সমাধান।	**এস এম শিপন** গবেষণা কর্মকর্তা (গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	১৩০
৩৮	Traceability: An Approach in the supply Chain for Safe Food	**Shahriar Ahmed** Regulatory Affairs Associate Unilever Consumer Care Limited	১৩৩
৩৯	The role of Packaging: A Food Safety Perspective	**Nazimul Islam** General Manager Product Development & Quality Control	১৩৬
৪০	ফটো স্টেশন		১৪০

সুস্থ, সবল ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ: প্রেক্ষিত টেকসই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মো. আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

জন্মলগ্ন থেকেই একটি শিশুর প্রাথমিক চাহিদা খাদ্য, যা তার বেড়ে ওঠার জন্য অপরিহার্য। একজন মানুষের জীবনে মৌলিক চাহিদাসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হলো খাদ্য। খাদ্য ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। আর খাদ্য যদি নিরাপদ ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ না হয়, তাহলে শিশুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি তার মেধা বা মননশীলতারও পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিপূর্ণ বিকশিত প্রজন্ম ছাড়া একটি দেশ, একটি জাতির সমৃদ্ধি কখনই কল্পনা করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এবং ১৮(১)-এ সম্পূর্ণরূপে দেশের জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপদতার বিষয়টি ফুটে ওঠে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার সাথে খাদ্যের নিরাপদতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুরা পুষ্টিহীনতায় এবং নানাবিধ খাদ্য ও পানিবাহিত রোগে ভুগছে। এ অবস্থা দূরীকরণে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির কোনো বিকল্প নেই। একটি সুস্থ-সবল জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো জনগণের খাদ্য নিরাপদতা ও সুষম পুষ্টি যা নিশ্চিত হয় নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি থেকে।

যাত্রা ইতিহাসঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজন্ম লালিত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ক্রমান্বয়ে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ এবং ডেলটা প্ল্যান-২১০০ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তে ৫৪ বছরের পুরাতন Pure Food Ordinance, ১৯৫৯ রহিত করে ২০১৩ সালের ১০ই অক্টোবর যুগান্তকারী নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়। আইনটি ২০১৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি হতে কার্যকর হয় এবং তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্যঃ

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্যে পুরণকল্পে অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

১. রূপকল্পঃ জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য।

২. অভিলক্ষ্যঃ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, খাদ্য শিল্প ও খাদ্য ব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজের সহযোগিতায় যথাযথ বিজ্ঞানভিত্তিক বিধি-বিধান তৈরি ও কার্যকর প্রয়োগ এবং খাদ্য শৃঙ্খলে পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম ফলপ্রসূভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

টেকসই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিনির্মাণেঃ

বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ট পর্যায়ের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত করছে, যেখানে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কর্মক্ষম অর্থাৎ দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম। কর্মক্ষম জাতির জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং শারীরিক ও মানসিক

বিকাশে একটি টেকসই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই কর্তৃপক্ষ খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন স্তরে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশে একটি টেকসই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে।

সীমিত জনবল নিয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিয়মিতভাবে খাদ্যের নিরাপদতা সংক্রান্ত জনসচেতনতা, কৃষি গবেষণা এবং খাদ্যে ভেজাল বিরোধী প্রচারণা সহ ভেজাল ও দূষিত খাদ্য বিক্রয়, আমদানি, মজুদ ও প্রক্রিয়াকরণ বন্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। বর্তমান সময়ে কর্তৃপক্ষের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ একটি টেকসই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গঠনকে কেন্দ্র করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

১। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিরাপদ খাদ্যের বার্তাসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে, এমনকি গ্রামাঞ্চলে জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেবার জন্য দেশের উপজেলা সমূহে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে খাদ্যের নিরাপদতা বিষয়ক জনসচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা বিষয়ে সমগ্র দেশব্যাপী ৬৭টি জনসচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২২-২৬ বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রত্যেকটি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নির্ধারিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠিত বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। দেশে খাদ্যের নিরাপদতার কার্যকর মান নির্ধারণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন পদ্ধতি এবং নিরাপদতার মানসমূহ দেশে প্রচলিত মানসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে খাদ্য নিরাপদতার বিভিন্ন রেগুলেশন ও প্যারামিটার Harmonize করা হয়েছে এবং সেগুলো নিয়মিতভাবে WTO তে নোটিফাই করা হচ্ছে, যাতে করে বৈশ্বিক নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্যে বাংলাদেশও সমানভাবে অংশীদারিত্ব বজায় রাখতে পারে এবং বাংলাদেশের পক্ষে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-ই হল প্রথম প্রতিষ্ঠান যেটি WTO এর SPS কমিটিতে নোটিফাই করেছে।

৪। পারিবারিক ভাবে খাদ্যের নিরাপদতার চর্চা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন খাদ্য নিরাপদতা ও পুষ্টি বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে 'নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং দেশব্যাপী স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার পরিবারের নিকট এটি বিতরণ করা হয় এবং সরাসরি এক লক্ষ পরিবারকে এই নির্দেশিকার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রম এখনও চলমান রয়েছে।

৫। ২০২২ সাল থেকে কর্তৃপক্ষ খাদ্যপণ্য রপ্তানি ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে যাচাইয়ের মাধ্যমে খাদ্যের নিরাপদতার নিশ্চয়তার স্বীকৃতিস্বরূপ হেলথ সার্টিফকেট প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। রপ্তানিকারকদের সুবিধার্থে সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক অটোমেশন এর মাধ্যমে ই-হেলথ সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

৬। এছাড়া ২০২৩ সালের প্রাথমিক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে খাদ্যের নিরাপদতার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাধ্যমিকের কারিকুলামে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় খুব শীঘ্রই অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে।

৭। খাদ্য নিরাপদতার সাথে সংশ্লিষ্ট ০৬ টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর রিসার্চ পেপার প্রোপোসাল গ্রহণ করে রিসার্চ সেন্টার, পরীক্ষাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রান্ট প্রদান করা হয়েছে।

৮। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাদ্য পরীক্ষাগার গুলোর মধ্যে যথাযথ সমন্বয়, এক্সপোসার এবং জনগণের প্রতি তাদের সেবা প্রদানের বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্য BTF প্রকল্পের সাথে একসাথে গত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে দেশে প্রথমবারের মত Food and Chemical Lab Expo আয়োজন করা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় খাদ্য পরীক্ষাগার ভিত্তিক যথাযথ তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনলাইন ভিত্তিক ল্যাবরেটরি ইনফরমেশন ম্যাপোসেটরি গঠন করা হয়েছে।

৯। পবিত্র রমজান মাসে নিরাপদ ইফতার প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান এবং খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষার্থে ঢাকা শহরের ০৬টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে (বেইলী রোড, আগারগাঁও , চকবাজার, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, খিলগাঁও) মনিটরিং বুথ স্থাপন করা হয়।

১০। দেশের ট্যুরিজম উদ্বুদ্ধকরণে কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে ০২ টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে এবং ১০০ জন খাদ্য ব্যবসায়ী ও ১০০ জন পথ খাবার বিক্রেতাকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেফটি উপকরণ বিতরণ করা হয়।

১১। বাজারে খোলা ভোজ্য তেল বিক্রি বন্ধ এবং ভোজ্য তেলে ভিটামিন এ ফোর্টিফিকেশন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে GAIN এর সহায়তায় কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে ভোজ্য তেল পরীক্ষণ, সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ, বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১২। দেশে পরিচালিত খাদ্য স্থাপনাসমূহে মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমসমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধনে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি' গঠন করা হয়েছে যেখানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ের রেগুলেটরি সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিয়মিত কার্যক্রমসমূহঃ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে গঠিত হলেও মাত্র ছয় বছর বয়সের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি সুদৃঢ় প্রত্যয়ে অগ্রযাত্রা শুরু করেছে। ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষ মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

- আইন-প্রবিধানমালা প্রণয়নঃ

  নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে ৩টি বিধি ও ১১টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যা নিম্নরূপ-

  ক) নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪
  খ) নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি)বিধিমালা, ২০১৭
  গ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯
  ঘ) খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭
  ঙ) খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭
  চ) মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭
  ছ) নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭
  জ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮
  ঝ) নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৮
  ঞ) নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য স্পর্শক) প্রবিধানমালা, ২০১৯
  ট) নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০২০
  ঠ) ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানমালা, ২০২১
  ড) নিম্নমানের, ঝুকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার প্রবিধানমালা, ২০২১
  ঢ) নিরাপদ খাদ্য (দূষণকারী জীবাণু নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ) প্রবিধানমালা, ২০২১

  এছাড়াও নিম্নোক্ত প্রবিধানমালাগুলো প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে-
  ক) নিরাপদ খাদ্য (বিজ্ঞাপন ও দাবি) প্রবিধানমালা, ২০২১
  খ) নিরাপদ খাদ্য (রেস্তোরাঁ) প্রবিধানমালা, ২০২১
  গ) নিরাপদ খাদ্য (উৎস শনাক্তকরণ) প্রবিধানমালা
  ঘ) নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্য সহায়ক খাদ্য এবং নিউট্রাসিটিক্যালস) প্রবিধানমালা

- নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটিঃ

  নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার নিমিত্তে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে, যার ইতোমধ্যে ০৭ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটিঃ

  নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার ইতোমধ্যে ১১ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ব্যবস্থাপনা সমন্বয়য় কমিটির বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- ৬৪ জেলায় নিরাপদ খাদ্য অফিসার পদায়নঃ

  দেশের সকল জেলায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে ৬৪ জন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা পদায়ন করে জেলা পর্যায়ে জনসচেতনতা, মনিটরিং ব্যবস্থা ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

- জনসচেতনতামূলক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

  খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকরণের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টিকল্পে সারাদেশে কর্মশালা, সেমিনার, ক্যারাভান রোড শো, পাবলিক মিটিং আয়োজন, পথ নাটক, ভিডিও প্রদর্শন, মাইকিং, লিফলেট, গণবিজ্ঞপ্তি, উঠান বৈঠক, বাল্ক মেসেজ, টিভি স্ক্রল, প্যাম্পলেট, পোস্টার ও স্টিকার বিতরণ, বিভিন্ন স্কুলে হাত ধোয়াসহ বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

  i. বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ১৪টি টিভিসি নির্মাণপূর্বক বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলে প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ১৪টি টিভিসি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে মোট ৭৭০ মিনিট প্রচার করা হয় এবং ৭টি গণবিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন সময়ে মোট ৫২টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

  ii. ২০২২-২৩ অর্থবছরে জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে উপজেলা পর্যায়ে ৩১৪টি, জেলা পর্যায়ে ৭৫টি এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ০১ টি নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইতোমধ্যে ৭২টি জনসচেতনতামূলক সেমিনিয়ার আয়োজন করা হয়েছে।

  iii. প্রান্তিক পর্যায়ে গৃহিনীদের মধ্যে খাদ্য নিরাপদ রাখার চর্চা বৃদ্ধিতে দেশব্যাপী উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে । ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৯২টি উঠান বৈঠক আয়োজিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬০টি উঠান বৈঠক আয়োজিত হয়েছে।

  iv. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে সচেতন করতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৯৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইতোমধ্যে ৮৫ টি স্কুল-কলেজে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

  v. ২০২২-২৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ৬৫০৭ জন হোটেল-রেস্তোরাঁর খাদ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২,২৭৫ জন খাদ্য ব্যবসায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

  vi. নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টিতে তৈরি করা হয়েছে পথনাটক ও অ্যানিমেশন। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে পথনাটকটি ইতোমধ্যে দেশের ৮টি জনবহুল স্থানে প্রচার করা হয়েছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫টি স্থানে প্রদর্শন করা হয়েছে।

- ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধ কার্যক্রমঃ

  নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার কাজটি ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। এরই মধ্যে সব জেলায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম চলমান।

  i. মনিটরিং কার্যক্রমঃ

  ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে নিয়মিতভাবে সারাদেশে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিএফএসএ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১,৩৪১টি এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৯৫৮টি খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন করা হয়।

  ii. ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাঃ

  খাদ্যে ভেজালকারীদের কঠোর হস্তে দমন করার লক্ষ্যে সারাদেশে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৬৫ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় যেখানে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৩৬ জন, মামলা সংখ্যা ১৩৬ টি এবং সর্বমোট অর্থদণ্ড করা হয় ১,৫৯,০০,০০০ টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ৯৮ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় যেখানে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৮৫ জন, এবং সর্বমোট অর্থদণ্ড করা হয় ১,৫৪,০০,০০০ টাকা।

  iii. অভিযোগ গ্রহণে হটলাইন চালুকরণঃ

  এছাড়াও, খাদ্যের ভেজাল সম্পর্কে অভিযোগ প্রাপ্তি ও তাৎক্ষণিক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের টোলফ্রি হটলাইন সেবা ১৬২৫৫ চালু করা হয়েছে।

  iv. গ্রেডিং প্রদান কার্যক্রমঃ

  ২০২২-২৩ অর্থবছরে সারা দেশে খাদ্য ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ঢাকাসহ ১৬৫টি হোটেল-রেস্তোরাঁ, মিষ্টি দোকান ও বেকারী কে A+, A ও B ক্যাটাগরিতে দক্ষ কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটরিং এর মাধ্যমে গ্রেডিং এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইতোমধ্যে ১৮৩টি খাদ্য স্থাপনাকে রি-গ্রেডিং প্রদান করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নমুনা পরীক্ষণ, মোবাইল ল্যাবরেটরী সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

খাদ্যের মান ও নিরাপদতা রক্ষার জন্য সারা দেশ থেকে ঝুঁকিভিত্তিক নমুনা সংগ্রহ করে কর্তৃপক্ষের ১০ টি ডেজিগনেটেড ল্যাবের মাধ্যমে তা বিশ্লেষণপূর্বক ফলাফল যাচাইকরণের কাজ করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে নমুনা পরীক্ষা করা হয় ১০৭০ টি, মানসম্মত নমুনা ছিল ৯৮০টি এবং মানহীন নমুনা ছিল ৯০ টি। অন্যদিকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮৩২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়, মানসম্মত নমুনা পাওয়া যায় ৭৫০ টি এবং মানহীন নমুনা ছিল ৮২টি। এসমস্ত নমুনাসমূহের মধ্যে গুড়ে বিষাক্ত হাইড্রোজের উপস্থিতি, ভেজাল দুধ ও ভেজাল মধু উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মোবাইল ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে ঢাকা শহরের ৩৭৯টি বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শন করা হয়েছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং ল্যাবরেটরির মাধ্যমে তাৎক্ষণিক নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোবাইল ল্যাবরেটরিতে র‍্যাপিড কীটের সাহায্যে ২১০ টি ভোজ্য তেলের নমুনায় ভিটামিন এ- ফোর্টিফিকেশন নিরূপণ করা হয়, যেখানে ৭৭টি নমুনা অনুমোদিত সীমার নীচে পাওয়া যায়।

- কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নঃ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি ০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৫ মেয়াদে ১০০৮০.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে:- খাদ্যে ভেজাল ও দূষণ রোধে খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ সুবিধার জন্য মোবাইল ল্যাবরেটরি চালু, ডিজিটালাইজড সার্ভিলেন্স সিস্টেম ও ই-লার্নিং সুবিধাসহ ডাটাবেইজ তৈরি, খাদ্য নমুনা বিশ্লেষণের জন্য মিনি ল্যাবরেটরি স্থাপন, অনলাইন কল সেন্টার চালুকরণ, খাদ্য ব্যবসায়ি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, জনসচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন, জেলা ও মেট্রোপলিটন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক অফিস সরঞ্জামাদি প্রদান ও খাদ্যের নিরাপদতা সম্পর্কিত জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের মাধ্যমে বিভাগীয় পর্যায়ে ইলেকট্রিক বোর্ড ও মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যান স্থাপন, প্রত্যেক জেলায় বিলবোর্ড স্থাপন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জেলা কার্যালয়ের জন্য মোটর সাইকেল, কম্পিউটার সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইকুইপমেন্ট প্রকিউরমেন্টের কার্যক্রম গ্রহণ, সারাদেশে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য র‍্যালি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন, খাদ্য ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬৬১.৩১ লক্ষ টাকা (৩৬.৩৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫০%। প্রকল্পের আওতায় ০৪ জন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে এবং আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ১১জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খাদ্য ব্যবসায়ীদের ৩৩ ব্যাচ (৮২৫জন), নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তাদের টিওটি প্রশিক্ষণ ০৪ ব্যাচ (১০০জন), নমুনা সংগ্রহকারীদের ০১ ব্যাচ (২৫জন) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ০১টি কর্মশালা, বিভাগীয় ০৩টি কর্মশালা, জেলা পর্যায়ের ২৬টি কর্মশালা আয়োজন এবং উপজেলা পর্যায়ে ৬৩২টি সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকল্প অফিস ও মাঠ পর্যায়ের জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসের জন্য ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৩৭টি মোটর সাইকেল, ৬২টি কম্পিউটার সরঞ্জামাদি (ডেস্কটপ, ল্যাপটপ), ১৪৮টি অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার, মাল্টিমিডিয়া), ৫৮টি রেফ্রিজারেটর, ১৯ সেট আসবাবপত্র, ৩৬৯টি আইস বক্স ও সেম্পল কালেকশন কিট ক্রয় করা হয়েছে। জনসচেতনের অভিযোগ, মতামত গ্রহণ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য এবং ০১টি কল সেন্টার স্থাপন (১৬১৫৫) করা হয়েছে। ০৭টি মোবাইল ল্যাবরেটরি সংগ্রহের জন্য ক্রয় আদেশ দেয়া হয়েছে। সদর দপ্তরে মিনি ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য ফেব্রিকেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও জনসচেতনতামূলক ০৫টি অডিও ভিডিও (টিভিসি) নির্মাণ করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রচারণার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে ৩০টি ডিজিটাল বিলবোর্ড ও ১১৭টি সাধারণ বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন বুকলেট, লিফলেট, নির্দেশিকা, ফোল্ডার, ফেস্টুন তৈরি ও বিতরণ করা হয়েছে। ডাটাবেইজ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- JICA-STIRC প্রকল্প বাস্তবায়নঃ

বাংলাদেশ সরকার ও JICA এর যৌথ অর্থায়নে (৪৩ কোটি টাকা) "Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority" নামক প্রকল্প -এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের ১১টি পাইলটিং জেলার নিরাপদ খাদ্য অফিসার এবং খাদ্য পরিদর্শকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, খাদ্য নমুনার টেস্টিং কীট প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের Referrence Food Testing Laboratory স্থাপনের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান, ধারণা প্রদান এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১২টি পাইলট জেলার ২২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বমোট ৪৪৯ জন শিক্ষককে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদান করা হয়েছে। BFSA এর ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের (Digitalization)

জন্য Application প্রস্তুত করা হয়েছে। ১২ পাইলট জেলায় উক্ত Application এর মাধ্যমে পরিদর্শন ও টেস্টিং কার্যক্রমের রিপোর্টিং ও ফিডব্যাক নেয়া হচ্ছে। ১২টি পাইলট জেলাসমূহে খাদ্য নমুনা পরীক্ষার নিমিত্ত ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটি প্রদান করা হয়েছে এবং দ্রুত পরীক্ষণ কীট (Rapid Testing Kit) ব্যবহার করে খাদ্য নমুনা পরীক্ষণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভিন্ন হোটেল রেস্তোরাঁর খাদ্য কর্মীদের খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ক উত্তম ও খারাপ চর্চা সম্পর্কিত ভিডিও চিত্র প্রশিক্ষণ টুল তৈরি করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের সর্বমোট ৩০ জন কর্মকর্তাকে জাপান ও থাইল্যান্ড এ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে মোট ০৬টি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে এবং পাইলট জেলার নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের খাদ্য নমুনা পরীক্ষণের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ঢাকা, কুমিল্লা, নওগাঁ ও বরগুণা জেলার মিষ্টি উৎপাদনকারীদের ০৫টি ব্যাচে মোট ১৭১ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী কার্যসমূহঃ

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় খাদ্য নিরাপদতার সচেতনতা বৃদ্ধিতে বানানো হয়েছে 'খাদ্য কথন' অ্যাপস। 'নজর' এবং 'টেম্পারেচার ডাটা লগার' এর মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থার পাইলটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া চতুর্থ বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী আইডিয়া- "কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) ভিত্তিক Real-Time ফুড সেফটি মনিটরিং প্রকল্প"- এর মান উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

- অন্যান্যঃ

✓ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ ৯ম গ্রেডের ৯৩ জন এবং ১৩-১৬ গ্রেডের ৬৩ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান এবং বিভিন্ন কারিগরি এবং দাপ্তরিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের সব জেলাগুলোতে নিরাপদ খাদ্য অফিসারদের পদায়ন করা হয়েছে।

✓ নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিষয়ক মিডিয়া কর্মী ও সাংবাদিকদের নিয়ে সেনসিটাইজেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

✓ ভোজ্য তেলের যথাযথ 'ভিটামিন এ' ফোর্টিফিকেশন এবং ভোজ্য তেল নিরাপদ উপায়ে বাজারে বিক্রয় নিশ্চিতে GAIN এর সহায়তায় মতবিনিময় সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

✓ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ভোজ্য তেলের পুনঃব্যবহার রোধে ব্যবহারকৃত ভোজ্য তেলকে বায়োডিজেল হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে a2i এর সহায়তায় বায়োটেক কোম্পানিকে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করেছে। তাছাড়া অস্ট্রিয়া ভিত্তিক কোম্পানি MUENZER এর সাথে এই ব্যবহারকৃত ভোজ্য তেল রপ্তানি বিষয়ক দেশের বিভিন্ন জেলায় সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

✓ খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে সচেতনতা জোরদার করতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মত 'খাদ্যবার্তা' নামক ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় সংস্করণ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

✓ কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে আলোচনা ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য JICA এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নিউজিল্যান্ডের MPI এর সাথে Food Safety Cooperation বিষয়ে কর্তৃপক্ষের একটি সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হয়। সর্বমোট ১৫ টি প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU স্বাক্ষর হয়; যার মধ্যে ৬টি সরকারি সংস্থা, ৩টি বৈদেশিক সংস্থা বিদ্যমান।

✓ হলুদে মাত্রাতিরিক্ত লেড (সীসা), কার্বোনেটেড বেভারেজে উচ্চ মাত্রায় ক্যাফেইন, পোল্ট্রি খাদ্যে ট্যানারি বর্জ্য এবং প্রাণী খাদ্যে এমবিএম ব্যবহার বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

✓ খাদ্য নিরাপদতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে মোট ১২টি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

✓ পবিত্র রমজান ও কোরবানি উপলক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে টিভি, বেতার, ফেইসবুক ও মোবাইল বার্তার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা হয়েছে। এছাড়া মাইকিং, সমন্বিত মনিটরিং, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিও প্রদান করা হয়েছে।

✓ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সারাদেশে ৭১টি বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠন করা হয়েছে।

✓ জনগণের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে হটলাইন সেবা ৩৩৩ এর মাধ্যমে চালু করা হয়েছে।

✓ ৫০টি খাদ্য পরীক্ষাগারের তথ্য সম্বলিত একটি ল্যাব ডাইরেক্টরি প্রণয়ন করা হয়েছে।

✓ FAO এবং আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় - এর সহযোগিতায় ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে B.Sc (Hons) Course in Food Safety Management চালু করা হয়েছে।

- ✓ খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতে দেশবাসীকে সচেতন করার নিমিত্তে সাপ্তাহিক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।
- ✓ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথমবারের মত পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলির উপর বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২ প্রকাশ করা হয়েছে।
- ✓ তাছাড়া IFC, FAO, UNIDO, USAID, USDA এর মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে খাদ্য নিরাপদতা শীর্ষক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, মতবিনিময় সভা, আইডিয়া শেয়ারিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে।
- ✓ খাদ্য নিরাপদতার নির্দিষ্ট বিষয় সংশ্লিষ্ট ৮টি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে যেখানে কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা সহ সেসকল বিষয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং এক্সপার্টদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা একটি বিশাল এবং সুশৃঙ্খল কাঠামো, যদি কোনো কারণে এই কাঠামোর একটি ছোট অংশও আপস করা হয়, তাহলে পুরো কাঠামো ভেঙে পড়বে। সীমিত জনবল নিয়ে এত বড় কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অন্যতম চ্যালেঞ্জ
- আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সমাজে খাদ্য নিরাপদতা সংস্কৃতির অনুপস্থিতি।
- হোটেল-রেস্তোরাঁ পর্যবেক্ষণ শেষে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে, তারা তাদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করে না।
- GHP, GMP, GAP বাস্তবায়নে সঠিক জ্ঞানের অভাব।
- নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের মধ্যে খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব।
- ঝুঁকি ভিত্তিক নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিদর্শন ব্যবস্থার সমন্বিত সহযোগিতার অভাব।
- সর্বস্তরে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে না পারায় অপুষ্টির উচ্চ হার এখনও একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা রয়ে গেছে।
- অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি সুবিধার এবং তাৎক্ষণিক পরীক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় কীট এবং যন্ত্রপাতির অভাব ।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অধিকতর কার্যকর ও দক্ষতার সাথে প্রয়োগের লক্ষ্যে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন/ সংযোজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মানের ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- পাইলটিং হিসেবে Artificial Ripening Chamber তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বাড়ানোর কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত বিশেষায়িত জনবলকে কর্মক্ষেত্রে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে দেশে এবং বিদেশে বিশেষ কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।
- বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপদতা ও পুষ্টি এবং বাণিজ্য সুবিধার জন্য BFSA এর ভূমিকা বৃদ্ধি করা।
- খাদ্য নিরাপদতা এবং পুষ্টি সম্পর্কিত সকল স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- একটি আন্তর্জাতিক মানের খাদ্য পরীক্ষাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- সাংগঠনিক কাঠামো এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা।
- খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অনিরাপদ খাদ্যের কুফলঃ

অনিরাপদ ও ভেজাল জাতীয় খাদ্য গ্রহণ একটি মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আর্থ-সামাজিক দিক থেকে বিভিন্ন ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন করছে। দূষিত খাবার গ্রহণে জীবাণু ঘটিত বিভিন্ন মারাত্মক রোগ যেমন- ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস সংঘটিত হয়। তাছাড়া ট্রান্স ফ্যাট যুক্ত ভাজা-পোড়া খাবার গ্রহণে বিভিন্ন কার্ডিওভাস্কুলার রোগ যেমন- হার্ট অ্যাটাক, ব্রেইন স্ট্রোক, উচ্চরক্তচাপ জনিত সমস্যা দেখা দেয়। ভেজাল ও দূষিত খাদ্য গ্রহণে অসুস্থ

মানুষের জীবন থেকে যেমন অনেক মূল্যবান কর্মঘন্টা নষ্ট হয়, তেমনি চিকিৎসা জনিত কারণেও আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, প্রতি বছর প্রায় ৬০ কোটি মানুষ দূষিত খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়। এ কারণে প্রতি বছর মারা যায় ৪ লাখ ৪২ হাজার মানুষ। এ ছাড়া ৫ বছরের চেয়ে কম বয়সী শিশুদের ৪৩ শতাংশই খাবারজনিত রোগে আক্রান্ত হয়, এর মধ্যে প্রতি বছর প্রাণ হারায় ১ লাখ ২৫ হাজার শিশু। জানা গেছে, ১৯৯৪ সালে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই স্যালমোনেলা জীবাণু বহনকারী আইসক্রিম খাওয়ার ফলে ২ লাখ ২৪ হাজার মানুষ রোগে আক্রান্ত হয়। ১৯৮৮ সালে দূষিত শামুক ও গলদা চিংড়ি খেয়ে চীনে প্রায় ৩ লাখ মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। ২০০৮ সালে চীনে তৈরি কয়েকটি কোম্পানির গুঁড়ো দুধ পান করে বহু শিশু রোগাক্রান্ত হয়। ওই দুধে মেলামাইনের মাত্রা বেশি ছিল। সার্বিক দিক থেকে চিন্তা করলে দেশের জনসম্পদ ও উন্নতির অন্তরায় হিসেবে অনিরাপদ খাদ্যকে চিহ্নিত করা যায়।

খাদ্যের নিরাপদতা নিয়ে জনমনে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাঃ

আমাদের সাধারণ মানুষের নিকট খাদ্যের নিরাপদতা নিয়ে বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও যথাযথ চর্চার অভাবে অনেক আগে থেকেই জনগনের মধ্যে এ ধারণা সমুহ প্রচলিত রয়েছে।

১। ফরমালিন নিয়ে একটি ধারণা রয়েছে যে, ফল ও শাক-সবজি তে ফরমালিন মিশিয়ে সেটিকে বিষাক্ত করা হয়, যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। সত্যিকার অর্থে ফরমালিন শুধুমাত্র আমিষ জাতীয় খাদ্যের সাথে কাজ করে। কিন্তু ফল ও শাকসবজিতে আমিষ এর পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় ফলের উপর যদি ফরমালিন মেশানোও হয়ে থাকে, তা কখনোই ফলের মধ্যে মিশবে না। তাই বাজার থেকে কিনে আনা ফল ও শাকসবজি পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে খেয়ে নিলে ফরমালিন বা ধুলোবালি ও কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের কোনো ভয় থাকে না।

২। আমরা প্রায় সময়ই চা পান করে থাকি। চা সাধারণত আমরা গ্রহণ করি ক্যাফেইন নামক একটি ক্যামিকেল এর জন্য যা আমাদের আবসাদ দূর করে। কিন্তু ১ মিনিটের বেশি কোনো চা পাতা গরম করলে তা থেকে ক্যাফেইনের পরিবর্তে ট্যানিন নির্গত হয়, যা আমাদের বৃক্কের বিভিন্ন রোগের জন্য দায়ী। তাই চা পাতা অনেকক্ষণ ধরে গরম করে লিকার বেশি করার প্রচেষ্টাও একটি অনিরাপদ প্রক্রিয়া।

৩। অনেক সময় আমরা দেখি ফল ঘরে অনেকদিন রেখে দেবার পরও ফল পচে যাচ্ছে না। অনেকেই মনে করেন ফলে ভেজাল মেশানো আছে। বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুলত ফলের বাইরের আবরণে এক ধরণের মোমের প্রলেপ পাওয়া যায় (এটি প্রাকৃতিকভাবে থাকে, অনেকসময় কৃত্রিম উপায়েও মেশানো হয়), যাতে করে ফলের ভেতরের জলীয় অংশসমুহ বাইরে বেরিয়ে না আসতে পারে কিংবা বাইরের কোনো পচনকারী জীবাণু ফলের ভেতর প্রবেশ করতে না পারে। এ ধরনের মোম কে এডিবল ওয়াক্স বলা হয়, যেটি সম্পূর্ণরুপে শরীরের জন্য নিরাপদ।

৪। অনেক সময় নকল চাল, নকল ডিম এ জাতীয় বিষয় সমুহ শোনা যায়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এ সমস্ত জিনিসের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি।

৫। বাইরে খাবার গ্রহণের বেলায় অনেক সময় লেখা কাগজে খাবার গ্রহণ কিংবা পরিবহণ করা হয়। এতে করে কাগজের লেখা কালি পানি কিংবা তেলের মাধ্যমে খাবারে চলে আসে যা আমাদের শরীরের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। খাবার গ্রহণ কিংবা পরিবহণে রঙ ও কালিবিহীন কাগজ ব্যবহার করতে হবে।

নিরাপদ খাদ্য ও SDG:

খাদ্য নিরাপদতা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ আলোচ্যসূচির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। খাদ্য নিরাপদতা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সকল লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখে। এটি ৩ নং লক্ষ্যমাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ (সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধ জীবন)। লক্ষ্যমাত্রা ১ (দারিদ্র্য বিমোচন), লক্ষ্যমাত্রা ২ (ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব) এবং লক্ষ্যমাত্রা ৬ (নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন) অর্জনে এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ৫ (লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন), লক্ষ্যমাত্রা ৮ (উৎপাদন মুখী কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি), লক্ষ্যমাত্রা ৯ (শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামগত উন্নয়ন), লক্ষ্যমাত্রা ১০ (বৈষম্য হ্রাস), লক্ষ্যমাত্রা ১১ (টেকসই নগর ও জনপদ), লক্ষ্যমাত্রা ১২ (সম্পদের উৎপাদন ও টেকসই ব্যবহার), লক্ষ্যমাত্রা ১৪ (জলজ জীবন), লক্ষ্যমাত্রা ১৫ (স্থলজ জীবন) -এর অভীষ্ট অর্জনে নিরাপদ খাদ্য অবদান রাখে।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্বঃ

গত ২৪ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। এ সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য যেমন গৌরবের, অনেক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলেছে তেমনি তা আমাদের জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে। উন্নয়নশীল দেশের কাতারে এসে নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে কৃষিজ পণ্যের রপ্তানি ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। সামনের দিন গুলোতে রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে WTO-SPS এর নিয়মানুসারে খাদ্য নিরাপদতার মানও বৃদ্ধি করতে হবে। একই সাথে GAP, GMP, GHP, GAqP প্রভৃতি বিষয়েও যথাযথ গাইডলাইন প্রয়োজন যেখানে খাদ্য নিরাপদতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে। তাছাড়া সুস্থ ও দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তুলতে নিরাপদ খাদ্য এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকার কর্তৃক গৃহীত ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০৪১, ডেলটা প্ল্যান –এর সঠিক বাস্তবায়নে নিরাপদ খাদ্যের রয়েছে কার্যকর ভূমিকা। তাছাড়া আমাদের ট্যুরিজম সেক্টরের উন্নয়নেও নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব অনেক।

স্মার্ট বাংলাদেশ ও খাদ্যের নিরাপদতাঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুখী- সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার দর্শনকে বাস্তবে পরিণত করার লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কণ্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদায় উন্নীতকরণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুস্থ ও কর্মক্ষম জাতি। শুধু তাই নয়, রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্য অর্জন হবে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচক্ষণতায় ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বল্প পুরণের পর গত ১২ ডিসেম্বর, ২০২২ সালে এই দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশের পরিণত করার ঘোষণা দেন যার মূল স্তম্ভগুলো হচ্ছে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নেন্স এবং স্মার্ট সোসাইটি। এ কথা অবশ্যই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উন্নত বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার মূল ভূমিকা পালন করবে সুস্থ এবং কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সুস্থ ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ। খাদ্যের মান ও নিরাপদতা নিয়ন্ত্রণে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ও রেগুলেটরি সংস্থা হিসেবে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রয়োগের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। 'জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য'- রূপকল্পকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাদ্য শৃঙ্খলের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে একসূত্রে আবদ্ধকরণ ও দেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পদার্পণ করবে। দেশের খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন ধাপে বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন হতে খাবার টেবিল পর্যন্ত খাদ্যকে জনগণের জন্য নিরাপদ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পর্যায়ে সমস্যাবলি ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। দেশে মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য সংস্থানের মাধ্যমে এসডিজি'র অভীষ্টসমূহ অর্জনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যশৃঙ্খলের নিরাপদতার মান উন্নয়ন, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর ৩৫ তম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ২য় বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। যুক্তরাজ্যের গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল ২০২১ অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখন যে ধরনের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হবে। সরকারে পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে একটি দক্ষ, কর্মক্ষম এবং সুস্থ জাতি বিনির্মাণের মাধ্যমে উন্নত দেশ হিসেবে তথা স্মার্ট বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করবে এবং সাথে সাথে দেশের সকল মানুষের পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে- এ প্রত্যাশা হোক আমাদের সকলের।

———— ০ ————

খাদ্যের নিরাপদতা এবং আমার ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা

ফেরদৌস আহমেদ, এমপি
মাননীয় সংসদ সদস্য
ও শুভেচ্ছাদূত
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে প্রথম ও প্রধান হলো খাদ্য। মানব সভ্যতার শুরু থেকে এখন অব্দি এবং মানুষ যতদিন বাঁচবে খাদ্যই তার প্রধান চাহিদা থাকবে। তবে খাদ্য বলতে আমরা কী বুঝি? ক্ষুধা নিবারণ বা বৈচিত্র্যময় স্বাদ গ্রহণের জন্য যা কিছু খাওয়া হয়, সবই কি খাদ্য? প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তেমন নয়। জীবনধারণের জন্য খাদ্য অপরিহার্য হলেও, তার চেয়েও বেশি জরুরি নিরাপদ খাদ্য। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা কিছু খাচ্ছি তার কতটুকু নিরাপদ বা স্বাস্থ্যসম্মত তা বলা সত্যিই মুশকিল।

আমার শিক্ষা জীবন থেকে পেশাগত জীবনে বাড়ির বাইরে খাবার খাওয়া নিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছি - আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন কোন ব্যক্তিগত পানির বোতল ছিল না। একদিন হঠাৎ আমার প্রচন্ড পানির পিপাসা পায় এবং আমি বাধ্য হয়ে রাস্তার পাশের পানির টেপ (কল) থেকে পানি পান করি। ফলস্বরূপ পরবর্তী প্রায় ৬ মাস আমাকে পেটের অসুখে ভুগতে হয়। এরপর থেকে খাদ্য ও পানীয় নিয়ে আমি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করি।

সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাবার। কিন্তু, দৈনন্দিন জীবনে হাজারো কাজের ভীড়ে বাড়িতে বসে পুষ্টিকর ও মানসম্মত খাবার গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলস্বরূপ, বিকল্প হিসেবে আমাদের বাইরের খাবারের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ আমার মতো অসংখ্য মানুষ না বুঝে বিভিন্ন অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, যা শুধু ব্যক্তির ক্ষতি নয়, বরং সমাজের সার্বিক কর্মক্ষমতা হ্রাসেও ভূমিকা রাখে। তাই, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিতে সরকারের উদ্যোগে আমাকে, আপনাকে এবং সমাজের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

অনিরাপদ বা অস্বাস্থ্যকর খাবারের কথা বললে সর্বপ্রথম উঠে আসে স্ট্রিটফুডের কথা। এটি খাবারের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ধরণ বা মাধ্যম হলেও, স্ট্রিটফুড অন্য যেকোন স্থানের খাবারের তুলনায় বেশি অস্বাস্থ্যকর। আবার শহরের অলি-গলিতে গড়ে উঠেছে ছোট-বড় বিভিন্ন ফাস্টফুডের দোকান, ফুডকোর্ট ইত্যাদি। এগুলো আজকাল ফুটপাতের একটি অংশ হয়ে উঠেছে। এসব দোকানে চলছে কম-দামে নানা ফাস্টফুড জাতীয় খাবারের রমরমা বেচাকেনা। খাবার সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় করে তুলতে এসবে ব্যবহার করা হচ্ছে স্বাদবর্ধক নানা উপাদান। অনেকেই না জেনে এসকল অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করছে, আবার কিছু মানুষ আছে যারা জেনে-শুনেই এসব খাবারের স্বাদ নিতে ভীড় জমাচ্ছেন। এসব খাবারের জনপ্রিয়তার অন্যতম একটি কারণ খাবারের স্বল্প দাম। যেই বার্গার, নুডুলস বা স্যান্ডউইচ খেতে ভালো কোন দোকানে ২০০-৩০০ টাকা গুনতে হবে, সেই খাবারটি রাস্তার ধারের ছোট্ট দোকানটিতে পাওয়া যাবে ৫০-১০০ টাকায়। কিন্তু এটি কেউ ভাবছে না যে এই খাবারগুলো কীভাবে তৈরি হচ্ছে, কি কি উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে, মেয়াদোত্তীর্ণ কিনা। একটা বিষয় সকলের জেনে রাখা ভালো, খাবার যত রঙিন হবে ভেজাল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি!

বর্তমানে আবার ফুড-ব্লগিং বা ফুড-রিভিউ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অনেক বিক্রেতারা সেই সুযোগকেও কাজে লাগাচ্ছে। খাবারের মান যাই হোক, একজন ফুড-ব্লগারকে দিয়ে তার দোকান ও পণ্যগুলোর আকর্ষনীয় ভিডিও বানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করছে। মানুষও সেই ডাকে সাড়া দিচ্ছে। এসব অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিৎ এবং এসব খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করাই উত্তম।

কেউ কেউ বলেন, আজকে বাড়িতে না খেয়ে বাইরে খাবো। বাড়ির বাসি খাবারের চেয়ে হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ফাস্টফুড, রাস্তার পাশে বিক্রি করা খাবারগুলো ভালো! কারণ হিসেবে বলেন, এখানে খাবারগুলো দিনের টা দিনেই বিক্রি হয়ে যায়, সেদিক থেকে এটি বাসি বা

অনিরাপদ হওয়ার সম্ভাবনা কম। এমন চিন্তা আদৌ কি সত্যি? একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে খাবার তৈরি, পরিবেশন বা বিক্রি তাদের ব্যবসা, আর সকল ব্যবসায়িই চায় ব্যবসায় খরচ কমিয়ে মুনাফা বেশি করতে। আর ব্যবসায়ি যদি অসাধু হয় তাহলে সে গ্রাহকের কথা বিবেচনা না করে শুধু তার ব্যবসায় লাভের চিন্তাই করবে। তাই আমরা কি খাচ্ছি, কোথায় খাচ্ছি এসব নিয়ে সচেতন থাকতে হবে।

ফুড-গ্রেড নয় এমন রং খাবারে ব্যবহার করা, মেয়াদোত্তীর্ণ উপকরণ, মসলা, বাহিরের ধুলা-বালি সমন্বিত খাবারগুলো দ্বারা অনেক রোগ-জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে। এছাড়াও, খাদ্য উৎপাদনের উপকরণেই এখন পাওয়া যায় নানারকম ভেজাল। ফসলে কীটনাশকের অপপ্রয়োগ এবং মাত্রাতিরিক্ত সার ব্যবহার, খাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতি ইত্যাদি ভয়ঙ্কর কিছু বিষয় নিয়ে আমরা ভাবছিই না! আমার মতে, নিরাপদ খাদ্য নিয়ে এতোসব আতঙ্কের মূল কারণ হলো প্রতিনিয়ত খাদ্যে ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাবারের সহজলভ্যতা।

খাদ্যের গুণাগুণ তো দূরের কথা, সেটি কতটা নিরাপদ সেই বিষয়ে খাদ্য নিয়ে যারা কাজ করেন বেশির ভাগেরই কোনো মাথাব্যথা নেই। নিরাপদ খাদ্য হলো মানসম্মত, ভেজালমুক্ত ও সঠিক গুণাগুণসমৃদ্ধ খাবার। অথচ আমাদের এখানে যেন-তেনভাবে পেট ভরলেই তাকে খাবার হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। গড্ডলিকা মানুষ মনে করে খাবার খেলেই হলো। পুষ্টি কি আর নিরাপদ খাদ্য কি - এসব বিষয় নিয়ে তাদের কিছু যায় আসে না। তবে নামিদামি খাবার মানেই যে তা পুষ্টিকর তাও কিন্তু ভুল। অল্প দামের খাবারও যে অনেক নামিদামি খাবারের চেয়ে বেশি পুষ্টিকর হতে পারে সে বিষয়টি অনেকেরই অজানা। খাবার কেনা বা গ্রহণ করার সময় দাম যাচাই না করে সেটির গুণাগুণ ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করাটা বেশি জরুরি।

সরকার নানা ধরণের সচেতনতা কার্যক্রম, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে খাবারের মান ও নিরাপদতা নিশ্চিতের চেষ্টা করছে। আমি নিজেও ঘুরে ঘুরে ব্যবসায়ি, ক্রেতা, ভোক্তা, জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা করছি। তবে, জনগণকে নিজেদেরও এই বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে হবে। সকলের উচিৎ নিজ নিজ অবস্থান থেকে এসব অস্বাস্থ্যকর খাদ্য বর্জন করা। এতে করে অসাধু ব্যবসায়িরাও নিজ উদ্যোগে খাবারের মান বজায় রাখতে বেশি মনোযোগী হবে।

আর কিছুদিন পরই রমজান মাস। আর এই সময়টিতে ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ধনী-গরিব সকলের নাভিশ্বাস উঠে যায়। যেসব অসৎ-চক্র মূল্যবৃদ্ধির সাথে জড়িত, তাদের ধরার জন্য সরকার বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে। ইফতারিতে ভেজাল খাদ্য ব্যবসায়ীরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠেন। পেঁয়াজি, বেগুনি, চপ, ছোলা, জিলাপিসহ নানা মুখরোচক খাবার তৈরির প্রতিযোগিতা লেগে যায়। আমাদের সামনেই এসব খাবার পুরানো বা ব্যবহৃত তেলে ভাজা হয়, বাড়তি মেশানো রঙগুলোও আমরা দেখতে পাই। তবুও আমরা কিনি, নিজেরা খাই, পরিবার ও সন্তানদের খাওয়াই। স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ও অন্যের বিনা প্ররোচনায় আমরা আত্মঘাতী পথ বেছে নেই। আমাদের খাদ্য আদালত আছে, আইন আছে, ফৌজদারী কার্যবিধি আছে, দণ্ডবিধি আছে, কিন্তু নিজেরা সচেতন না হলে এসবই বৃথা।

রমজান শুরু হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দোকান, হোটেল, সুপারশপে অভিযান পরিচালনা করে থাকে। সচেতনতার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। গণমাধ্যমে সে খবর নিয়ে আম-জনতা একটু কথাবার্তা বলে। তারপর আবার যা তা-ই। আমি ভোক্তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, এসব অসাধু চক্রকে এবং এদের তৈরি খাদ্যকে সামগ্রিক বর্জন করা উচিৎ। এতে করে সিন্ডিকেট ভেঙ্গে পড়বে এবং ভবিষ্যতে এসব গর্হিত কাজ থেকে তারা বিরত থাকবে।

দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমিও রমজান মাসে হেঁটে হেঁটে সচেতনতা কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে নিরাপদ ইফতার বিষয়ে সচেতনতার বার্তা দেই। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে আমি আমার ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ব্যক্তিগত কোন কিছু পাওয়ার আশা না করে, শুধুমাত্র দেশ এবং জনগণের স্বার্থে অল্প হলেও অবদান রাখতে পারবো এই চিন্তা থেকেই অংশগ্রহণ করি। বর্তমানে আমি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে দায়িত্বপালন করছি।

সকলের প্রতি আমার আহবান, সকলে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ ও অনিরাপদ খাদ্য নির্মূলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হোন এবং অন্যকে সচেতন করুন। গড়ে তুলুন সুস্থ ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ।

———— ০ ————

নিপাহ ভাইরাস; খেজুরের কাঁচা রস পরিহার করুন

ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ
ইমেরিটাস অধ্যাপক
প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক

খেজুরের কাঁচা রস খেয়ে যে কোনো রোগী জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শ্বাসকষ্ট বা অজ্ঞান হলে দেরি না করে নিকটস্থ রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করুন। প্রয়োজনে হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে। তাছাড়া নিপাহ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়া কোনো দেশ থেকে কেউ বাংলাদেশে এলে তাকে অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

নিপাহ ভাইরাস অতি সহজেই বাদুড় জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। শুধু বাদুড় নয়, শূকরের বর্জ্য থেকেও ছড়াতে পারে। ১৯৯৮ সালে মালায়েশিয়ার 'সুঙ্গাই নিপাহ' গ্রামে প্রথম এই ভাইরাসের প্রকোপ দেখা দেয়। পরবর্তীতে ওই গ্রামের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় 'নিপাহ' ভাইরাস। সেখানে বাড়ির পোষ্য কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, ছাগলের দেহে এই ভাইরাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ওই অঞ্চলে প্রতিটি বাড়িতেই শূকর প্রতিপালন হয়। গবেষণার পর দেখা যায়, শূকর থেকেই নিপাহ ভাইরাস ছড়িয়েছে পোষ্যদের দেহে। ভাইরাসটি আবিষ্কার করেন ড. কো বিং চুয়া।

বাংলাদেশে প্রথম নিপাহ ভাইরাস শনাক্ত হয় ২০০১ সালে মেহেরপুরে। ওই বছর শনাক্ত হয় ১৩ জন এবং অনেকেই মারা যায়। ২০০৪ সালে দেশে খেজুরের রস খেয়ে সর্বোচ্চ ৬৭ রোগী শনাক্ত হয়েছিল এবং মারা গেছে ৫০ জন। ২০১২ সালে এ রোগে আক্রান্ত হয় ১৮ জন। সর্বশেষ, গত সাত বছরের মধ্যে ২০১৬ সালে কোনো রোগী শনাক্ত হয়নি। কিন্তু ২০১৭ সালে ৩ জন, ২০১৮ সালে ৪ জন, ২০১৯ সালে ৮ জন, ২০২০ সালে ৭ জন, ২০২১ সালে ২ জন ও ২০২২ সালে ৩ জন শনাক্ত হয়।

গত ২৩ বছরে দেশে ৩৩৯ জন নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ২৪০ জন মারা গেছে। সবচেয়ে বেশি ৭১ জন শনাক্ত হয় ফরিদপুরে। এরপর রয়েছে রাজবাড়ীতে ৩৫, নওগাঁয় ৩২, লালমনিরহাটে ২৪, মানিকগঞ্জে ১৭, রংপুরে ১৬, মেহেরপুরে ১৩ জন। দেশের ৩৪টি জেলায় এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশকে এ রোগের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নিপাহ ভাইরাসের বাহক এবং কিভাবে ছড়ায়– নিপাহ ভাইরাস একটি জুনোটিক ভাইরাস, অর্থাৎ প্রাণীর মাধ্যমে মানবদেহে আসে। প্রাণীর দ্বারা দূষিত খাবার বা আক্রান্ত ব্যক্তি থেকেও ভাইরাসটি ছড়াতে পারে। নিপাহ ভাইরাস ছড়ায় মূলত পশুপাখি, বিশেষ করে বাদুড়ের মাধ্যমে। বাদুড় থেকে মানুষে এই রোগের সংক্রমণ হয়। বাংলাদেশে শীত মৌসুমে ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। সাধারণত খেজুরের কাঁচা রস পানের মাধ্যমে এই ভাইরাস সংক্রমিত হয়।

কারণ, এই সময়টাতেই খেঁজুরের রস সংগ্রহ করা হয়। আর বাদুড় গাছে বাঁধা হাঁড়ি থেকে রস খাওয়ার চেষ্টা করে বলে ওই রসের সঙ্গে তাদের লালা মিশে যায়। এমনকি রস খাওয়ার সময় বাদুড় মলমূত্র ত্যাগ করলে সেই রসে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। বাদুড় নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকলে এবং সেই রস খেলে, মানুষের মধ্যেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও বাদুড়ে খাওয়া ফলমূলের অংশ খেলেও রোগ ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ– নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ হলে কেউ কেউ উপসর্গহীন থাকতে পারে। কারও আবার শুধু সাধারণ জ্বর-কাশি দেখা দিতে পারে। তবে সবচেয়ে জটিল অবস্থা হলো, যখন মস্তিষ্কে সংক্রমণ বা এনকাফালাইটিস দেখা দেয়। নিপাহ ভাইরাস শরীরে প্রবেশের ৫ থেকে ১৪ দিন পর রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তবে লক্ষণ প্রকাশ ছাড়াও ৪৫ দিন পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় ভাইরাসটি শরীরের মধ্যে থাকতে পারে। শুরুতে প্রচণ্ড জ্বর, মাথা ও পেশিতে ব্যথা, ঝিঁচুনি, শ্বাসকষ্ট, কাশি, পেট ব্যথা, বমি ভাব, দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

এ রোগে মস্তিষ্কে এনসেফালাইটিস জাতীয় ভয়াবহ প্রদাহ দেখা দেয়। একপর্যায়ে রোগী প্রলাপ বকতে শুরু করে, ঘুমঘুম ভাব, মানসিক ভারসাম্যহীনতা এবং অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। সময়মতো চিকিৎসা না হলে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর যারা বেঁচে যান তারা অনেকেই স্মৃতি হারিয়ে ফেলেন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে না, এমনকি পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন চিরতরে।

নিপাহর পরীক্ষা– এলাইজা টেস্ট, পিসিআর, সেল কালচার প্রভৃতি পরীক্ষার মাধ্যমে এ ভাইরাস শনাক্ত করা সম্ভব।

চিকিৎসা– এখন পর্যন্ত নিপাহ ভাইরাসের কোনো ওষুধ নেই। রোগের লক্ষণ দেখা মাত্রই রোগীকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে, প্রয়োজনে আই.সি.ইউ.ও লাগতে পারে। সাধারণত লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হয়। আক্রান্ত রোগীর দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থা করলে জীবন রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সেবাদানকারী স্বাস্থ্য কর্মীদের সতর্কতা– এ রোগে আক্রান্তদের পরিচর্যা করতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। রোগীর চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্সদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। যেমন– মুখে মাস্ক, হাতে গ্লাভস, সারা শরীর আবৃত করে গাউন বা পি.পি.ই ব্যবহার করতে হবে। রোগী দেখার পর হাত ভালোভাবে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করা খুবই জরুরি। রোগীর ব্যবহৃত কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী ভালোভাবে পরিষ্কার না করে আবার ব্যবহার করা যাবে না। রোগীর কফ ও থুথু যেখানে সেখানে না ফেলে একটি পাত্রে রেখে পরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

রোগ প্রতিরোধের জন্য– শীতের সময়ে খেজুরের রস পান করা খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

(১) খেজুরের কাঁচা রস পান করা উচিত নয়। পান করতে হলে ফুটিয়ে নিতে হবে। তবে খেজুরের রসের তৈরি গুড় ক্ষতিকর নয়।
(২) গাছ থেকে খেঁজুরের রস সংগ্রহের হাঁড়ি ঢেকে রাখতে হবে।
(৩) যারা রস সংগ্রহ করে, তারা যেন সতর্ক থাকে। কারণ, হাঁড়ির আশপাশে বাদুড়ের লালা লেগে থাকতে পারে। মাস্ক পরতে হবে এবং রস সংগ্রহের পর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
(৪) ফলমুল পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে খেতে হবে। পাখি বা বাদুড়ে খাওয়া আংশিক ফল যেমন-আম, লিচু, জাম, জামরুল, গোলপজাম, কাঁঠাল, ডেউয়া, পেঁপে, পেয়ারা, বড়ই ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো।
(৫) আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে এবং রোগীর পরিচর্যা করার পর সাবান ও পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে।

সাবধানতা– এই রোগের কোনো টিকা আবিষ্কার হয়নি। তাই ব্যক্তিগত সচেতনতা এবং সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। নিচে কিছু টিপস দেওয়া হলো-

(১) যেহেতু নিপাহ ভাইরাস শরীরে প্রবেশের ৫ থেকে ১৪ দিন পর রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাই নিকট সময়ে যারা খেজুরের রস খেয়েছেন, তাদের সবাইকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।
(২) আক্রান্ত মানুষ থেকে মানুষেও ছড়াতে পারে এ রোগ। তাই যারা রোগীদের সেবা দিয়েছেন এবং মৃতদের সৎকার করেছেন, তাদের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।
(৩) রোগীর সঙ্গে একই পাত্রে খাওয়া বা একই বিছানায় ঘুমানো যাবে না।
(৪) রোগীর ব্যবহৃত কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
(৫) রোগীর কফ ও থুথু একটি পাত্রে রেখে পরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
(৬) রোগীর শুশ্রূষা করার সময় মুখে কাপড়ের মাস্ক, হাতে গ্লাভস পরে নিতে হবে।
(৭) যে এলাকায় নিপাহ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, সে এলাকায় নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ বন্ধ হওয়ার পর আরও অন্তত ২১ দিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে। যে এলাকায় প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, সেখানে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

খেজুরের কাঁচা রস খেয়ে যে কোনো রোগী জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শ্বাসকষ্ট বা অজ্ঞান হলে দেরি না করে নিকটস্থ রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করুন। প্রয়োজনে হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে। তাছাড়া নিপাহ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়া কোনো দেশ থেকে কেউ বাংলাদেশে এলে, তাকে অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

———— ০ ————

আগামী দিনের বাংলাদেশ ও নিরাপদ খাদ্য

ড. আতিউর রহমান
সাবেক গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশের মানুষের ভালো মতো খেয়ে-পরে বাঁচার নিশ্চয়তা বিধানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বৈরি ভূ-রাজনীতি ও প্রতিকূল প্রকৃতি ইত্যাদি নানামুখি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই তিনি তাই দ্রুততম সময়ের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির আশাব্যঞ্জক ধারা তৈরি করতে পেরেছিলেন। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে শারীরিকভাবে হারানোর পর ঐ ধারা নানামাত্রায় বাধাগ্রস্ত হলেও বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে গেছে। বিশেষত বিগত ১০-১৫ বছরে কৃষিখাতে বৈপ্লবিক রূপান্তর আমাদের সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে অতুলনীয় ভূমিকা রেখেছে- এ কথা মানতেই হবে। ২০০৯ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ৩৮ লাখ ৩৩ হাজার মেট্রিক টন। বর্তমানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ৪ কোটি ৫৩ লাখ ৪৪ হাজার মেট্রিক টন। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে ৩য়, সবজি উৎপাদনে ৩য়, আম উৎপাদনে ৭ম, আলু উৎপাদনে ৭ম এবং পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম স্থানে থেকে বিশ্বপরিমন্ডলে সমাদৃত।

সার্বিক বিচারে বলা যায় আমরা বহুলাংশেই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি, বাজার ব্যবস্থার অদক্ষতা ইত্যাদিসহ নানা কারণে এখনও দেশের পরিবারগুলোর এক-পঞ্চমাংশের বেশি মধ্যম মাত্রার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে জানা গেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে। যেহেতু ১৮.৭ শতাংশ পরিবার এখনও দারিদ্র্য রেখার নিচে রয়েছে সে বিচারে ২০-২১ শতাংশ পরিবার মধ্যম মাত্রার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগাটি অস্বাভাবিক নয়। তবে অবশ্যই দুঃখজনক। তবে কৃষিতে যান্ত্রীকীকরণের প্রশংসনীয় বিস্তার (প্রায় শতভাগ চাষকাজে যন্ত্রের ব্যবহার), সোলার ইরিগেশন পাম্পের ব্যবহারের মাধ্যমে সেচকাজে নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার (১৫,০০০ এসআইপি) এবং সর্বোপরি জলবায়ুবান্ধব কৃষির বর্ধিষ্ণু চোখ পড়ছে। উল্লেখ্য, বিগত এক দশকে ১০৯টি জলবায়ুবান্ধব বীজ আবিষ্কার করেছেন আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা। এসবের কারণে একথা বলাই যায় যে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে আমরা সঠিক পথেই হাঁটছি। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে বাংলাদেশের ধারাবাহিক উন্নতিও সে কথাই বলে। ঐ সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ২০০৮-এ ৩০.৬ থেকে ক্রমান্বয়ে কমে ২০২৩-এ ১৯.০ হয়েছে (স্কোর যতো কম ক্ষুধা ততো কম)।

এ কথা তো মানতেই হবে যে কয়েক দশক আগেও সকল নাগরিকের জন্য ঠিক মতো খাবারের ব্যবস্থা করাটিই ছিল আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকেই দিতে হয়েছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এমন কি দারিদ্র্য হার উল্লেখ্যযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনার পরও সর্বশেষ রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে অস্থিরতার কারণে আমাদের দেশে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের দাম আকস্মিক বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়তে হয়েছিলো কম আয়ের পরিবারগুলোকে। বাজার ব্যবস্থাপনায় নিশ্চয় দুর্বলতা ছিল এবং এখনও আছে। বিনিময় হারের অস্থিরতার সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা কোন কোন খাদ্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় বলে প্রায়ই বিপদে পড়তে হচ্ছে মানুষকে। অভ্যন্তরীণ সরবরাহ কাঠামোর সীমাবদ্ধতার কারণে খাদ্য মূল্যস্ফীতি শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে বেশি (সর্বত্রই এই হার দুই অঙ্কের ঘরে গিয়ে ঠেকেছে)। ফলে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এখনও আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তবে একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সকলের জন্য দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের ব্যবস্থা করার যে পর্যায় সেটি আমরা অতিক্রম করে এসেছি। বাংলাদেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। অচিরেই আমরা পেতে যাচ্ছি উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা। ২০৩০-এর মধ্যে আমরা বিশ্বের নবম বৃহত্তম কনজ্যুমার ইকোনমি হতে যাচ্ছি। আগামী ১৫-২০ বছরের মধ্যে আমাদের অর্থনীতির আকার এক ট্রিলিয়ন ডলার হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে। এহেন বাস্তবতায় মানুষ খেতে পেল কি-না, অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি ছাড়াও মানুষ ভালো খেতে পেল কি-

না, অর্থাৎ নিরাপদ খাদ্যের দিকটি নিয়েও আমাদের ভাবা চাই। এই প্রেক্ষাপটেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের দুই তারিখে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালন করছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। এবার তা পালিত হচ্ছে সপ্তম বারের মতো। এ দিবসকে কেন্দ্র করে নতুন করে ভাবতে হবে যে আগামী দিনগুলোতে আমাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবায়নের অভিযাত্রায় আমরা যে খাবার খাচ্ছি তার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে আমাদের কি করণীয় রয়েছে।

প্রথমেই আসে মাঠে বা খামারে যে খাদ্য তৈরি হচ্ছে তার প্রসঙ্গ। ফসল উৎপাদনে বিভিন্ন রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের অপরিকল্পিত ব্যবহার ইতোমধ্যেই আমাদের দুর্ভাবনার কারণ হয়ে উঠেছে। যেমন: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-এর ২০২১ সালের এক গবেষণা জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বেগুন, ফুলকপি, বরবটি ও শিম- এই চার ধরনের সব্জির ১১-১৪ শতাংশের মধ্যেই ক্ষতিকর মাত্রায় রাসায়নিক কীটনাশকের উপস্থিতি রয়েছে। পোল্ট্রি ও মাছের খাবারেও বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতির খবর প্রায়ই দেখা যায়। বৃহদাকার খাদ্য উৎপাদনকারিরা যেন এহেন চর্চা থেকে বেরিয়ে আসেন সেটি দেখার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। তবে ছোট চাষী বা খামারিরা যেন যথাযথ নিয়ম মেনে রাসায়নিক ব্যবহার করেন তা নিশ্চিত করতে তাদের মধ্যে ব্যাপকভিত্তিক সচেতনতা তৈরি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। আশার কথা অনেকেই বিশেষত তরুণ উদ্যোক্তারা আজকাল প্রাকৃতিক কৃষি উৎপাদন ও তার ডিজিটাল বাজারজাতকরণে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এক্ষেত্রে আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের ভূমিকাও ইতিবাচক। প্রাকৃতিক কৃষিপণ্যের প্রতি সাধারণ গ্রাহকদের আগ্রহ বাড়লে অপরিকল্পিত মাত্রায় সার-কীটনাশক ব্যবহারে সকলেই নিরুৎসাহিত হবেন। তবে একথাও ঠিক যে আমাদের জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। অন্যদিকে কৃষি জমির পরিমাণও কমছে (বছরে ৮০ হাজার হেক্টর জমি চলে যাচ্ছে অকৃষি খাতে)। সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি তো রয়েছেই। তাই কেবল প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের বিস্তার কোন টেকসই সমাধান নয়। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতেই হবে। তবে তা যেন নিরাপদভাবে প্রয়োগ করা হয় সেটিকে দিতে হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণরা যতো বেশি কৃষির প্রতি আকৃষ্ট হবেন ততোই নিরাপদ কৃষি উৎপাদনের বিকাশ সহজতর হবে বলে আমার মনে হয়।

দ্বিতীয়ত যে বিষয়টির দিকে নজর দেয়া দরকার তা হলো উৎপাদিত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ। কেননা মাঠে বা খামারে যতোই নিরাপদভাবে খাদ্য উৎপাদন করা হোক না কেন, প্রক্রিয়াজাত করার সময় বা বাজারজাত করার সময় যদি মান নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তা হলে আমাদের টেবিলে পৌঁছানো খাবারগুলো আর নিরাপদ থাকবে না। বৃহদাকার খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে বাংলাদেশ ভালো করছে। বছরে এখন ১.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের খাদ্য আমরা এখন রপ্তানি করছি। প্রায়ই শোনা যায় রপ্তানি করার ক্ষেত্রে যে মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়, দেশের ভেতরে বিক্রি হওয়া প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে তা হয়না। কখনো বা বাজারজাতকরণের পদ্ধতির কারণেও খাদ্যের মান ক্ষুণ্ন হওয়ার কথা শোনা যায়। যারা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবসায় জড়িত তাদের মনিটরিং করার দায়িত্বটি বিএসটিআইয়ের। এই প্রতিষ্ঠানের লোকবল ও দক্ষতা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। দেশের অভ্যন্তরে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবারের বাজার যে হারে বেড়েছে বিএসটিআইয়ের জনবল ও দক্ষতা সে অনুপাতে বাড়েনি বলা চলে। তবে কেবল লোকবল বৃদ্ধি কিংবা তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বাজারের সঙ্গে তাল মেলানো সম্ভব হবে না। আধুনিক বিশ্বে তা কাম্যও নয়। বরং ডিজিটালাইজেশনকেই সমাধানের পথ হিসেবে বেছে নিতে হবে। একটি ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড এক্ষেত্রে আদর্শ সমাধান হতে পারে। যেমন: কোন একটি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারি কোম্পানি বিভিন্ন কাঁচামাল কোথা থেকে কবে কিনেছে তা ড্যাশবোর্ডে তারা আপলোড করতে পারে। এ কাঁচামাল দিয়ে কতোদিনের মধ্যে প্যাকেটজাত খাদ্য উৎপাদন করাটি নিরাপদ তা জানা থাকবে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্তাদের। কোম্পানিটি ঐ কাঁচামাল দিয়ে প্যাকেটজাত খাদ্য তৈরি করে কবে কারখানা থেকে তা বাজারে ছাড়লো সেই তারিখটিও তারা আপলোড করবে। দুই তারিখের মধ্যে পার্থক্য থেকেই নিয়ন্তারা বুঝতে পারবেন কাঁচামাল থেকে প্রক্রিয়াজাত খাবার প্রস্তুত হওয়ায় যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে কি-না। কোন কাঁচামাল বেঁচে গেলে সেটাও বোঝা যাবে। সঠিক তারিখ ও তথ্য আপলোড করা হচ্ছে কি-না তা যাচাই করা যাবে কাঁচামাল কেনা ও প্যাকেটজাত খাবার বাজারজাতকরণের রশিদ থেকে। এ জন্য অবশ্যই সকল কেনাকাটা আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে করতে হবে। এজন্যে এনবিআর ও বিএসটিআইকে একসঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। প্যাকেটজাত খাবার বাজারজাতকারিদের মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব।

রেস্টুরেন্টের খাবার নিয়েও আমাদের দুর্ভাবনার কারণ রয়েছে। কেননা পত্রপত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায় যে, অখ্যাত খাবারের দোকান তো বটেই এমনকি স্বনামধন্য দামী রেস্টুরেন্টকেও মাঝে মাঝে জরিমানা গুনতে হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার রান্না ও পরিবেশনের দায়ে। বড় শহরগুলোতে জনপ্রশাসনের কর্মকর্তারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে এমন শাস্তি দিয়ে থাকেন। প্রথমত যতো খাবারের দোকান বা রেস্টুরেন্ট রয়েছে সে তুলনায় এমন মোবাইল কোর্টের সংখ্যা বাস্তব কারণেই অপ্রতুল। দ্বিতীয়ত ছোট শহর বা গ্রামাঞ্চলের খাবারের দোকানগুলোতে এহেন তদারকির ব্যবস্থা একেবারেই নেই। ফলে আমাদের অবশ্যই বিকল্প ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে তদারকির দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণের কথা ভাবা যায়। যেমন: রেস্টুরেন্ট বা খাবারের দোকানগুলোতে মানসম্পন্ন খাবার দেয়া হচ্ছে কি-না

তা তদারকির কাজ স্থানীয় সরকারকে দেয়া যায়। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদগুলো তখন স্থানীয় তরুণ ও গণমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে মনিটরিংয়ের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে এগুতে পারে। স্থানীয় সরকারের কার্যালয়গুলোতে এ বিষয়ে পরামর্শ/অভিযোগের জন্য একটি সেল থাকতে পারে। পাইলট ভিত্তিতে হলেও এমন উদ্যোগের কথা ভাবা যেতে পারে।

বাইরে থেকে যতোই নিরাপদ শাক-সব্জি, ফলমূল কিংবা মাছ-মাংস বাসায় নিয়ে আসা হোক না কেন রান্না করার কিংবা ফ্রিজে সংরক্ষণের ভুলের কারণে সেই খাবারও কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অথচ এ দিকটি নিয়ে একেবারেই আলোচনা হয় না। আধুনিক জীবনচলার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে এখন আয়-শ্রেণী নির্বিশেষে শহারঞ্চলের অধিকাংশ পরিবারেই প্রতি বেলায় খাবার রান্না করে খাওয়ার চল নেই। ফ্রিজে রেখেই খেতে হয়। গ্রামাঞ্চলেও এই চর্চা এখন বাড়ছে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন খাবার কিভাবে কতোদিন সংরক্ষণ করা যাবে; কাঁচা খাদ্য ও রান্না করা খাবার কিভাবে আলাদা আলাদা করে সংরক্ষণ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে তাই সকলের সচেতন থাকা খুব দরকার। বাজার থেকে খাবার আনার পর রান্না বা সংরক্ষণের আগে করণীয়গুলো নিয়েও সচেতন থাকা চাই। আশার কথা আমাদের নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা" শিরোনামে একটি পুস্তিকা বের করেছে। এর বহুল প্রচারণা খুবই দরকার। এই প্রচার ইউটিউবসহ সামাজিক মাধ্যমেও হলে ভালো হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা ও লক্ষ্য' প্রবন্ধে লিখেছেন- "যে জাতি উন্নতির পথে বেড়ে চলেছে তার একটা লক্ষণ এই যে, ... যথাসম্ভব তাদের সকলেই মনুষ্যত্বের পুরো গৌরব দাবি করবার অধিকার পাচ্ছে। এই জন্যই সেখানে মানুষ ভাবছে কি করলে সেখানকার প্রত্যেকেই ভদ্র বাসায় বাস করবে, ভদ্রোচিত শিক্ষা পাবে, ভালো খাবে, ভালো রবে, রোগের হাত থেকে বাঁচবে এবং যথেষ্ট অবকাশ ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে।" বাংলাদেশও 'উন্নতির পথে বেড়ে চলেছে'। কাজেই আমাদেরকেও এখন সকলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সেই খাবার যেন ভালো হয়, নিরাপদ হয়- তা নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। তবে কেবল মোবাইল কোর্ট কিংবা প্রশাসনের দিকে চেয়ে থাকলে হবে না। সমাজকেও দায় নিতে হবে। ফসলের মাঠ থেকে ডাইনিং টেবিল পর্যন্ত নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করতে তাই বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

———————— ০ ————————

WHO ASKED BFSA TO HARMONIZE FOOD STANDARDS WITH CODEX?

Sanjay Dave
Chairman
Codex Alimentarius Commission (a UN - FAO/WHO - body for food standards)

And why did they do so? This is another pertinent question.

Well! the answer is written on the wall. Following Bangladesh's independence, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shared his vision to advocate food and nutrition security for the people of Bangladesh. Hon'ble Prime Minister, Sheikh Hasina took the initiative in the Parliament to enact the Food Safety Act in 2013. This was soon followed by the establishment of the Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) in 2015 to implement the Act. This clearly was a policy decision of the government to underline the fact that unsafe food is not food.

But where was the need to do all this when Bangladesh already had a national level organization called the Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI)? It was established way back in 1971 with the mandate to set standards for everything including food products. The answer is again written on the wall. The aim of the Prime Minister was to give a focus to the food sector because of the importance to public health, with due importance to their quality and safety. And, in this context, during the National Food Safety Day Conference in 2018, she even announced that manpower having food science background be added to BFSA and that their laboratories be strengthened. Consequently, one objective that was specifically mentioned in the 8th Five Year Plan (2020-2025) was to strengthen the food testing capacity by establishing BFSA reference laboratory and to improve other public laboratories.

Let us now look at the trade figures. Food imports during 2022-23 were of the order of US $ 9.6 billion. And the export of food products was just about US $ 1.16 billion (FY22). What is the reason for such a huge gap when Bangladesh is an agri,-based economy? Not to forget that if exports are low and imports surge, it is the domestic market that suffers. The need for less expensive food might have caused sub-standard food enter the market or there are food testing deficiencies or lack of appropriate standards and enforcement or inefficiencies or something else. All said and done, the disease burden on the Government has continued to increase. No wonder, the situation is grim that needs to be admitted and some introspection is necessary.

If one reviews the list of BSTI standards *(451 quality standards implemented on a voluntary basis)* most of which are copy-pasted from other sources, it can be noticed that except for some food items, the standards of most food products were set 20-60 years ago and were never revised. Only 76 food items are under compulsory testing by BSTI for exports, imports, and the domestic market. Secondly, standards for the safety parameters of food are hardly available, except for some 22 food additives and 27 pesticides. What about contaminants like heavy metals, mycotoxins, other toxins and residues of several other pesticides and veterinary drugs? In Codex, there are more than 10,000 standards for product-additive combinations but these have been absent in the BSTI list in spite of the fact that BSTI has been the Codex focal point of Bangladesh since 1975. Similarly, most microbiological parameters for high-risk products are not available or have not been updated. Standards for other contaminants are missing.

Let me present an example of a regulatory failure. It was recently reported in the media that a study conducted by Dhaka University's Institute of Nutrition and Food Science and BRAC University's James P Grant School of Public Health has revealed that about 67% of bottled soyabean oil contains Trans Fatty Acids (TFA) up to 2 to 4 times the WHO recommended limit of 2% notified by BFSA in 2021 as a Regulation in the official Gazette. The most likely reason for lack of enforcement is that the industry does not seem to be answerable to BFSA because there is no fear of cancellation of their license. This is due to the fact that there is no licensing regulation notified by BFSA, so no one seeks a license from them. What could the reason be? Is TFA not a testing parameter in the BSTI standards for palm oil and soyabean oils that were set more than 20 years ago. Thus, such an important health matter is outside any regulatory oversight. In both situations, the consumer is at the receiving end. If the Food Business Operators must be answerable to the food regulator, i.e., BFSA, there must be appropriate instruments available to them.

All this raises policy level questions in my mind and somebody needs to respond effectively.

What does the Food Safety Act state? There are some very important sections in the Act that BFSA must make use of.

Section 13(1) - BFSA to "**regulate and monitor** the activities related to manufacture, import, processing, storage, distribution and sale of food so as to ensure access of safe food through exercise of appropriate of scientific methods, ..."

Section 13(3): BFSA shall take steps to inter alia provide scientific advice and technical support to the Government in formulating food and nutrition policy or rules, ... or regulations; analyze scientific and technical information concerning the risks to human health; develop methods of risk assessment and to co-operate with international organizations in relation to food safety, quality and testing; **harmonize safety** and **quality** standards between domestic and international food articles.

Section 13(4) - BFSA to "**make Regulations to carry out the purposes of Section 13 of the Act**."

Section 19(1) - BFSA may "**issue directives** related to food safety and quality **to any authority, organization or person** concerned directly or indirectly with food safety management, and such authority, organization or person **shall be bound to comply with such directives**."

We need to remember that the standards adopted by Codex are the relevant international standards and are the reference point within the frame-work of WTO. Therefore, it is imperative that the food regulator notifies the national standards to the WTO before notifying them as Regulations in the eyes of WTO. Therefore, in order to enforce them and to stand scrutiny in a Court of Law either nationally or internationally, these must be Gazette notified. BFSA has the powers under Section 13(4) to make Regulations and, fortunately, it has already started doing so. On the other hand, BSTI only makes standards *(not regulations)* – none of their standards can be Gazette notified. The reason is simple – BSTI is not a member of Codex. It is the country that is the member of Codex. BSTI is a member of ISO, which is a well-respected international NGO based in Geneva. And it makes standards for everything including food products. ISO and, therefore, BSTI standards are not a reference standard under the SPS Agreement of the WTO.

To address the gaps, BFSA, under powers conferred by the Food Safety Act and as the only specialized body in the country, took upon itself the responsibility to ensure that the national level food quality and safety standards are reviewed and harmonized with Codex to fulfil the vision of Bangabandhu and the decisions taken by the Prime Minister. BFSA, took into account the existing regulations in a few developed and developing countries including Bangladesh, worked with 27 Working Groups comprising of more than 200 subject-matter experts including 36 from India, held over 125+ meetings and finalised a whopping 11,200 standards just waiting to be Gazette notified. The Bangladesh Cabinet Secretary was proud to make this announcement in March 2023. The draft standards went through the scientific process under the Food Safety Act and were notified to the WTO. These are now in the final stages of becoming a part of the law.

The USP of BFSA is that it has more than 100 food science experts, while BSTI that has only very few of them. It was these young officers of BFSA who coordinated the entire work to make it happen. Imagine the high level of commitment! Having proved their mettle, it would now make a lot of sense for the Government to take a few policy level decisions. Firstly, BFSA must lead the Codex work for Bangladesh if it has to regulate food quality and safety in line with the latest international standards. Harmonization must remain a dynamic process. Secondly, the Government should further strengthen BFSA with additional food safety officers and state-of-the-art laboratories and train the laboratory staff. The BSTI and BCSIR laboratories should continue to provide the testing facilities. A food analyst examination should be conducted by BFSA at the national level and the selected food analysts should be gazette notified to give the regulatory work a force of law. Therefore, BFSA must notify the licensing regulations to be able to fulfil its mandate under Section 13(1) of the Act. And, finally, the composition of the BFSA Technical Committees should be finalized ASAP for subsequent harmonization initiatives and development of new standards and regulations on scientific lines.

So, where lies the problem? The irony is that BFSA has the mandate to harmonize, regulate and monitor food safety in Bangladesh, it has qualified officers, but no empowerment to lead Codex work, which is the very basis for ensuring the safety of the health of people and which promotes better market access. The Hon'ble Prime Minister aims Bangladesh to be in the global mainstream with an eye on 2026 when it aims to graduate from the LDC list and eventually become a developed country by 2041, but this will remain a challenge if sub-standard food continues to sell in the domestic market or exports do not pick up or the food products get rejected abroad. These are concerns that the policy makers need to address.

A humble suggestion is that the national level organizations including ministries and the scientific institutions in Bangladesh should see the larger picture in National interest, come together for strategic consultations for partnership and coordinated work as announced under the BFSA Strategic Plan, rather than working in their silos with agenda close to the chest.

————— 0 —————

THE ESSENTIALS FOR TRANSFORMATION OF NATIONAL FOOD SYSTEMS

Natia Mgeladze
Global Lead
IFC Food Safety, Food Loss Prevention, Food Fortification Advisory

The urgency to transform food systems and make them more sustainable is evident, however, the path to achieving this is not always clear. What does it take to succeed? A key part is ensuring food safety. Without food safety there is no food security, and without food security, a food system is weak and unstable and thus unsustainable. So, what should the primary focus be when it comes to improving a country's food safety system?

First, establishing the right policies and regulations is essential. Before considering any changes in the national food safety system, it is crucial to get the lay of the land, as lack of understanding on how the system operates will hinder the development of a working solution, as well as the efficient use of resources to achieve optimal results.

For more than 2 decades, the International Finance Corporation (IFC) has been providing support to governments and the private sector on strengthening national food safety, creating better food business environments, and on consumer protection all over the word. To facilitate this, we developed numerous tools that help analyze the functioning of different systems. The IFC Scan Guide is one of those tools, which has allowed us to:

- Establish a clear perspective on elements of a national food system, including food safety
- Understand changes that may be required to upgrade relevant national food policies and regulations to address challenges linked to the globalization of food trade and technical advances that impact the food industry and food consumers
- Identify existing and emerging risks deriving from duplication and overlap in responsibilities among public agencies or a vague regulatory framework on food-related issues and on food safety
- Develop recommendations on issues that should be addressed to help strengthen national food systems in selected areas depending on the agenda to enhance consumer protection and create an environment that facilitates a healthy national food industry

In 2023, the IFC Scan Guide was used to assess four elements of the national food system in Bangladesh: food safety, food fortification, food loss and waste prevention, and livestock production (animal welfare and use of antimicrobials). As a result, we obtained a comprehensive report identifying the gaps in each of those four assessment areas, and proposed solutions to help the country reform its food system to a more advanced level. In addition, the report references best practices, globally recognized approaches, and international standards—essential elements for both assessing the food system and developing recommendations.

The second essential aspect for food transformation involves knowledge sharing and learning to develop and enact the necessary policy and regulatory frameworks. Understanding the experiences of other countries and adopting best practices is very important when undertaking the transformation of any food system.

According to The Safe Food Imperative, unsafe food in low- and middle-income countries results in a productivity loss of some US$95 billion per year. What's truly remarkable is that much of the health and economic burden caused by unsafe food can be avoided through preventive measures, investments, and behavioral changes. Learning from

countries with sound food safety systems and efficient food safety policies is what developing and emerging economies need to do when building their national systems. When undertaking reforms, the experience of others allows us to determine the appropriate direction, save resources, use them efficiently, and reach the goal. The diversity in the various tools and initiatives represents a well-functioning food safety system and the advantages of the results that can be achieved by sharing knowledge and replicating successful practices. This is why the IFC e-learning course, "Food Safety Reforms, Learning from the Best: The New Zealand Food Safety System in Case Studies" was developed. The course explains all the critical elements of a national food safety system based on the exemplary model of New Zealand, known for having one of the most reliable and sound food safety systems in the world. This course is open to the worldwide public.

Finally, the third essential aspect entails identifying and implementing the right incentives to ensure that those involved in establishing food safety systems are focused and follow the right steps. While it is clear for governments why strengthening food safety is crucial (to ensure the safety of their populations), the need for changes might not be obvious for other stakeholders. For instance, the food industry and businesses may view upgrading the national food safety system as a burden. Often, this due to a lack of awareness on the need for reforms. Food businesses and consumers fail to recognize the benefits of improved food safety legislation and are uncertain about their value. At the same time, a well-planned awareness campaign could be extremely effective when implementing new approaches based on the Codex Alimentarius to enhance national food safety systems and create a better regulatory environment for the food industry. When planning awareness events linked to changes in food safety regulations, it is important to engage the private sector including food businesses and consumers. Otherwise, there is a risk of not reaching the target audience. The mentioned engagement is aimed to be initiated at the very first stage of the reform when discussing need, solutions, and implementation tools. However, there are cases when national governments do not involve food businesses in the development of national food safety policy and regulatory frameworks. Often, the decision makers in the mentioned economies do not understand how co-regulation mechanisms based on partnership with business could help to implement new rules. Thus, they consider standard law enforcement approaches based on monitoring and reacting to law violations as the only way to improve food safety in the country and don't collaborate with the food industry proactively. Moreover, the experience of Australia and New Zealand, Canada, the EU, and US shows that efficiency of the national food safety systems increases, and the level of food safety improves when there is a strong partnership of government, food industry, and consumers in the country. This could be easily explained as a shared decision-making process, a key element of public-private partnerships, bring together a variety of innovative skills, resources, and perspectives to identify the required solution and reach the desired outcome. Ultimately, this will improve the business environment for a national food industry. Another tool to convince different stakeholders to support food system reforms are public events like forums that could serve as a platform to share incentives for public and private sector players. The 10th IFC Food Safety Forum in Bangladesh in June 2023 is a good example. The forum, featuring the Bangladesh Food Safety Authority as a co-partner, provided a unique platform for the exchange of best practices and innovative solutions, as well as a great opportunity to forge new relationships and explore potential business partnerships. As a result, the event led to the signing of the first Cooperation Agreement in food safety between IFC and WHO, providing the country with the knowledge and tools needed to enhance its food system.

Continuous enhancement of the food safety system holds significant importance. In pursuit of this goal, IFC collaborates with the Bangladesh food safety authority to enhance awareness of food safety among both public and private stakeholders. This involves translating the IFC Food Safety Handbook into Bangla, contributing to a community that is more informed about food safety practices.

At its core, food safety begins with committed leadership. A persistent, step-by-step commitment from decision-makers on the national level, and from business management at the company level, is often the most important factor in motivating the implementation of changes and observing safer food practices. At IFC we are pleased to see such leadership in Bangladesh, and we are happy to continue our support to the country on transforming and strengthening the sustainability of its national food system.

———————— 0 ————————

AN OVERVIEW OF THE NEW ZEALAND FOOD SAFETY SYSTEM

Bruce Burdon
Manager Market Access Liaison & Cooperation,
Ministry for Primary Industries, New Zealand

The role of MPI
The Ministry for Primary Industries establishes and administers the standards and regulations that are set around New Zealand's food safety, biosecurity, and primary production systems on a national basis. Risk management and science provide the framework for the Ministry for Primary Industries regulatory systems and are guiding principles for the setting of standards.

Standards are largely outcome-based, reflecting the high level of maturity and control that exists across all players in New Zealand's primary production and processing sectors. The Ministry for Primary Industries and recognised agencies routinely audit and monitor aspects of these systems to ensure that standards continue to be met.

New Zealand's Food Safety System

Ninety percent of food produced in New Zealand is exported. All food exported must first meet standards for domestic food supply. To support our international trade, New Zealand's domestic systems and export standards reflect best international practice.

The Ministry for Primary Industries leads New Zealand's food safety system, protecting the health and wellbeing of consumers both in New Zealand and overseas. The Ministry for Primary Industries carries out system-wide audits and monitoring to ensure all growers, producers and food processors in New Zealand comply with the law. This ensures that hazards associated with microbiological chemicals and physical contaminants are minimised. It also ensures that packaging, labelling, storage, and transport of all food products are compliant with our laws and not misleading for consumers.

New Zealand's food system is underpinned by strong laws and regulations...

All food in New Zealand must comply with New Zealand Government's standards and regulations under legislation before it can be sold or exported. Food legislation ensures all food produced in New Zealand is safe and suitable and meets the compositional and labelling requirements under the 'Australia New Zealand Food Standards Code'. This legislation also gives the Ministry for Primary Industries the power to take enforcement action on non-compliant food businesses and undertakes direct recalls if needed. Some products including animal and plant products may also have specific export requirements to meet in addition to New Zealand standards, depending on the product type and any additional requirements of the overseas market.

...and it is the responsibility of businesses to prove that they meet all requirements.

New Zealand's regulatory model places responsibility on industry to demonstrate compliance with the standards set by the Ministry for Primary Industries. This encourages businesses to understand the risks associated with their products and production processes.

The regulatory model is a 'preventative' risk and science-based system where businesses have responsibility for producing safe food or other products, as well as demonstrating they have operating systems and processes in place to achieve this, with Government oversight.

Food businesses in New Zealand are required to operate under the Ministry for Primary Industries' registered risk-based programmes, such as food control plans or national programmes[1] under the Food Act; risk management programmes under the Animal Products Act; and wine standards management plans under the Wine Act. These ensure food businesses implement good operating and/or manufacturing practices, including the application of Codex HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) principles to identify and manage food safety hazards and ensure the food they produce is safe and suitable.

Food Monitoring and Surveillance

The Ministry for Primary Industries' food monitoring and surveillance programmes verify that the food production systems are managing risks to food safety. They confirm the effectiveness of New Zealand chemical residue and microbiological controls and practices, ensuring they do not breach any regulatory thresholds. They also independently check or provide oversight of food businesses' monitoring for biological contaminants in animal products such as pathogens and biotoxins, ensuring food safety requirements are met.

New Zealand has a range of different monitoring programmes:

The following monitoring programmes are applied (especially to animal products) – whether products are exported or consumed domestically:

National Chemical Residues Programme

The National Chemical Residues Programme monitors chemical residues in live animals and animals sent for slaughter, and tests food products from livestock, poultry, farmed salmon, ocean fish and honey. It tests for registered veterinary medicines and agricultural compounds, deregistered agricultural chemicals that are persistent environmental contaminants, and banned or restricted substances and toxic agents.

National Chemical Contaminants Programme

The National Chemical Contaminants Programme monitors milk and dairy products to confirm that residue or contaminant levels do not exceed acceptable limits for New Zealand and export markets. The programme tests a wide range of agricultural compounds and veterinary medicines for contaminants and ensures product integrity.

Independent Verification Programme

MPI's Independent Verification Programme for dairy production collects dairy products from around the country with samples tested at independent laboratories to check their compliance with microbiological limits. This also means the Ministry for Primary Industries can determine if manufacturers' quality programmes are sound and whether the regulatory framework is effective.

National Microbiological Database

The National Microbiological Database exists in a mandatory Ministry for Primary Industries programme for New Zealand primary processors of meat, poultry, game, and ratites. Samples are collected weekly and analysed for pathogens such as salmonella and campylobacter. The Ministry for Primary Industries holds the results of these tests in the National Microbiological Database and provides industry with feedback on their performance and overall trends.

Food Residue Survey Programme

The Food Residue Survey Programme investigates pesticide residues and chemical contaminants in plant-based foods. It covers plant-based food produced in New Zealand and imported food, including fresh fruit and vegetables as well as those that are processed into food. The programme assists the Ministry for Primary Industries with identifying potential food safety issues, enabling the Ministry to develop new food safety measures or review existing schemes.

1 A food control plan or national programmes are plans or programmes designed for a particular food business to identify, control, manage and eliminate or minimise hazards or other relevant factors for the purpose of achieving safe and suitable food. See the general description as in the NZ Food Act 2014 (Subpart 2 & 3).

New Zealand Total Diet Study

The New Zealand Total Diet Study is a nationwide survey of foods sold in New Zealand, both those that are imported and those that are produced domestically. The survey assesses New Zealanders' exposure to certain chemicals, such as agricultural compounds, contaminants, heavy metals, and nutrients. The study provides the Ministry for Primary Industries with reliable evidence of the safety of New Zealand's food supply and the efficacy of the monitoring systems and programmes.

Imported Food Monitoring Programme

The Imported Food Monitoring Programme looks for selected hazards in imported foods to check that imported food controls are working. Monitoring activities in the programme can include scanning, surveys, audits, and intelligence gathering. Monitoring can be specific to the food, region, manufacturer, or hazard, and are underpinned by risk-based principles.

Seafood Monitoring

Monitoring of algal biotoxin contaminants and residues in seafood, is undertaken through the following: a shellfish biotoxin monitoring programme for commercial growers and harvesters of bivalve molluscan shellfish; a shellfish biotoxin monitoring programme for recreational gatherers of shellfish; and a finfish and farmed salmon monitoring programme.

Other oversight

Systems based audits and assessments

The Ministry for Primary Industries Systems' Audit Team audit elements of the regulatory system to assess compliance and suitability and rate the effectiveness of regulatory measures to support continuous improvement.

External scrutiny

New Zealand's systems are subject to multiple external audits from overseas competent authorities and importers.

All information regarding our laws and standards, including template plans are publicly available on the Ministry website at www.mpi.govt.nz.

Conclusion

I am delighted to be sharing MPI's experiences and knowledge in developing and maintaining a food safety system as part of Bangladesh's national food safety day. We congratulate the Bangladesh government and the BFSA in particular for the steps they are taking to ensure safe and healthy food is going to the people of Bangladesh. We look forward to continuing to work with Bangladesh and supporting your efforts under the Food Safety Cooperation Arrangement between our respective departments, to benefit increasing cooperation and trade between our two countries.

———————— 0 ————————

FOOD SAFETY: A GLOBAL ISSUE WITH LOCAL SOLUTIONS - THE DANISH FOOD SAFETY SYSTEM

Mr. Troels Vensild
Director For International Cooperation
The Danish Veterinary and Food Administration

The importance of food safety transcends borders, impacting both public health and the environment globally. As highlighted by the World Health Organization, one-third of all produced food is lost, with a significant portion attributed to poor food safety practices. Alarmingly, 600 million people fall ill annually due to contaminated food, leading to 420,000 deaths.

Denmark takes pride in its robust food safety system, starting with the control principles that form the cornerstone of our approach. Collaboration between authorities and food business operators, positioning Denmark as a country known for high food safety standards and consumer trust. The journey to building this trust has taken many years, and it exemplifies the synergy between regulators and industry players in ensuring a safe and reliable food supply.

During Denmark's early years as a food exporting nation, the Danish Veterinary and Food Administration (DVFA) had full responsibility for the quality and safety of food products. However, as the Danish food cluster has grown and international food authorities and customers have stepped up their demands, this responsibility has gradually shifted and is now largely in the hands of Danish food producers. The system is called 'own controls', which means companies are required to implement transparent control systems that document the safety and hygiene of their food production and their compliance with legislation. Regular checks by DVFA ensure these requirements are met.

The Danish food safety system employs a risk-based approach, focusing resources on areas with the highest potential risks to public health. This approach allows for efficient allocation of resources to address the most critical issues. Denmark places a strong emphasis on traceability throughout the food supply chain. The ability to trace food products from farm to fork helps in quickly identifying and addressing any issues that may arise. Rigorous quality control measures are implemented in both the production and distribution of food products. This includes regular inspections and testing to ensure that products meet safety and quality standards. Various stakeholders, including government agencies, producers, and industry associations, collaborate closely to address food safety challenges. This collaboration fosters a collective effort to maintain high standards throughout the food supply chain.

In Denmark we believe that integration of sustainable production practices contributes to the overall safety, quality, and resilience of the food supply chain. By minimizing environmental impact, promoting biodiversity, and prioritizing responsible resource management, sustainable production enhances the safety and long-term viability of the global food system.

Denmark is a frontrunner in innovative, sustainable and efficient agriculture and food production and in line with the understanding that food safety is a global concern, Denmark actively participates in various international forums, initiatives and projects.

Specifically, in Bangladesh, the DVFA, in collaboration with Bangladesh authorities is starting up initiatives aimed at enhancing food safety and supporting strengthening of the framework conditions for the green transition of the food and agriculture sector in Bangladesh. Our joint efforts focus on sharing expertise, best practices, and building capacity to address food safety challenges in Bangladesh. This collaborative approach aligns with our shared goal of creating a safer and more secure food environment for all. We believe that together, we can contribute to a global landscape where safe and sustainable food practices are the foundation of a healthier future.

———————— 0 ————————

খাবার আগে ভাবুন!

প্রণব সাহা
সম্পাদক
ডিবিসি টেলিভিশন

নিরাপদ খাদ্য নিয়ে লেখার বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবছিলাম,পেটে ছিল ক্ষুধা। অফিসের একজন সহকর্মীর কাছে খাবারের খোজ নিতে গিয়ে জানলাম অনলাইনে অর্ডার করেছে সে। না লিখে খাবারের অপেক্ষায় পেট চো চো করার মুহূর্তে এলো দুটি প্যাকেট। চিকেন কর্ন স্যুপ আর ছোলা-বাটোরা ক্ষচটেপ খুলতে খুলতে যখন হয়রান,তখন বেরিয়ে এলো সব প্লাস্টিকে মোড়ানো খাবার। স্যুপটা প্লাস্টিকের বাটিতে,কিন্তু তার সাথে স্বাদ বাড়াতে যে ভিনেগারে ডোবানো কাচামরিচের কুচো এলো , তা পলিথিনে দেয়া। জলপাইয়ের আচার তাও প্লাস্টিকের প্যাকেটে। এমনকি টক দই দিয়ে বানানো মুখরোচক রাইতা,তাও পলিথিনের থলিতে। আর সব কিছুই মুখ বাধা রাবারের গার্ডারে একটা লম্বা মেনু, কিন্তু সবকিছুর সাথেই কমন কিন্তু পলিথিন এটাও কি খাবারের একটা পদ ?

খাদ্যের নিরাপদতা বা নিরাপদ খাবার যাই বলি না কেন, আমরা তার উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ে বেশি চিন্তিত, কিন্তু তা মোড়কজাত করা বা কিভাবে তা গ্রাহকের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে তা নিয়ে কতটা চিন্তা করি আমরা। স্কুলের পড়ার সময় গাইবান্ধায় রমেশ ঘোষের মিষ্টির দোকানে গরম পরোটার সাথে আলুর ডাল স্ক্রি পেতাম।সকালের নাস্তাটা জম্পেশ করার জন্য সাথে রসগোল্লা ! তখনই তেলে ভাজা পরোটা নিয়ে অস্বস্তি ছিল, তাই বন্ধুরা পত্রিকার পৃষ্ঠা ছিড়ে তা পরোটায় মোড়াতাম তেল শুকিয়ে নেবার জন্য। কিন্তু একদিন ইসলামিয়া হাইস্কুলের বিজ্ঞানের অমল স্যার ধমক দিয়ে বললেন তেলেভাজা না খাবার অভ্যাস ভালো, কিন্তু তোরা তো তেলের বদলে প্রেসের কালি খাচ্ছিস ! খাদ্যের নিরাপদতার বিষয়েও কিছু বলেছিলেন বটে, বয়স বাড়ায় তা ভুলে গিয়েছি। কিন্তু এখন নিরাপদ খাদ্যের কথা বলতে গেলে মনে হয় এটা যেমন সচেতনতার তেমনি অভ্যাসের ব্যাপারও বটে। সরকার এখন নতুন শিক্ষাক্রম চালু করতে গিয়ে নানারকম বাধার মুখোমুখি হচ্ছে, জানিনা সেখানে খাদ্য নিরাপদতা বা খাবার যাতে ব্যবহারের সময় বা তৈরীকালে বা উৎপাদনের সময় দুষিত হয়ে না পড়ে বা খাবার সময় হাতের ময়লায় খাবার অনিরাপদ না হয়ে ওঠে সে বিষয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রমে বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত হলে তাতে সবাই উপকৃত হতো। কারণ হ্যান্ড-স্যানিটাইজার স্কুলে নিয়ে যাওয়া ভাগিনা মেসি যখন এসে বলে "হ্যা আমরাতো টিফিনের ব্রেকে খেললাম, টিফিন খেলাম এবং তারপর হ্যান্ডস্যানিটাইজার দিয়ে হাত ড্রাই করলাম"। বুঝলাম হাত ধুয়ে নয় খাবার পরে হাত ধোয়ার অভ্যাসটাই বেশি রপ্ত করছে তারা। বিষয়টিতে স্কুল বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দৃষ্টি আর্কষণ করছি।

লেখার শুরুতেই বলেছিলাম পলিথিনে খাবার বহনের কথা। সহজলভ্য আর দামে সস্তা, প্যাকেট করতেও রেস্তোরা কর্মীদের তেমন কষ্ট হয় না,তাই বিশেষ করে খাবার 'পার্সেল' দিতে ছোট ছোট পলিথিনের ব্যবহার আগের চেয়ে বেড়েছে কয়েকগুণ। কাগজের বাক্সে মোরগ পোলাও বা কাচ্চি দিলেও সাথে পেয়াজের টুকরো এক ফালি লেবু আর এক-দুটো কাঁচা মরিচ কিন্তু যথারীতি পলিথিনে। না বিক্রেতা না ক্রেতা কারো কোনো আপত্তি নেই এই পলিথিনে । কিন্তু কেন ? কে আমাদের সচেতন করবে ? কে হোটেলে গিয়ে বাধা দিবে ? না খাবার এমন নিম্নমানের পলিথিনে (ফুডগ্রেন প্লাস্টিকের বিষয়ে কতটুকু জানে সাধারন মানুষ) দিলে তা স্বাস্থের জন্য কতটা খারাপ, বা যে খাবার পলিথনে মুড়িয়ে দেয়া হয় এবং যা সরাসরি মানুষ মুখে দেয় তাতে কি কোনো খারাপ জীবাণু আমাদের পেটে সরাসরি চলে যায় ? আমরা সাধারণ মানুষ এসব প্রশ্নের জবাব জানতে চাই।

দেশের নিরাপদ খাদ্য কতৃপক্ষ আছে, জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া সেই আইন বলে নিরাপদ খাদ্য কতৃপক্ষ হয়েছে। তাই বেড়েছে প্রত্যাশাও । কিন্তু যার শরীর, যাদের স্বাস্থ্য, যারা খাবার গ্রহণ করে তারা কতটা সচেতন খাদ্যের নিরাপদতা নিয়ে। আমরা কি এমন আশা করি যারা খাবার উৎপাদন করে তারা মুনাফার কথা ভুলে গিয়ে উন্নতমানের প্লাস্টিকে খাবার বাজারজাত করবে, নিজেরাই সচেতনভাবে পলিথিনে বেধে টক দই দিবে না জিভে জল আনা দইবড়া বিক্রির সময় ? মুনাফা কি নৈতিকতার বাণী শোনে ?

সামনেই পবিত্র রমজান মাস শুরু হবে।বেড়ে যাবে ফুটপাতে তৈরী খাবার বেচাকেনা । আমরা চাইবো তার আগেই মাঠে নামুক নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। তারা হোটেল মালিকদের সাথে, ভোক্তা অধিকারের সাথে মিলে-মিশে আগেই মাঠে নামুক। রমজানে ইফতারের সময়ে বাজারে হানা না দিয়ে আগে থেকেই সচেতন করুক সকলকে। গণমাধ্যমগুলোতে ব্যাপক প্রচার হোক, "শুধু খাবার খাওয়া নয়, খাদ্য যেন নিরাপদ হয়" এই স্লোগান।

শুধু হোটেল-রেস্তোঁরায় কেনা খাবার নয়, এমনকি বাসা-বাড়িতে জননী-জায়া-ভগ্নি এমনকি যারা পাচক (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) তারা যেন শুধু খাবার যোগানই নয়, তারা সতর্ক থাকুক, ধোয়ার সময়, রান্না করতে গিয়ে বা পরিবেশনকালে হাতের ময়লায়, অপরিষ্কার বাসনের কারণে কোনো খাবারই যেন অনিরাপদ না হয়ে পড়ে। বাড়ির কর্তা, টাকা আয় করেন বলে ভাব নিয়ে বাজার করে সবটাই ছেড়ে দিলেন গৃহকর্মীর হাতে, না একটু খেয়াল রাখুন ঘরের কাজে। সবাইকে সচেতন করুন খাবার নিরাপদভাবে রান্না ও পরিবেশন করতে। শাক কাটার আগে ধুয়ে নিলে পুষ্টি বজায় থাকবে বা বটি বা ছুড়ি টাই যেন যথেষ্ট পরিষ্কার থাকে তাতেও একটু খেয়াল রাখুন। বিশাল ফ্রিজে নিজের রোজগারে কিনেছেন আর সবকিছুই স্ত্রীর দায়িত্ব, তেমনটা না ভেবে সন্তান আর বাসার সকল সদস্যকে বলুন" সবাই মিলে সকলের খাবার নিরাপদ রাখি , দেশ-জাতি সবাই সুস্থ থাক"।

আরেকটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করতে চাই। এমনকি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকেও। যারা সরকারি কাজের দায়িত্ব হিসেবে জড়িয়ে পড়েছেন নিরাপদ খাদ্যের তদারকি আইন প্রয়োগ আর সচেতনতার কাজে, মিনতির সাথে নিবেদন করি কাজটিকে কমগুরুত্বপুর্ণ মনে করবেন না। আমাদের মত আরো অনেকেই আছে যারা নাগরিক হিসেবে আপনাদের পাশে আছে। আছে গণমাধ্যমের অবারিত প্রসারিত হাত আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য। আপনারা এমনকি খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ক বিজ্ঞাপন বিধিমালাও চূড়ান্ত করেছেন। আমার নিবেদন এবার আসুন খাদ্য নিরাপদতার বিষয়ে আমরা আরো বেশি করে সাহায্য নেই চিকিৎসক এবং পুষ্টিবিদদের। কারণ নিরাপদ খাবার সুস্বাস্থের জন্য কতটা জরুরি তা সরকারি কর্মকর্তা বা একজন এক্টিভিস্টের তুলনায় সাধারণ মানুষ বেশি আস্থা পাবে চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদদের কথায় । আমরা চাই চিকিৎসক রোগের চিকিৎসাপত্রের পাশাপাশি পথ্যের কথা বলতে গিয়ে খাবারের নিরাপদতার কথা বলুন। আর পুষ্টিবিদ যিনি রোগীর পথ্যের পরিমাণ আর কি পথ্য খেতে হবে তা বাতলে দেয়ার পাশাপাশি নিরাপদতার বিষয়ে একটু সচেতনতামূলক কথাও বলে দিন রোগী বা রোগীর স্বজনদের। শুধু কি খেতে হবে তা নয়, সেই খাবারটা কিভাবে নিরাপদ থাকবে তাও যেন একটু বুঝিযে দেয়া হয় ।

বাঙালি জাতি অতিমাত্রায় রাজনীতি সচেতন। চায়ের কাপে ঝড় তুলতে তাদের জুড়ি নেই। কিন্তু যে চা পান করছি, সেই চা তৈরীর সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা হয় কিনা, একটু প্রশ্ন তুলুন। রমজান এলেই সেমাই কারখানায় অভিযান চোখে পড়ে। ইটের গুঁড়া দেখে আতকে উঠি, ভেজাল খাবার নিয়ে বলতে বলতে হয়রান, নিরাপদ খাবার আবার কি তা নিয়েও প্রশ্ন কম নয় ! কিন্তু ভেজাল খাবার বলি আর অনিরাপদ খাবার বা খাবারের নিরাপদতা , যাই বলি না কেন সেখানে জনপ্রতিনিধিদেরও একটা ভূমিকা আশা করি আমরা। আমাদের নতুন সংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের কাছেও আমাদের প্রত্যাশা জনপ্রতিনিধি হিসেবে যেন তারা খাদ্য নিরাপদতার দিকেও খেয়াল রাখেন। বুঝতে হবে খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাবার বা খাবারের নিরাপদতা একই বিষয় নয়। আমি জানিনা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কোনো একটা কর্মসূচী হাতে নিবেন কি না , যাতে খাদ্যের নিরাপদতা বা ভেজাল খাবারের উৎপাদন ,বাজারজাতকরণ নিরুৎসাহিত করার জন্য সম্মানিত সংসদ সদস্যদের সহায়তা নেয়া যায় । জনপ্রতিনিধিরা প্রতিনিয়ত গণসংযোগে থাকেন, নিজের নির্বাচনী এলাকায় স্থানীয়ভাবে নানা সভা-সমাবেশ করেন। সেসব জায়গায় যদি নিজের এলাকার এমপি তার সমর্থক, কর্মী এবং সাধারণ মানুষদের খাদ্যের নিরাপদতা বিষয়ক সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখেন তা খুবই কার্যকর হবে বলে আমার ধারণা। আবার এবার যারা প্রথমবারের মত এমপি নির্বাচিত হয়েছেন তারা নানারকম ব্যতিক্রমী কাজ করার উদ্যোগ নিবেন। আশা করবো নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে যোগাযোগ করে খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিত করার কাজটি আরো দ্রুত এবং কার্যকরভাবে করতে পারবেন।

—————0—————

PRIORITY AREAS OF FOOD SAFETY IN BANGLADESH

Dr. Muhammad Shahadat Hossain Siddiquee
Professor
Department of Economics, University of Dhaka

As per Article 15 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, it is the fundamental responsibility of the state to secure to basic necessities of the citizens in which food is one of them. Similarly, Article 18 of the Constitution is primarily concerned with improving nutrition level and public health. Bangladesh government re-enacted the Food Safety Act 2013 replacing the outdated laws regarding food safety and the Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) was formed in 2015 as per this act. Though both the Articles tell about food safety requirements, the food control system in Bangladesh in relation to other competing countries in the world is lagging. Moreover, despite the involvement of a number of ministries and agencies governing the Food safety issues as per the Food Safety Act 2013, the food contamination and adulteration condition in the country has now become a serious public health challenge. This article would try to highlight the food contamination and adulteration situation in Bangladesh to identify the priority areas of concern that would help make the country to be a place of food safety.

Therefore, the article begins with understanding of the concept of food safety, which includes handling, preparation and storage of food in such a way that prevents food borne diseases. Food safety basically refers to a number of activities that help protect food from being adulterated and avoid health hazards. More importantly, food safety is closely linked with the overall food security of the country as having safe food enough by all citizens of the country is the pre-requisite of a country to be food secured. Therefore, producing sufficient food does not necessarily ensures that the country is food secured. This gives rise to the issue of food safety as nowadays food adulteration has become a growing problem in the country and food has become the primary source of human exposure to pathogenic agents. The threats arising from food include arsenic mixed food, adulterated food, genetically modified food, environmentally pollutants food etc. More importantly, human-induced food adulteration during production, process and distribution of food is the key concern of the country. In addition, human-induced food adulteration seriously occurs in street vending. Moreover, food production, process and preparation of food stuffs in an unhygienic environment are the prime causes of unsafe food, foodborne and waterborne disease, which results in the death of an annual 2.2 million people and of which 1.9 million are children. Now we talk about the food adulteration scenarios in Bangladesh though it is not an exhaustive list. In Bangladesh, unscrupulous traders add extraneous matters to food grains in the process of adulteration. For example, they add sands and crushed rocks to increase the weight of food. Textile dyes are used in food processing and manufacturing stage (e.g., sweetmeats and confectionaries). More specifically, textile dyes are used in street foods to make it more attractive to their consumers though it causes a number of problems including but not limited to indigestion, diarrhoea, vomiting, asthmas, allergies, heart diseases, and several kinds of neurological diseases and even cancer. Due to high prevalence of foodborne and waterborne diseases in Bangladesh, it has become one of the most vulnerable countries in the world. The citizens of Bangladesh are highly exposed to unsafe food hazards though it is the right of the citizens to get safe food as per the Constitution of Bangladesh. Therefore, it is important to identify the priority working areas of the government that would help build the country a place of food safety.

If we have a look at the Western or developed countries, food safety regulations are strictly maintained. In case if any food safety code of conduct is breached, a high amount of money as a penalty is charged for food contamination and

adulteration. Even it is evident in those countries that jail sentences are specified for and negligence suits are lodged in the courts for any kind of negligence in the food safety issue. On other hand, in Bangladesh, no authorities are yet to provide any capital punishment to any corporation. This rationale reminds us that capital punishment or proper amount of penalty if imposed might help improve the food safety situations in Bangladesh. Stakeholders those are involved in food production, process and distribution need to obliged to strictly follow the Food Safety Act. In this regard, BFSA needs to be strengthened with quality workforce and proper monitoring and evaluation tools so that they can implement their responsibilities conferred upon them. Regarding food safety issue, the actions of Mobile Court are negligible as it is very irregularly conducted. It implies that the actions of Mobile Courts should be conducted on a regular basis with a view reducing the extent of food contamination and adulteration. In Bangladesh, if an individual finds a case of unsafe food due to contamination or adulteration, he/she as an individual cannot file suit, implying a great limitation of provisions in related to existing laws. Therefore, it is of high importance to take such individual case under consideration by opening up such option. Moreover, existing food inspection and enforcement systems are relatively weak, even not enough to keep an eyes throughout the country. Framing of inspection manuals, protocols, guidelines and checklists for inspectors is required to expedite the activities of the regulators. Data regarding food contamination and adulteration need to be public. Awareness related activities for wider stakeholders would help create enabling environment for food.

———————— 0 ————————

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আন্তঃসংস্থা কার্যক্রম সমন্বয়ঃ কতিপয় বিবেচ্য বিষয়

মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশে সমন্বিতভাবে নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম পরিচালনার যাত্রা শুরু হয় "নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩" প্রবর্তনের পর থেকে। তবে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা শুরু হয় ২০১৫ সালে "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সমন্বিত নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন একটি "লম্বা ভ্রমণ"। "খামার থেকে থালা" পর্যন্ত এর প্রতিটি ক্ষেত্র সুবিন্যস্তকরতঃ বাস্তবায়ন বিজ্ঞানভিত্তিক একটি "সুচিন্তিত এবং পারস্পরিক সমঝোতার ফল"। একইসাথে এই কার্যক্রম প্রথম থেকেই "সমন্বিতভাবে" ডিজাইন না করা হলে পুরোটাই বিফলে যেতে পারে। এই নিবন্ধে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কতিপয় মূল বিষয় এবং খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের একটি অংশের কার্যক্রম "সমন্বয়"-এর উপর সীমিত দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা করার উদ্যোগ নিয়েছি। খাদ্য শৃঙ্খলের এই অংশটি হল যেসকল স্থান বা স্থাপনা থেকে ভোক্তা সরাসরি খাদ্যোপকরণ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে। এর পূর্বের ধাপগুলো অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, বিতরণ, পরিবহণ, পাইকারি বাজার আলোচনার বাহিরে রাখা হয়েছে। বিগত নয় (৯) বছরে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমসমূহ প্রশংসনীয়। বেশকিছু কাজ সম্পন্ন হয়েছে যেগুলো "বিল্ডিং ব্লক" হিসেবে বিবেচিত। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এবং 'এন্ড্রাওমেন্ট' হিসেবে বিদ্যমান "বহুসংস্থা ভিত্তিক পদ্ধতি"- থাকার পরও যে অগ্রগতি হয়েছে ভোক্তা তথা নাগরিকের প্রত্যাশা আরো কিছুটা বেশী থাকা স্বাভাবিক। জানামতে স্বাধীন বাংলাদেশে এই 'প্রকৃতির' কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়নি যারা **"বিদ্যমান শতাধিক সংস্থার মূল ভূমিকায় পরিবর্তন না এনে সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে কাজ করার দায়িত্ব পেয়েছে"**। তাই কর্তৃপক্ষের "সফলতা" সম্পূর্ণ নির্ভর করে ঐ সকল শত শত সংস্থার 'আগ্রহ এবং দৃশ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা'র উপর। আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি দেশের নিরাপদ খাদ্য সংস্থা/কর্তৃপক্ষের উদাহরণ টানা হবে। একই সাথে উদাহরণস্বরূপ আমার সময়কালের দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করার প্রয়াস নেব।

নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রমের আন্তঃসংস্থা "সমন্বয়" নিয়ে আলোচনার পূর্বে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার নতুবা সমন্বয়ের মূল "এসেন্স" পাওয়া যাবে না। প্রথমতঃ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রবর্তনের পূর্বে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রমের কাঠামো এবং কার্যক্রম কেমন ছিল। দ্বিতীয়তঃ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রবর্তন উত্তর বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রমের কাঠামো এবং কার্যক্রম কেমন হতে পারে এবং তৃতীয়তঃ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কী হবে। সর্বোপরি, "খামার থেকে খাবারের থালা" পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে খাদ্য নিরাপদ রাখার দায়িত্ব শেষ বিবেচনায় খাদ্য উৎপাদক, আমদানিকারক এবং খাদ্য ব্যবসায়ীর উপর বর্তালেও 'ভোক্তার স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষায় নিরাপদ খাদ্য' প্রাপ্তির নিয়শ্চতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কিভাবে সম্ভব? এ সকল বিষয়ে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো। আরো কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করে "সমন্বয় ও সহযোগিতার ভিত্তিতে নিরাপদ খাদ্য আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিয়শ্চতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা" নিয়ে আলোচনা থাকবে।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রবর্তনের পূর্বে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রমের কাঠামো ও কার্যক্রম

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রবর্তনের পূর্বে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম স্ব স্ব পরিসরে বেশ কিছু সরকারি সংস্থা পরিচালনা করেছে, যথা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহ, প্রাণিসম্পদ বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই), জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ইত্যাদি। সংস্থারগুলোর নিজস্ব জনবল ও রিসোর্স দিয়ে তা বাস্তবায়ন করত। এখানে এমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিলনা যে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সার্বিক

পরিকল্পনা করবে, সকল সংস্থার কার্যক্রমসমূহ একসূত্রে বাঁধার পরিকল্পনা করবে এবং সকল সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করবে। উল্লিখিত সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ আইনে "নিরাপদ খাদ্য" গুরুত্ব পায়নি আবার অনেক আইনে আংশিক উল্লেখ থাকলেও বাস্তবায়ন সামান্যই হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে "উত্তম পদ্ধতি" চালু হলেও কালক্রমে তা বন্ধ হয়ে গেছে। আবার বহিঃবিশ্বে রপ্তানির কারনে কোন কোন ক্ষেত্রে "উত্তম পদ্ধতি" চালু হয়েছে। ২০১৬ সালে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের অধীনে "ডেস্ক রিভিউ" প্রতিবেদনে বিষয়গুলো উল্লেখ আছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের কারনে মৌলিক খাদ্য উৎপাদনকারী সংস্থাসমূহকে "অধিক ফলাও" -এর উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হয়েছে। তাই সংস্থাসমূহের স্ব স্ব আইনে নিরাপদ খাদ্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম কম গুরুত্ব পায়। এই পদ্ধতিকে "বহু সংস্থাভিত্তিক পদ্ধতি" বলে।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রবর্তন উত্তর বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রমের কাঠামো ও কার্যক্রম

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রবর্তন উত্তর বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম স্ব স্ব পরিসরে উপরে বর্ণিত সরকারি সংস্থাগুলোকেই পরিচালনা করতে হবে। আইনে সরকারের খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহকে সমন্বিতভাবে কাজ করার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। উৎপাদক এবং সকল খাদ্য ব্যবসায়ীকে খাদ্য নিরাপদ রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নিরাপদ খাদ্য "শেয়ার্ড রেস্পন্সিবিলিটি"। আইনে একটি কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে যারা নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত সকল কাজ সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করবে। আইনের এই সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা হলো "ইনটিগ্রেটেড এজেন্সি সিস্টেম" [১]। এই পদ্ধতির সাধারণতঃ চারটি বৈশিষ্ট্য থাকে যথা-

লেভেল ১। আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, ঝুঁকি নিরুপণ ও ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্যদ্রব্যের নিরাপদ মান নির্ধারন।
লেভেল ২। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কাজের সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও অডিট।
লেভেল ৩। পরিদর্শন ও প্রয়োগ/বাস্তবায়ন এবং
লেভেল ৪। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।

আদর্শগতভাবে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ লেভেল ১ এবং লেভেল ২ এর কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং বিদ্যমান বহু-খাত ভিত্তিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের উপর লেভেল ৩ এবং লেভেল ৪ -এর কার্যাবলী বর্তায় যেমনটি সংস্থাগুলো আগে থেকেই করে আসছে।

আইনে এর সমর্থনে উল্লেখ আছে যে খাদ্য উৎপাদন থেকে ভোক্তার টেবিল পর্যন্ত খাদ্য নিরাপদ রাখতে হবে; খাদ্য নিরাপদ রাখার বিষয়টি বিজ্ঞানভিত্তিক হবে; কোন সংস্থার কার্যক্রমই নিরাপদ খাদ্য "সামগ্রিকতা"-কে ক্ষুণ্ণ করবেনা; নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর সাথে সমন্বয় করে স্ব স্ব দপ্তরের অনুসরণীয় আইন ও বিধিমালাসমূহ হালনাগাদ করতে হবে এবং বিদ্যমান সংস্থাসমূহের নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম সমন্বয় করতে হবে। এখন থেকে মৌলিক খাদ্য উৎপাদনকারী সংস্থাসমূহকে তাদের কাজের পরিসর বৃদ্ধি করে "অধিক ফলাও" এবং পাশাপাশি "অধিক এবং নিরাপদ ফলন" নিশ্চিত করতে হবে। আইনে এমনই আরো কিছু নির্দেশনা এবং গাইডেন্স পাশাপাশি আছে। স্মর্তব্য, এই সকল নির্দেশনার কোন একটি এড়িয়ে যাওয়া সমীচীন হবেনা, যা একটি গ্রহণযোগ্য নিরাপদ খাদ্য পদ্ধতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বড় বাঁধা হবে। বাংলাদেশে এই "ইনটিগ্রেটেড এজেন্সি সিস্টেম" কাঠামো এখনও ধুসর", একে বাস্তব রূপ দিয়ে দৃশ্যমান করতে হবে। এ বিষয়ে পরের অনুচ্ছেদসমূহে আরো আলোচনা প্রাসঙ্গিকতায় এসে যাবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

পূর্বের অনুচ্ছেদে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি আলোচনা করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষের ভূমিকার বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর প্রি-এম্বলে উল্লেখ আছে যে "বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং তদ্লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এতদ্সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।" এই আইনের ধারা ৫ এবং ধারা ৭-এ কর্তৃপক্ষের কাঠামো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়া আছে। ধারা ১৩-১৫ -তে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম উল্লেখ আছে। বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবে সরকারি সংস্থাসমূহ পরস্পরকে সহযোগিতা করে থাকে, তা আইনে উল্লেখ থাক বা না থাক। একইভাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানও সরকারি সংস্থা সমূহকে সহযোগিতা

[1] Assuring Food Safety and Quality: Guidelines for Strengthening National Food Control Systems. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, WORLD HEALTH ORGANIZATION. Rome, 2003

করে থাকে। কিন্তু, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-তে এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব বেশী দেয়া হয়েছে। ধারা ১৫(২) -তে উল্লেখ্য আছে যে "... সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিশ্চিত করণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে"। ধারা ৮১ -তে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সরকারি কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের সহযোগিতা প্রদানের উপর আরো গুরুত্ব দিয়ে "... দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা" যেন না হয় সেমর্মেও উল্লেখ আছে। একইভাবে ধারা ৮১-তে পরিদর্শনকালে খাদ্য ব্যবসায়ীগণ সহযোগিতা করতে বাধ্য মর্মেও উল্লেখ আছে। এসমুদয় থেকে এটা স্পষ্ট যে কর্তৃপক্ষ অন্য সংস্থার বিদ্যমান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেনা; সকল সংস্থার নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত "... প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ" করবে; বাস্তবায়নকারী সকল সংস্থার নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত সকল কার্য "সমন্বয়" করবে; "নিরাপদ মান এবং সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা না হলে" সে কাজ করবে; নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট কোন ক্ষেত্র "চিহ্নিত না থাকলে" নিজে বাস্তবায়ন করবে, আইন বাস্তবায়নে বিধিমালা, প্রবিধানমালা প্রণয়ন করবে। এ সমুদয় নির্দেশনা স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা "ইনটিগ্রেটেড এজেন্সি সিস্টেম"। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ স্বাধীন একটি সংস্থা যারা সমন্বয়, সার্বিকভাব পরিবীক্ষণ, নিরাপদ খাদ্য নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করবে এবং এভাবেই কর্তৃপক্ষ আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেক সংস্থার "Rule of Game" নির্ধারণ করবে যা এক পর্যায়ে "অফিসিয়াল ফুড কন্ট্রোল সিস্টেম" হিসেবে গণ্য হবে এবং "এপেক্স বডি" হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

এখানে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে প্রথম উদাহরণ টানা যা সংস্থাসমূহ এবং কর্তৃপক্ষের ভূমিকা বুঝতে কিছুটা সহায়ক হবে বলে মনে করি। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক একটি আলোচনা সভায় প্রয়াত স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম মহোদয়ের উপস্থিতিতে চিকিৎসক নেতৃবৃন্দ আশংকা এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সেই ১৯৫৯ সালে থেকে খাদ্য নিরাপদ রাখার কাজে নিয়োজিত। সেখানে একটি নতুন সংস্থা "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ" কিভাবে দেশব্যাপী নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে পারবে? বস্তুতঃ ২০১৫-২০১৬ সাল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কিছু সংস্থার মধ্যে এই ধারণা বিদ্যমান ছিল, হয়তবা এখনও আছে। বক্তব্য রাখার এক পর্যায়ে আমি এই অহেতুক আশংকা দুর করার চেষ্টা করি। শুরুতেই আমি কিছুটা অলংকার মিশ্রিত করে বলি যে 'উনষাট (১৯৫৯) সালে পিউর ফুড অর্ডিন্যান্স চালু হওয়ার পর উনষাট বছর পর দেশে ভেজাল এবং দুষণ উনষাট গুণ বেড়েছে (যদিও ২০১৬ সালে উনষাট বছর পূর্ণ হয়নি)। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর "খামার থেকে খাবারের থালা" পর্যন্ত খাদ্য শৃঙ্খলের একটি অংশের দেখাশোনা করে। দেশের জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে তাঁরা এখন নিরাপদ খাদ্য প্রত্যাশা করেন এবং প্রায় সকল প্রকার দেশী খাদ্যপণ্য বিদেশের বাজারে যায়। তাই এখন সম্পূর্ণ খাদ্য শৃঙ্খলে সকল খাদ্য নিরাপদ রাখতে হবে এবং বিদ্যমান সংস্থাগুলোই এ দায়িত্ব পালন করবে যেভাবে একটি অংশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করে আসছে। সেদিন বোঝাতে চেয়েছিলাম যে খাদ্য নিরাপদ রাখার কাজ সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণ একটি সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়। আরো বোঝাতে চেয়েছিলাম যে **সার্বিক সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে নিরাপদ খাদ্য আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিয়শ্চতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় "এক ছাতার নীচে বহু সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টা" ব্যতিরেকে 'খাদ্যপণ্যভিত্তিক ব্যপকাকারে বিস্তৃত ও বহুধা বিভক্ত খাদ্য শৃঙ্খলে"** (সবকটি অংশের সরবরাহকৃত বিভিন্ন ধরনের উৎস্য থেকে উৎপাদিত) খাদ্য নিরাপদ রাখা বাংলাদেশে বিরাজিত বাস্তবতায় একটি সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়।

খাদ্য-স্থাপনা এবং বিভিন্ন খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যক্রম

খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের একটি অংশে অর্থাৎ ভোক্তার সাথে সম্পর্কিত "পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় স্থল" বিভিন্ন খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম সমন্বয় নিয়ে আলোচনা সুত্রপাত করা হলো এবং সেই অংশটি নিচের চিত্র-২ -তে দেখানো হলো। খাদ্য উৎপাদন, আমদানী, পরিবহণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, বিতরণ অংশের পরিদর্শন কার্যক্রম এবং মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম [২] এই আলোচনা থেকে দুরে রাখা হলো। এখানে খাদ্য-শৃঙ্খলের শেষ ধাপের অর্থাৎ "বিক্রয় স্থল"-এ বেশ কয়েক ধরণের খাদ্য স্থাপনা রয়েছে এবং এর সংখ্যা প্রচুর। তাই এই অংশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভোক্তা সেন্সেটিভ। তুলনামূলকভাবে এখানে 'ভেজাল' খাদ্যদ্রব্য বেশী থাকার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে এই স্থানে খাদ্যদ্রব্য দুষণ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে যদিও অনুজৈবীক দুষণের সম্ভাবনা থেকেই যায়। খাদ্য শৃঙ্খলের এই অংশে পাইকারি বাজার, খুচরা বাজার, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ও সুপারমার্কেট, হোটেল-রেস্তোরা, ক্যাটারিং, পথ-খাবার, পাড়া-মহল্লার দোকান, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এই অংশে যে সকল সংস্থার পরিদর্শক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিদর্শন কার্য পরিচালনা করেন তার একটি তালিকা নীচে দেয়া হলো-

[২] এ আলোচনায় সকল বিক্রয় স্থানে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট প্রসংগটি দু'টি কারণে বাদ রাখা হলো। প্রথমতঃ খাদ্য নিরাপদ রাখার কাজে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা দেশগুলোতে দেখা যায়না। তাই এর উপর সুচিন্তিত পন্থা বাতলানো সম্ভব হবেনা। দ্বিতীয়তঃ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ -তে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা একটি জুডিশিয়াল বিষয়। আমাদের জানতে হবে এই উপমহাদেশে প্রথম মোবাইল কোর্ট পদ্ধতি চালু করার উদ্দেশ্য আজ একবিংশ শতাব্দীতে "Exploit" করা হচ্ছে কিনা।

ক) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর স্যানিটারি ইনস্পেক্টর
খ) সিটি করপোরেশন/পৌরসভাসমূহের স্যানিটারি ইনস্পেক্টর
গ) ডিএনসিআরপি-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সর্বশেষে যুক্ত
ঘ) বিএফএসএ-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং
ঙ) যৌথ সংস্থা

বিদ্যমান খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর পরিদর্শক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এ সকল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়স্থলে বিক্রেতা কর্তৃক অনুসরণীয় এবং প্রতিপালনযোগ্য প্রায় একই ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করেন যথা-

১) মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য এবং খাদ্যোপকরণ আছে কিনা বা মেয়াদ সম্বলিত স্টিকার টেম্পারিং করা হয়েছে কিনা।
২) খাদ্যদ্রব্য বাসি ও পচা কিনা।
৩) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার "মানসমূহ" বজায় রাখা হয় কিনা।
৪) খাদ্য স্থাপনাসমূহে কীট-পতঙ্গের উপস্থিতি।
৫) খাদ্যদ্রব্য/খাদ্যোপকরণ স্বল্প বা দীর্ঘকালের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখা হয় কিনা।
৬) খাদ্যদ্রব্য ভেজাল মিশ্রিত কিনা।
৭) খাদ্যদ্রব্যের মোড়কের উপর লেবেলিং যথাযথ হয়েছে কিনা।
৮) পূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালিত হয়েছে কিনা।
৯) খাদ্য ব্যবসায় লাইসেন্স আছে কিনা।
১০) খাদ্যদ্রব্যে বিএসটিআই-এর "সিএম" চিহ্ন আছে কিনা।
১১) বিক্রেতার নিকট খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের উপযুক্ত ঠিকানা সম্বলিত রশিদ, চালান আছে কিনা।
১২) (কোন কোন সংস্থা কর্তৃক) প্রয়োজনে খাদ্য নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা।

নীচে চিত্র-১ এবং চিত্র-২ -এর মাধ্যমে বর্তমান কার্যক্রম দেখানো হলো। চিত্র-১ দ্বারা খামার থেকে ভোক্তার টেবিলের আগ পর্যন্ত পরিদর্শন কার্যক্রম দু'ভাগে দেখানো হয়েছে। যেহেতু সংস্থাসমূহ (বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ব্যতীত) বিগত ৫০-৬০ বছর থেকে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে তাই এটা নিশ্চিত যে সংস্থাগুলোর নিজস্ব পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয় পদ্ধতি বিদ্যমান। আরো ধরে নেয়া যায় যে অন্ততঃ নিজেদের মধ্যে তথ্য উপাত্ত শেয়ার করার মত ম্যানুয়াল বা ডিজিটাল পদ্ধতিও আছে। যদি না থাকে এটা সংস্থাসমূহের জন্য বিপর্যয় বটে। তবে অন্ততঃ বলা যায় যে মৎস্য রপ্তানি বিপর্যয় এড়াতে মৎস্য অধিদপ্তরে শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে অথচ দেশের ভোক্তা সাধারণের জন্য সেই ব্যবস্থা নেই। তবে অন্য সংস্থায় কেন নয়?

চিত্র-১ বিদ্যমান পরিদর্শন ও সমন্বয় কার্যক্রমের Schematic ডায়াগ্রাম

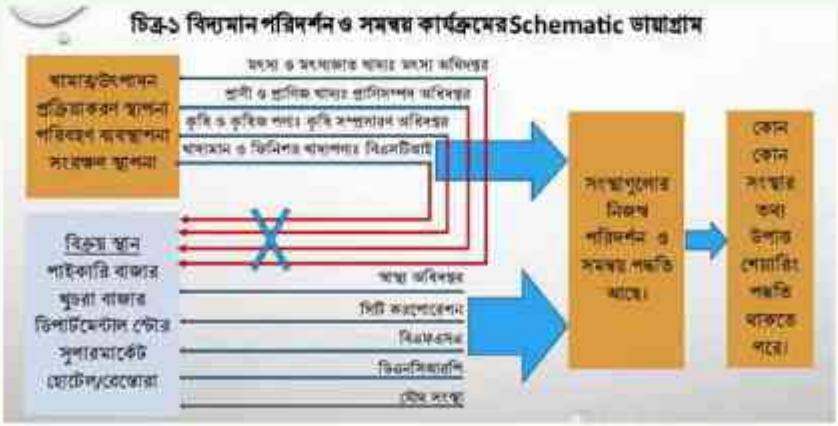

চিত্র-২ তে সরাসরি ভোক্তা সম্পর্কিত খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের শেষ ধাপ অর্থাৎ "বিক্রয় স্থান" প্রকৃতির খাদ্য স্থাপনায় পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতি পৃথকভাবে দেখানো হলো।

এই আলোচনা থেকে নীচে বর্ণীত কয়েকটি পর্যবেক্ষণ রাখা যেতেই পারে। একইসাথে পরিচালিত কার্যক্রমের কিছু দলিল-দস্তাবেজ আছে বলে আমরা সংগত কারণে ধরে নিতে পারি যা "সমন্বয়" সংক্রান্ত কাজের জন্য অপরিহার্য। পর্যবেক্ষণ এবং দলিল-দস্তাবেজগুলো নিম্নরূপ-

ক) একই খাদ্য স্থাপনায় একাধিক শ্রেণির খাদ্যপণ্য রাখা হয়।
খ) একই খাদ্য স্থাপনায় একাধিক সংস্থা পরিদর্শন করছে। উপরন্তু, বিভিন্ন সংস্থার মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়।
গ) পরিদর্শন "ঝুঁকিভিত্তিক" নয়।
ঘ) পরিদর্শনের নির্ধারিত কোন "শিডিউল" বা "ফ্রিকোয়েন্সি" নেই বা থাকলেও খাদ্য ব্যবসায়ীর অজানা।
ঙ) কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সংস্থাসমূহ একইপ্রকার "পরিদর্শন" কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে কারণ স্ব স্ব আইনে সমর্থন রয়েছে।
চ) বিদ্যমান সংস্থাসমূহের কাজে নতুন করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একটি "সংস্থা" হিসেবে যুক্ত হয়েছে।
ছ) পরিদর্শন ব্যবস্থা হয়তবা সহজ/জটিল হচ্ছে।
জ) খাদ্য ব্যবসায়ীগণের মধ্যে "পরিদর্শন ভীতি" বা বিরক্তি সৃষ্টি হচ্ছে।
ঝ) খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের "পরিদর্শন" সংক্রান্ত "লিখিত এবং পঠিত গাইডলাইন" আছে।
ঞ) প্রত্যেক সংস্থার প্রতিমাস / প্রতিবছরের জন্য "পরিদর্শন" শিডিউল প্রস্তুত থাকে।
ট) সংস্থাসমূহের পরিদর্শন পরবর্তী রিপোর্টিং পদ্ধতি আছে।
ঠ) সংস্থাসমূহের "পরিদর্শন" সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সেগুলো ব্যবহারের "লিখিত এবং পঠিত ব্যবহার বিধি" (এসওপি বা গাইডলাইন) আছে।
ড) সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষিত জনবল আছে এবং অন্যান্য রিসোর্স আছে।
ঢ) সংস্থাসমূহের পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রমের নিজস্ব সমন্বয় পদ্ধতি আছে।
ন) ফলো-আপ কার্যক্রমের জন্য এবং নীতি-নির্ধারক কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কার্যক্রম সংক্রান্ত "তথ্য ও উপাত্ত" সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে।
প) অনেক খাদ্য ব্যবসায়ী সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত হয়েছেন এবং অনেকের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবসায় লাইসেন্স স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে।

উপরের এই পর্যবেক্ষণসমূহের সদুত্তরের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ কত সহজে এবং ফলপ্রসুভাবে পরিদর্শন কাজ করে যাচ্ছে এবং "ইন্টিগ্রেটেড এজেন্সি পদ্ধতি"-তে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জন্য একটি "সমন্বয়" পদ্ধতি কত সহজ হবে। এমনই একটি ধারণা নিচের ডায়াগ্রামে দেয়া হয়েছে। অন্যথায় যুক্তি সঙ্গতভাবে বলা যায় যে সংস্থাগুলোর নিজস্ব লিখিত ও পঠিত সুবিন্যস্ত কোন "পরিদর্শন" পদ্ধতি এবং নিজেদের জন্য কোন "সমন্বয়" ও "পরিবীক্ষণ" ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি এবং সংস্থাগুলো ফলপ্রসুভাবে ও সহজে পরিদর্শন করতে পারছেনা। মনে প্রশ্ন জাগে স্বাধীনতার এতবছর পরও সকল কাজ এড-হক ভিত্তিক হচ্ছে কি? মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে অর্থাৎ "বাংলাদেশে সমন্বয় কার্যক্রম কেমন হতে পারে" আরো একটি বিষয় নীচে আলোচনা করতে চাই।

অন্যান্য দেশের নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম পদ্ধতির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনাঃ

এ পর্যায়ে অন্যান্য কিছু দেশের অভিজ্ঞতা আলোচনা বাংলাদেশের "পরিদর্শন" এবং "সমন্বয়" ব্যবস্থা বুঝতে সহায়ক হবে। সকল কাজের মতই নিরাপদ খাদ্য বাস্তবায়নেও চ্যালেঞ্জ থাকা স্বাভাবিক। তার'পর যদি বিষয়টিতে বহুবিধ সংস্থা জড়িত থাকে। এটি আরো চ্যালেঞ্জিং হবে যখন "বহু-সংস্থা ভিত্তিক পদ্ধতি" (Multi-agency System) থেকে "সমন্বিত পদ্ধতি"-তে (Integrated Agency System) উত্তরণ হতে যাচ্ছে। কি কি চ্যালেঞ্জ আছে তার তালিকা তৈরি করার চেয়ে বিভিন্ন দেশের পদ্ধতি জেনে খাদ্য ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্টগণকে নিয়ে সু-বিন্যস্ত পদ্ধতি গড়ে তোলার আলোচনা বেশী যুক্তিযুক্ত। খুব সাধারণভাবে বলা যায় যে কাজের ক্ষেত্র, কাজ করার লিখিত এবং পঠিত পদ্ধতি, উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রশিক্ষণ, সংস্থাসমূহের রিসোর্স বৃদ্ধি এবং পরিশেষে রিপোর্টিং ও তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা থাকলে চ্যালেঞ্জ কম হবে এবং সমন্বয় সহজ হয়। একটি উপযুক্ত ও সু-বিন্যস্ত পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপযুক্ত প্রশিক্ষণ যখন থাকেনা তখন তা বাস্তবায়ন করতে যাওয়া নিজেদের জন্য যেমন অস্বস্তিকর হয় খাদ্য ব্যবসায়ীগণ তেমনি "হয়রান" হতে পারেন ফলশ্রুতিতে তাঁরা ভরসা হারান। কিন্তু খাদ্য ব্যবসায়িগণকে এটা মানতে হবে যে খাদ্য নিরাপদ রাখার বিষয়টি স্থানভেদে জটিল এবং একটা পর্যায় পর্যন্ত পরিদর্শন পদ্ধতি সহজ করা সম্ভব, সকল ক্ষেত্রে নয়।

কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এই অনুচ্ছেদের আলোচনা শেষ করা হবে। যে সকল দেশে ফেডারেল এবং স্টেট/প্রোভিনশিয়াল পদ্ধতি আছে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা সে সকল দেশে নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ তুলনামূলকভাবে জটিল।

এফডিএ (USFDA) হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সংস্থা এবং Department of Health and Human Services -এর অধীন। The Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) এফডিএ -এর অধীনে লেবেলিং, ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট কার্যক্রম দেখাশোনা করে। United States Environmental Protection Agency (EPA) ফেডারেল সরকারের অধীনে একটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং তারা সুপেয় পানির দূষকের মাত্রা নির্ধারণ করে। অন্যদিকে US Department Agriculture -এর অধীনে Food Safety and Inspection Service (FSIS) খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন, তদন্ত, গোস্ত, পোল্ট্রি এবং ডিম নিরাপদ মাত্রা, প্যাকেজিং, লেবেলিং, এবং খাদ্যমান ও পুষ্টি (wholesome) দেখে থাকে। আরো একটু ভেতরে গেলে বিষয়টি জটিল বলে মনে হবে। যেমন একদিনে EPA সুপেয় পানির দূষকের মাত্রা নির্ধারণ করে। অন্যদিকে FDA বোতলজাত পানির সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। যে সকল খাদ্যদ্রব্যে তিন শতাংশের বেশী গোস্ত বা দুই শতাংশের বেশী পোলট্রি (কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত) খাদ্যপোকরণ থাকে সেগুলো এবং ডিম জাতীয় খাদ্যপণ্য (তরল, বরফকৃত বা শুষ্ক) FSIS -এর অধিক্ষেত্রে পড়ে। অন্যদিকে শক্ত আবরণের ডিম, গোস্ত এবং পোলট্রি খাদ্যপণ্য FDA -এর অধিক্ষেত্রে পড়ে। খাদ্যপণ্য লেবেলিং-এর ক্ষেত্রে FSIS প্রি-এম্পাটিভ ভূমিকা পালন করে কিন্তু FDA রি-একটিভ ভূমিকা পালন করে। FSIS খাদ্য স্থাপনা, রেস্টুরেন্ট ও খাদ্য ব্যবসায় পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করে কিন্তু FDA পারেনা। আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজে দ্বৈততা (overlapping) আছে। বস্তুতঃ এটা দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়া। এছাড়াও কিছুটা ঐতিহাসিক বিষয়।

আয়ারল্যান্ডে বিভিন্ন শ্রেণির খাদ্য স্থাপনা বিভিন্ন সংস্থার লোকজন পরিদর্শন করে থাকে। নীচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

উৎপাদন ও ফার্ম পর্যায়েঃ

Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM) -এর ভেটেরিনারী ইন্সপেক্টরগণ গোস্ত, পোলট্রি এবং দুগ্ধজাত খাদ্যপণ্য, প্রাণি স্বাস্থ্য কল্যাণ এবং নিরাপদ মান দেখাশোনা করে। Health Service Executive (HSE)-এর ফুড ইন্সপেক্টরগণ ফলমূল, শাকশব্জী ও ডিম উৎপাদনকারী ফার্ম এর পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপদ মাত্রা পরিদর্শন করে।

প্রক্রিয়াজাত কারখানা এবং সংরক্ষণ পর্যায়েঃ

Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM) -এর মিট হাইজিন ইন্সপেক্টরগণ গোস্ত প্রক্রিয়াজাত কারখানার হাইজিন ও নিরাপদ মাত্রা দেখাশোনা করে। অন্যদিকে ভেটেরিনারী কর্মকর্তাগণ গোস্ত, পোলট্রি এবং ডেইরী খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানায় EU এবং জাতীয় নিরাপদ খাদ্য রেগুলেশন্স কমপ্লায়েন্স দেখাশোনা করে। Health Service Executive (HSE)-এর ফুড ইন্সপেক্টরগণ অপ্রাণিজ খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানাসমূহ পরিদর্শন করে।

পরিবহণ ও পাইকারী বিক্রয় পর্যায়েঃ

Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM) -এর ফুড পরিবহণের সময় বা সময়কালীন পরিবহণ বাহন এবং হাইজিন পরিদর্শন ও দেখাশোনা করে। Health Service Executive (HSE)-এর এনভায়রনমেন্টাল হেলথ অফিসারগণ সংরক্ষণাগারের খাদ্য সংরক্ষণ এবং বিতরণকেন্দ্রে পরিবহণ ব্যবস্থা পরিদর্শন ও দেখাশোনা করে।

খুচরা এবং রেস্টুরেন্ট পর্যায়েঃ

Health Service Executive (HSE)-এর এনভায়রনমেন্টাল হেলথ অফিসারগণ রেস্টুরেন্টের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা, তাপমাত্রা ও এলার্জেন এবং দোকান, সুপারমার্কেট, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স, রেস্টুরেন্টে ও অন্যান্য খাদ্য ব্যবসায়ের সার্বিক খাদ্যদ্রব্যের নিরাপদ ব্যবস্থা পরিদর্শন ও দেখাশোনা করে। অন্যদিকে Local Authorities (LAs) অতিরিক্ত হিসেবে টার্গেটেড পরিদর্শন করে। এই সকল টার্গেটেড পরিদর্শন হয় নির্দিষ্ট ঝুঁকি দেখা দিলে, ভোক্তা অভিযোগ করলে এবং অন্যান্য স্থানীয় বিষয়ে যথা পোকা-মাকড় বা কর্মীগণের স্বাস্থ্য।

Marine Institute of Ireland (MI) এই দপ্তরের কাজ একদম ব্যতিক্রমধর্মী। এই দপ্তর পরোক্ষভাবে সামুদ্রিক মাছ এবং শেলফিস-এর নিরাপদ মান রক্ষা এবং সেগুলোকে সুরক্ষা প্রদান করে যায় বিভিন্নভাবে যথা- নিয়মিতভাবে মাছের স্বাস্থ্য এবং

প্রাচুর্যতা যাচাই ও নির্ধারণ, পানির মান, ক্ষতিকর অনুজীব, টক্সিন (বায়োটক্সিন), মূল সংস্থাসমূহের সাথে তথ্য ও উপাত্ত আদান-প্রদান, ইত্যাদি।

এই দু'টি দেশে এবং অন্যান্য দেশেও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় প্রায় একই প্রকার পদ্ধতি অনুসরণ এবং বিভিন্ন প্রকার ডকুমেন্টেশন রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ কথা হলো যে প্রত্যকটি দেশেই নিরাপদ খাদ্য "শেয়ার্ড রেস্পনসিবিলিটি" এর দৃশ্যমান রূপ হলো সংস্থাসমূহের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে "সমঝোতা স্মারক" এবং "সেবা চুক্তি" সম্পাদন করা যা আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (এফডিএ ও এফএসআইএস), আয়ারল্যান্ড (এফএসএআই), যুক্তরাজ্য (ফুড স্ট্যান্ডার্ডস এজেন্সি-এফএসএ), নর্থ সাউথ ওয়েলস ফুড সেইফটি অথরিটি, কানাডিয়ান ফুড ইন্সপেকশন এজেন্সি (সিএফআইএ), হংকং (সেন্টার ফর ফুড সেইফটি-সিএফএস), ক্ষেত্রে দেখতে পাই। এসমুদয়ের উদ্দেশ্য হলো- দায়দায়িত্ব বর্ণনা করে ভাগ করে নেয়া অর্থাৎ দায়িত্ব শেয়ার করা, তথ্য-উপাত্ত শেয়ার করা এবং সমন্বয় সাধন করা। এ চুক্তিগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী "টুলস" যা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে সম্ভব করে তোলে এবং বিভিন্ন খাদ্য-বাহিত রোগ-বালাই থেকে জনস্বাস্থ্য সমুন্নত রাখে।

বাংলাদেশে "সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিয়শ্চতা" কার্যক্রম কেমন হতে পারে?

এ বিষয়টি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে "বাস্তবায়ন" এবং "সমন্বয়" সাধন বিষয়টি "বহু-সংস্থা ভিত্তিক পদ্ধতি" বিবেচনা করে চিন্তা করলে চলবেনা। কারণ এই পদ্ধতি এখন আর থাকছেনা। উপরন্তু, "বহু-সংস্থা ভিত্তিক পদ্ধতি" স্ব স্ব সংস্থা সমন্বয় করে। বাহির থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সমন্বয় করতে পারেনা। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ চালু হওয়ার পর থেকেই "ইনটিগ্রেটেড এজেন্সি পদ্ধতি" প্রচলন হয়েছে। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভূমিকা এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের ভূমিকা সম্পূর্ন পৃথক। কর্তৃপক্ষ যখন বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকবে তখন তার পক্ষে "সমন্বয়" করা কঠিন হবে।

নিরাপদ খাদ্য আইনে উল্লেখ করার পরও যখন কোন সংস্থার সাথে কাজের কোন পার্টনারশীপ সম্পর্ক সৃষ্টি হবে না তখন কারো কাজ তদারকী এবং সমন্বয় করার উদ্যোগ গ্রহণ "অনধিকার চর্চা" বা অন্যের কর্মক্ষেত্রে "অনুপ্রবেশ" তুল্য হতে পারে। অতএব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ যদি প্রমিতমানে অনুসরণযোগ্য পদ্ধতি অবলম্বন এবং প্রয়োগ না করে তাহলে "সমন্বয়" এবং "পরিবীক্ষণ" অসাধ্য হবে। তাই অন্যান্যের মধ্যে নিচের বিষয়গুলোর উপর ধাপে ধাপে গুরুত্ব দিতে হবে যথা-

ক) ক্ষেত্রেমত সমঝোতা এবং সেবা চুক্তি স্বাক্ষর।

খ) ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু।

গ) ভোক্তার সাথে সম্পর্কিত স্থাপনাসমূহ সর্বসম্মত একটি একীভূত পরিদর্শন ব্যবস্থা যাতে করে এই শ্রেণিভুক্ত খাদ্য স্থাপনা একটি বা দু'টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিদর্শন হলেই চলে।

গ) হারমোনাইজড/স্টান্ডার্ডাইজড পরিদর্শন প্রোটকল।

ঘ) তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও শেয়ারিং ব্যবস্থা।

ঙ) প্রশিক্ষিত জনবল ও সহায়ক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা। এবং

চ) খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও খাদ্য ব্যবসায়ী সমন্বয়ে "কনসালটেটিভ কমিটি"।

ছ) কেন্দ্রীয় পরিদর্শন সমন্বয় সেল/ইউনিট ব্যবস্থা।

যদি ধরা যায় যে উপরের অনুসরণযোগ্য পদ্ধতির অধিকাংশ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে তা হলে নিচের পরিকল্পিত ডায়াগ্রামে প্রদর্শিত ব্যবস্থাটি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জন্য "সমন্বয়" পদ্ধতি হতে পারে। সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভা এলাকার বাহিরে এবং যেখানে পৌরসভাসমূহের সক্ষমতা এখনও গড়ে ওঠেনি সে সকল এলাকায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর স্যানিটারি ইন্সপেক্টরগণ বিক্রয় স্থানসমূহ পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ এবং ফলো-আপ সকল কাজ করবেন। এজন্য তাঁদের কোন ক্ষেত্রে জ্ঞান না থাকলে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যা চিত্র-৩ এ বর্ণিত হয়েছে।

একইভাবে চিত্র-৪ এ স্থানীয় সরকার অধিক্ষেত্রে করপোরেশন এবং সক্ষমতাসম্পন্ন পৌরসভাসমূহের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরগণ বিক্রয় স্থানসমূহ পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ এবং ফলো-আপ সকল কাজ করবেন।

এটি একটি ধারণামাত্র যার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের সাথে ব্যাপক আলোচনা করবে। এই ডায়াগ্রামের প্রদর্শিত "ধাপসমূহ" সাবধানতার সাথে বিশ্লেষণ এবং বিভাজনের দাবী রাখে। এই পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয় কাজে প্রথমদিন থেকেই "প্রযুক্তি" ব্যবহারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। সংস্থাসমূহের সম্পদের ঘাটতি এবং সামর্থ্য বৃদ্ধির বিষয়গুলো সরকারের নজরে আনতে হবে। অপরদিকে সংস্থাসমূহ "নিরাপদ খাদ্য"-কে নিজেদের দায়িত্ব মনেপ্রাণে গ্রহণ করবে। এই "সমন্বয়" বাস্তবায়ন দেখাশোনার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান অনেক অনুবিভাগের একটি অনুবিভাগের উপর বর্তাবে। ঐ অনুবিভাগ "কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি"-কে অগ্রগতি ও সমস্যা অবহিত করবে।

খাদ্য দূষণ এবং ভেজাল খাদ্য নিয়ে অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটেছে। সরকার তথ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার পক্ষ থেকে প্রদত্ত ব্যাখ্যা সবসময় গ্রহণযোগ্য ছিল না। উদাহরণস্বরূপ সবজীতে ফরমালিন মিশ্রণ, সবজী মাঠে থাকা এবং হার্ভেস্টিং পরবর্তি নির্দিষ্ট সময় না রেখে সেখান থেকে নমুনা চয়ন করে "খাদ্যে বিষ" ধরণের খবর পত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করে জনমনে ভীতির সঞ্চার তৈরি করা হয়েছে। ভোক্তা সমাজ এখন বেশ সচেতন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে ভেজাল এবং দূষকমিশ্রিত খাদ্য আহারের ফলে যে পরিমান স্বাস্থ্যহানি হয় এবং চিকিৎসার জন্য যে পরিমান অর্থ ব্যয় হয় তারচেয়ে কিছু বেশী ব্যয় হলেও নিরাপদ খাদ্য সংগ্রহ করা বেশী লাভজনক। দেশের নাগরিক এখন নিরাপদ খাদ্য চায়। এই খাদ্য নিরাপদ রাখার দায়িত্ব খাদ্য উৎপাদক/আমদানিকারক থেকে সকল শ্রেণির খাদ্য ব্যবসায়ীর যারা বিনিময় গ্রহণ করেন। উপরন্তু, খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ এবং নিরাপদ খাদ্য ক্রস-বাউন্ডার একটি পণ্য। এর সাথে বিপুল বাণিজ্যের সম্ভাবনা রয়েছে। খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহকে এ সকল কারনে খাদ্য নিরাপদ রাখার সকল ব্যবস্থাপনা প্রায় একই ধরণের আন্তর্জাতিক মানের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। খাদ্য ব্যবসায়ীগণকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি তাঁদের জন্য অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করতে হবে। প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখতে হবে তেমনি বারংবার ব্যার্থতার কারণে খাদ্য ব্যবসায়ীগণের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিশেষে বিনয়ের সাথে মন্তব্য করতে চাই এই বলে যে সরকারের খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ উৎসাহী হয়ে এগিয়ে না এলে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা বিলম্বিত হবে। যে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, সমন্বয় এবং তথ্য উপাত্ত শেয়ারিং-এ বিদ্যমান খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ নতুন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ।

নিরাপদ খাদ্য ও দরিদ্রতা

মোঃ রেজাউল করিম
সাবেক সদস্য (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ও নিরাপদ খাদ্য কর্মী

উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশ সমূহে দারিদ্র্য যেন মানুষের নিত্য সঙ্গী। দারিদ্র্যকে উপজীব্য করে কত কবি যে সাহিত্য রচনা করেছেন তা গুনে হয়ত শেষ করা যাবে না। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের দারিদ্র্যকে এভাবেই চিত্রায়ন করার চেষ্টা করেছেন "হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্। তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান"।কবির এই মহানুভবতা মানুষকে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে রক্ষা করতে পারছে না । প্রতি মুহূর্তে নশ্বর এই পৃথিবী থেকে কত মানুষ দারিদ্র্যকে অভিশাপ গণ্য করে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে, কত স্বপ্ন যে অলীক হয়ে অন্ধকারের বিমূর্ততার অতলে হারিয়ে যাচ্ছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। দারিদ্র্যর কারণ অনুসন্ধানে কত সমাজ বিজ্ঞানী , অর্থনীতিবিদসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের এবং বিশ্বের তাবৎ নেতৃত্ব বছরের পর বছর কতই না তত্ত্ব বা নীতির উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। কখনও বা দারিদ্র্য নিরসন কখন দারিদ্র্য দূরীকরণ কখনও বা দারিদ্র্য বিমোচন নামে দারিদ্র্যকে নামাংকিত করার চেষ্টা হয়েছে। সেই চেষ্টা এখনও অব্যাহত। দারিদ্র্যকে আকারে প্রকারে প্রকাশের অভিনব প্রচেষ্টা চলছেই। কত ভাবেই না দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে তার হিসেব রাখা এখন আয়াসসাধ্য। অনেকেই দারিদ্র্যকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। সর্বশেষ ২০১৬ সালে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ দারিদ্র্যকে যাদুঘরে পাঠানোর লক্ষ্য নিয়ে "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০" ঘোষণা করেছেন যাহা SDG নামে সর্বাধিক পরিচিত। ১৭টি লক্ষ্য নিয়ে প্রণীত এই "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০" এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য বিলোপ (No Poverty)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দারিদ্র্য বলতে আমরা কী বুঝি এবং দারিদ্র্যর স্বরুপ কী ও এর সম্ভাব্য কারণসমূহই বা কী?

সাধারণভাবে দারিদ্র্য বলতে আমরা একজন ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটানোর মত সম্পদ বা আয়ের অপর্যাপ্ততাকেই বুঝি। সাধারনত দারিদ্র্যকে আর্থিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে দেখা হয় । কিন্তু এর ব্যাপকতা আরও গভীর। যেহেতু মানুষের ব্যক্তিসত্তার পাশাপাশি পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিয় ও বৈশ্বিক পরিচয়ের মত বহুমুখী নিয়ামক ক্রীয়াশীল সেহেতু দারিদ্র্য স্বরুপও এই সকল ক্ষেত্রে ভিন্নতর। মুল কথা হচ্ছে কোন কিছুর অভাববোধই হচ্ছে একধরনের দারিদ্র্য। তবে আমাদের মত নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশসমূহে দারিদ্র্যর প্রধানতম কারণ হচ্ছে খাদ্যের অপর্যাপ্ততা। মানুষের মৌলিক ব্যক্তি চাহিদার মধ্যে খাদ্যের চাহিদা সর্বাগ্রে। সেই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়েই "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০" এর প্রথম লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়েছে দারিদ্র্য বিলোপ (No Poverty)। আর দারিদ্র্য বিলোপের অন্যতম হাতিয়ার খাদ্যের অপর্যাপ্ততা দূরীকরণ। প্রশ্ন হচ্ছে খাদ্যের অপর্যাপ্ততা দূর করলেই কি দারিদ্র্য বিলোপ হবে। যে খাদ্য মানুষকে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে না, মানুষকে কর্মক্ষম করে না বা মানব অস্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায় না তাকে কি আমরা খাদ্য বলব কিনা।

বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানবসৃষ্ট বিপত্তিজনিত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের খাদ্যশৃঙ্খল আজ বহুবিধ দোষে দুষ্ট। একদিকে যেমন নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমান হ্রাস পাচ্ছে অন্যদিকে শিল্প, পরিবহণ ও অন্যান্য দুষণের কারণে জলবায়ুর অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুত নগরায়ন, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন এবং জলবায়ুর অস্বাভাবিক অভিঘাতের ফলে খাদ্যশৃঙ্খল হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হচ্ছে সার, কিটনাশক, বালাইনাশকের মত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক। অবৈজ্ঞানিক ও অসচেতনভাবে প্রয়োগের ফলে এসকল উপাদান খাদ্য শৃঙ্খলে দ্রুত এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে যাহা সমগ্র খাদ্যশৃঙ্খলকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে । দ্রুত নগরায়নের ফলে তৈরী খাবার (Ready to Eat Food) ও প্যাকেটজাত এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারের উপর ক্রমবর্ধিষ্ণু নগরবাসীর নির্ভরতা দিন দিন বৃদ্ধি

পাচ্ছে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ২০২২ সালে বিশ্বে প্যাকেটজাত খাবারে বাজার ছিল ৩৯,২২,৫৯১ মিলিয়ন ডলারের। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা ৪০,৭৯,৪৯৫মিলিয়ন ডলারের এবং ২০৩৩ সালে এর পরিমান দাঁড়াবে ৬২,১১,৬২০ মিলিয়ন ডলারে। প্যাকেটজাত খাবারের উল্লেখযোগ্য অংশই হচ্ছে প্রক্রিয়াজাত খাবার। প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের বিভিন্ন আইটেমে অনেক উপাদান যেমন কৃত্রিম রং, স্বাদ বা গন্ধকারক সহ অন্যান্য অনেক ধরনের রাসায়নিক সংযোজনদ্রব্য থাকে। প্রক্রিয়াজাত খাবার মানুষের মধ্যে স্থূলতার মহামারী, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, লিভার ও কিডনিজনিত জটিলতাসহ ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ক্রমবর্ধমান প্রকোপ বৃদ্ধির জন্য দায়ী মর্মে বিভিন্ন গবেষনায় পাওয়া যাচ্ছে।

অনিরাপদ খাদ্য জনিত বিপত্তি বিশ্বব্যাপী একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে ক্রমবর্ধমানভাবে দেখা হচ্ছে, যাহা মানুষের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। উন্নত দেশ সমূহে অনিরাপদ খাদ্য জনিত সংকট নিরসনের বিষয়ে বিস্তর গবেষনা হচ্ছে । কিন্তু আমাদের মত নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশ সমূহে এই ক্ষেত্রে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণা বা আলোচনা কোনোটিই তেমন গুরুত্ব পাচ্ছেনা। নিরাপদ খাদ্য যে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশ সমূহের অর্থনৈতিক ভিতকে শক্তিশালী করতে পারে সে ব্যাপারে আমাদের দেশের নীতি নির্ধারক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব এখনও সচেতন হননি।

যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত ও বিস্ময়কর উন্নতির ফলশ্রুতিতে খাদ্য বাণিজ্যের বিস্তায়ন, ক্রমবর্ধমান বিশ্ব জনসংখ্যা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল খাদ্য ব্যবস্থা সবই খাদ্য নিরাপদতা উপর প্রভাব ফেলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO/২০১০) তথ্য ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবী বা রাসায়নিক পদার্থ ধারণকারী অনিরাপদ খাদ্য ডায়রিয়া থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত ২০০ টিরও বেশি বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে। বিশ্বজুড়ে, আনুমানিক ৬০০ মিলিয়নের ও বেশী মানুষ প্রতি বছর অনিরাপদ খাবার খাওয়ার পরে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এর মধ্যে ৪২০০০০ জন মানুষ দ্রুত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। পাশাপাশি ৩৩মিলিয়ন সুস্থ জীবন বছর (DALYs) হারাচ্ছে ।

বিশ্বব্যাংক এর ২০১৮সালের 'দ্য সেইফ ফুড ইমপারেটিভ' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে খাদ্যজনিত রোগের কোরণে মোট অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমান ১১০ বিলিয়ন ডলার যার মধ্যে মোট উৎপাদনশীলতা হ্রাসজনিত ক্ষতির পরিমান আনুমানিক প্রতি বছর ৯৫.২ বিলিয়ন ডলার, এবং খাদ্যজনিত রোগের চিকিৎসার বার্ষিক খরচজনিত ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ১৫বিলিয়ন ডলার। এর সাথে আরও যে ব্যয় সমুহ রয়েছে তা হচ্ছে, খামার এবং কোম্পানির বিক্রি হ্রাসজনিত ক্ষতি, পরিত্যক্ত বাণিজ্য আয়, পচনশীল অথচ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের প্রতি ভোক্তাদের অনিহাজনিত স্বাস্থ্যগত প্রতিক্রিয়া এবং খাদ্য অপচয়ের ফলে জলবায়ু ও পরিবেশগত ক্ষতি ইত্যাদি।

এখন দেখা যাক অনিরাপদ খাদ্য কিভাবে মানুষকে দ্রুত দারিদ্র্যর দিকে ধাবিত করছে। আমরা জানি দ্রুত নগরায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, অধিকহারে খাদ্য উৎপাদন, ভোক্তার দ্রুত রুচি পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে খাদ্য ক্রমেই অনিরাপদ হয়ে উঠছে। আর অনিরাপদ খাদ্য গ্রহন ও খাদ্যাভ্যাসের ফলে মানুষ ডায়রিয়া হতে শুরু করে মরণঘাতি ব্যাধি ক্যানসার, লিভার, কিডনি, পরিপাকতন্ত্রের জটিলতা সহ সর্বগ্রাসী ডায়াবেটিক রোগে জর্জরিত। অনিরাপদ খাদ্য জনিত কারণে বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেনীর মানুষজন খাদ্যজনিত রোগ (FBD) জনিত অসুস্থতার কারণে দ্রুত এমন অনেক খরচের সাথে জড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি কর্মদিবস ও কর্মক্ষমতা হ্রাসজনিত ঝুঁকিতে পড়েন । ফলে তার উৎপাদিত সেবার মান ও পরিমাণ কমে যায় এবং তিনি দ্রুত বাজার হারান। যার ফলশ্রুতিতে তিনি দারিদ্র্যের দুষ্টচেক্রের দিকে ধাবিত হন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বৈশ্বিক এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২৪ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে 'বিপর্যয়মূলক' খরচের মধ্যে নিপতিত হচ্ছেন। এছাড়াও চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করতে প্রতিবছর ৬২ লাখের বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছেন এবং অত্যধিক ব্যয় জনিত কারণে ১৬ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা সেবা গ্রহন থেকে নিজেকে বারিত রাখছেন। সরকারের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস ১৯৯৭-২০২০' প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে প্রতিবছরই চিকিৎসায় সরকারি ব্যয় কমছে, বিপরীতে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যয় বাড়ছে। ২০২০ সালে স্বাস্থ্য ব্যয়ে সরকারি খরচ ছিল ২৩ শতাংশ, যেখানে সেবা নিতে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যয় ছিল ৬৯ শতাংশ। দেশে ম্যালেরিয়া, গোদরোগ, বসন্ত, কালাজ্বরের মতো সংক্রামক রোগের প্রকোপ কমে এসেছে। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, কিডনি, লিভার জনিত জটিলতা ও ক্যানসারের মতো অসংক্রামক রোগের প্রকোপ বাড়ছে। এখন দেশে মোট মৃত্যুর ৬৭ শতাংশ হচ্ছে অসংক্রামক রোগে। অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে অনিরাপদ খাদ্যাভাস ও অনিরাপদ খাদ্য গ্রহনেই অসংক্রামক রোগের প্রধান কারণ। স্বাস্থ্যসেবা খাত নিয়ে কাজ করে এমন আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইএমএস হেলথ ও লংকাবাংলার এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালে দেশের বাজারে সর্বাধিক বিক্রিত ১০টি ওষুধের মধ্যে ৬টিই গ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ওষুধ।

অনিরাপদ খাদ্যের ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকিই বৃদ্ধি করে না পাশাপাশি খাদ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারকে সংকুচিত করে যার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পায়, মানুষের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন হয়ে আন্তর্জাতিক খাদ্যপণ্যমুখী হয় যার ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হয়ে যায়, খাদ্য অপচয় বেড়ে যায় ফলে গ্রীনহাইজ গ্যাসের আধিক্য সৃষ্টি হয়ে জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাব রাখে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের খাদ্য সম্পর্কিত সুনাম বা ব্র্যান্ডিং ক্ষতিগ্রস্থ হয় যার ফলে পর্যটন ব্যবসা ক্ষতির মুখে পড়ে। এতে করে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পায় এবং দরিদ্রতা সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য দেশের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ,সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, এনজিও এবং সামাজিক সংগঠন, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ নিরাপদ খাদ্য একটি বহুমুখী ব্যবস্থার সমন্বিত ফসল। একক কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার বা সরকারের পক্ষ্যে এর রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয় । এর সাথে যুক্ত রয়েছে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জ্ঞান, প্রশিক্ষন, সচেতনতা, খাদ্যাভ্যাস জনিত রুচির পরিবর্তন, খাদ্য সংস্কৃতি, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা এবং সর্বোপরি মানুষের প্রতি ও মানুষের জন্য আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এলক্ষ্যে তাঁর যাত্রা শুরু করেছে । ২০১৩ সালে নিরাপদ খাদ্য আইন জারির অব্যবহিত পরেই ২০১৫ সালে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এক দশকও পার হয়নি । বিশাল এই কর্মযজ্ঞ প্রতিপালনে এই সময়কে অতি নগণ্য বলা যায়। তবে কর্তৃপক্ষ, এই কাজের প্রধানতম দর্শন 'বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা' গড়ে তোলার চেষ্টা করছে । আমাদের দেশে দায়িত্বকে সমস্যার দৃষ্টিতে বিবেচনা করার একটি গতানুগতিকতা বিদ্যমান। কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থাৎ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সকল বিপত্তিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করে সকলের কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাধানের দিকে অগ্রসর হলে দেশকে নিরাপদ খাদ্যের "Trusted Destination" হিসেবে বৈশ্বিক পরিচিতির মাধ্যমে বাংলাদেশ "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০" এর প্রথম লক্ষ্য "দারিদ্র্য বিলোপ (No Poverty)" অর্জনে সক্ষম হবে।

———— ০ ————

ANTIBIOTIC RESISTANCE IN FOOD: A GROWING CONCERN IN BANGLADESH

Sangita Ahmed, PhD
Professor
Department of Microbiology, University of Dhaka

Antimicrobial resistance (AMR) is considered a major health issue in the world. With a recent surge in antimicrobial resistant bacteria throughout the world, and a decline in the development of new antimicrobial agents, AMR has reached to such an extent that we are on the approach of returning to the pre-antibiotic period. Globally, an estimated 0.7 million deaths are linked to AMR and without proper intervention, the death toll may increase to 10 million by 2050. Also, extensive use of antibiotics increases susceptibility of individuals to other serious illnesses. AMR increases the health care cost, affects the productivity of a population and thereby imparts a negative impact on the economic development of a country. These effects are more pronounced in a developing country like Bangladesh where the health care system is already overwhelmed with different communicable and non-communicable diseases, and majority of the people cannot afford expansive treatment regimens. This is reflected in the WHO report, which estimates that in the developing countries of both Africa and South Asia approximately 45% of death occurs due to multidrug resistance.

Several factors have been identified as the key players to the global emergence of antimicrobial resistance. These include a lack of proper knowledge about actual use of antimicrobial in humans, availability of antibiotic as over-the-counter (OTC) drug, indiscriminate use in humans and agriculture, release of non-digested antibiotics into the environment, poor quality of drugs and inadequate surveillance on antibiotic use. For developing countries including Bangladesh, where a large number of people live below the poverty line, malnutrition among the population, chronic and repeated infections, poor healthcare standards and failure to afford more effective and costly drugs act as additional forces.

Of these different factors, transmission of AMR via food chain has become a growing concern in recent years throughout the world, including Bangladesh. There are ample of evidences that suggest that uses of antibiotics in veterinary practice as well as preservatives and disinfectants in food industries have a significant contribution to the emergence and spread of antimicrobial resistant bacteria (AMRB) in the country. In Bangladesh, antibiotics are indiscriminately used in livestock and in high value agriculture crops, which increase rapid emergence of AMR pathogens. These pathogens get easy access into human and animals via food chain. Antimicrobial resistance enables the pathogens to persist longer in food processing environments and to enter the food supply at any time during the farm-to-fork continuum. Antibiotics are often used prophylactically in food-producing animals (i.e., cattle, chickens, and pigs); it is predicted that by 2030 such use will increase by nearly 67% globally.

Several AMRB that have major significance for public health, such as carbapenem or extended-spectrum beta lactamase producing E. coli, cephalosporin and/or fluoroquinolone-resistant Salmonella enterica, fluoroquinolone-resistant Campylobacter spp., colistin resistant E. coli, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, ampicillin resistant Listeria monocytogenes are frequently isolated from food products and food processing environments in Bangladesh. AMR is also a major challenge for the promising aquaculture industry in Bangladesh. Seafoods grown in aquaculture systems and non-animal origin food (fruits and vegetables, legumes and grains) are often identified as hotspots of AMR, as well. Moreover, many studies have reported presence of antimicrobial residues in several food products in Bangladesh, mostly those of animal origin, like dairy, poultry and meat products. This is caused by irrational use of antibiotics in animal production and negligence to follow the recommended withdrawal periods prior harvesting and marketing. Direct exposure to these antibiotic residues can cause serious consequences in human including direct

toxicity, alteration of commensal microflora, and the possible development of resistant strains resulting in failure of antibiotic therapy in clinical situations.

Anti-microbial resistant bacteria are not only isolated from foods in Bangladesh, they are also commonly detected in food processing and animal production environment such as soil, water and vegetation. Use of untreated human and animal manure, irrigation water for plant-based foods and and water for aquaculture are considered as major contributors, which potentiates contamination of the environment, crops, and livestock. For example, Coliforms associated with feces are widely dispersed in the environment, particularly in areas adjacent to livestock production units. Air samples collected from animal farm environment are often reported to harbor AMRB, including Methicillin-resistant S. aureus (MRSA). Spread of extended-spectrum β-lactamases-Enterobacteriaceae by dust particles are also evident. In particular, water contaminated with animal or human feces act as a very effective vehicle for the extensive spread of AMRB, genetic elements, and antibiotic residues across different environments.

Food handlers also play a major role in the spread of AMRB. Food handlers working in cattle and poultry farms, in food processing units and mostly the street food vendors often do not have enough knowledge about sanitation and hygienic practices in food preparation and handling such as hand washing, use of raw material and potable water, food serving, storage etc. Many studies have detected AMRB, including colistin resistant bacteria in hands of food vendors. Consequently, poor and mis-handling of food is considered as one of the leading cause of food contamination in Bangladesh, that also facilitate the spread of AMR.

In addition to spreading pathogenic bacteria, food products derived from poultry, cattle, and seafood often act as a reservoir of antibiotic resistant genes which are transferred to humans through the food chain. Horizontal transfer of these antibiotic resistant genes to nonpathogenic commensal bacteria associated with plants, soil, and animals, further worsens the situation. Moreover, food processing and preservation technologies such as high-pressure, ionizing radiation, ultraviolet radiation that damage bacterial cell membrane, are assumed to facilitate the release and transfer of antibiotic resistant genes. Other probable routes of introducing AMR in foods include bacteria used in fermented food or as probiotics. And, antibiotic resistant genes have been identified in commercially available probiotics, marketed for use in human and animals. Genetically modified plants with antibiotic resistance marker genes also serve as potential sources of AMR spread.

Comprehending the threat of antimicrobial resistance, Government of the people's republic of Bangladesh has developed the 2021–2026 national AMR action plan based on the One Health approach. This action plan involves various sectors that have a role in containing AMR, including human health, animal health, aquatic health, and the environment. Successful implementation of this action plan requires strong, collaborative approach between academia, scientists, food industries and the Government. This coordination on a national scale will enable collecting actual information on the extent of established resistance rates and emerging patterns of resistance, as well as help to identity the risks associated with dissemination of AMR throughout the food production and supply chain.

References

1. RK, Motahara U, Ahmed A, Devnath N, Mahua FA, Hashem RB, Ishadi KS, Alam A, Sujan MSA, Sarker MS. 2023. Exploring the prevalence of antibiotic resistance patterns and drivers of antibiotics resistance of Salmonella in livestock and poultry-derived foods: a systematic review and meta-analysis in Bangladesh from 2000 to 2022. JAC-Antimicrobial Resistance, 5(3). https://doi.org/10.1093/jacamr/dlad059
2. Samtiya M, Matthews KR, Dhewa T, Puniya AK. 2022. Antimicrobial Resistance in the Food Chain: Trends, Mechanisms, Pathways, and Possible Regulation Strategies. Foods. 11(19):2966. https://doi.org/10.3390/foods11192966
3. Sani AA, Rafiq K, Hossain MT, Akter F, Haque A, Hasan MI, Sachi S, Mustari A, Islam MZ, Alam MM. 2023. Screening and quantification of antibiotic residues in poultry products and feed in selected areas of Bangladesh. Vet World. 16(8):1747-1754. doi: 10.14202/vetworld.2023.1747-1754.
4. Ercumen A, Pickering AJ, Kwong LH, Arnold BF, Parvez SM, Alam M, Sen D, Islam S, Kullmann C, Chase C, Ahmed R, Unicomb L, Luby SP, Colford JM Jr. 2017. Animal Feces Contribute to Domestic Fecal Contamination: Evidence from E. coli Measured in Water, Hands, Food, Flies, and Soil in Bangladesh. Environ Sci Technol. 2017 Aug 1;51(15):8725-8734. doi: 10.1021/acs.est.7b01710.
5. Shourav AH, Hasan M, Ahmed S. 2020. Antibiotic susceptibility pattern of Listeria spp. isolated from cattle farm environment in Bangladesh. Journal of Agriculture and Food Research. Volume 2,100082. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2020.100082

পানি শোধনে স্যানিটাইজারের ব্যবহার এবং ফলমূল ও শাক-সবজি হতে অণুজীব দূরীকরণ কেন প্রয়োজন?

ড. মো: গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

মো: থফিজুল হক খান
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি যা দেশের মানুষের খাদ্য স্বয়ম্ভরতা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। বিশ্বে বর্তমানে রোল মডেল হিসেবে কৃষি স্বীকৃতি পেয়েছে। কৃষির এই অগ্রগতিতে কৃষিবান্ধব সরকারের রয়েছে বহুমুখী কর্মকান্ড, নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও সর্বোপরি বিনিয়োগ যা কৃষি বাণিজ্যিকীকরণে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। কৃষক, গবেষক, সম্প্রসারণ, উন্নয়নকর্মী, কৃষিবিদ ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে সর্বমহলের মনোযোগ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও পারস্পারিক সহযোগিতার ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে কয়েকগুণ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য রপ্তানিও হচ্ছে। কৃষিতে বিনিয়োগে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ তথা উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী সমাজ। বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে 4IR কে সর্বক্ষেত্রে যুক্ত করাতে কৃষিকে করবে আরও প্রাণসঞ্চার ফলে আগামীর কৃষি হবে আধুনিক ও উন্নত কৃষি। এতদসত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কৃষিতে ব্যবহার্য সামগ্রী ও প্রতিকূল পরিবেশ কৃষিকে প্রতিনিয়ত হুমকীতে ফেলছে। সাম্প্রতিক জাতিসংঘের একদল গবেষকের তথ্য মোতাবেক ৩৭ হাজার ক্ষতিকর ও বিষাক্ত অণুজীব সনাক্ত হয়েছে যা পানি, মাটি ও বাতাসে বিচরণ করছে এবং তাদের প্রভাবে বছরে সারা বিশ্বে ৪২ বিলিয়ন ডলার পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে এবং এই ক্ষতির পরিমাণ ৪ গুণ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা নি:সন্দেহে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৃষিতে অতিরিক্ত ও যথেচ্ছা রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষুদ্র প্রাণিকুলের আবাস যেমন ধ্বংস হচ্ছে এবং অনেক সময় পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। অতিরিক্ত ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ফলে রাসায়নিক দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ এর উপস্থিতির কারণে তা মানব দেহে ক্যান্সারের ন্যায় বিভিন্ন রোগের সৃষ্টিরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে। ফসলের জমির পানিতে কৃষিপণ্য ধৌতকরণের ফলে লেড, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, নিকেল এর মতো ভারি ধাতব পদার্থ এর উপস্থিতির প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। মাটি ও পানিতে ভারি ধাতব পদার্থের পরিমাণের ভিন্নতা স্থান ভেদে তারতম্য রয়েছে। এ সব ভারি ধাতব পদার্থ মাটি বা পানি হতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হওয়ার মাধ্যমে অবশেষে খাদ্য শস্যে জমা হচ্ছে। পানির ক্ষেত্রে আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই ভূগর্ভস্থ পানিতে অজৈব আর্সেনিকের মাত্রা অনেক বেশি যা জৈব আর্সেনিকের চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর। বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফল হতে পর্যবেক্ষণ করা হয়, চাঁদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালি, মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর, মেহেরপুর, বাগেরহাট জেলায় আর্সেনিকের মাত্রা অন্যান্য জেলার চেয়ে অধিক। অজৈব আর্সেনিকযুক্ত খাবার বা পানি দীর্ঘদিন গ্রহণ করার ফলে ত্বকে ক্যান্সার, ক্ষত হওয়াসহ অন্যান্য জটিল রোগের কারণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি মেটাতে আমাদের বিভিন্ন ধরণের খাবার খেতে হয়। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় বাহিরের খাবারের উপর কিছুটা নির্ভরশীল হতে হয়। দেশে ১৪০ রকমেরও বেশি রাস্তায় তৈরিকৃত খাবার রয়েছে যেখানে চলার পথে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রয়োজনে এসব খাবার গ্রহণ করছে। শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ এসব খাবারের মাধ্যমে কিছু সময়ের জন্য হলেও দেহের পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে থাকে। তুলনামূলক কম মূল্যে এসব খাবার পাওয়া যায় বা সরবরাহ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মান সম্মত হয় না কারণ যথাযথ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রেখে তা তৈরি করা হয় না। খাবারগুলোর উপর মাছি-মশা, ধূলা-বালি, ময়লা-আবর্জনাসহ অন্যান্য অণুজীবের আনাগোনা দেখা যায়। সেখানে বসেই খোলা পরিবেশে অনেকেই খাবার গ্রহণ করছে। দেখা যাচ্ছে একই পানিতে বাসন-কোসন কয়েক বার ধৌত করা হচ্ছে। সেখানে ব্যবহৃত পানির উৎস নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন। ব্যবহারকৃত পানিতে প্রচুর

ক্ষতিকর অণুজীব যেমন- E. coli, Salmonellae, Shigella, Vibrio, viruses (Norwalk, rotaviruses), protozoans (Entamoeba, Giardia, Cryptosporidium) ইত্যাদি সনাক্ত হচ্ছে। এরপরও পানির ব্যবহারে সর্তক হওয়ার তেমন কোন লক্ষণ চোখে পড়ে না। এসব অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য গ্রহণের ফলে বমিভাব, মাথা ব্যাথা, জ্বর হওয়া, টাইফয়েড, জন্ডিসসহ বিভিন্ন রোগে প্রতিনিয়ত মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে যা বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রতিনিয়ত প্রচারিত হচ্ছে এবং গবেষণা প্রতিবেদনেও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। অপরিশোধিত ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংগৃহীত পানি ব্যবহার করে লেবু, বেল, পেঁপে, তেতুঁল ও অন্যান্য ফলের শরবত বা জুস তৈরি করা হচ্ছে এবং অনেকেই তা গ্রহণ করছে। আবার শসা, গাজর, তরমুজ, আচার, চাটনী, ভর্তা, কাঁচা আম, পেয়ারা, জাম্বুরা মাখা, চটপটি, ভেলপুরি, ফুসকা, পুড়ি, পিয়াজুসহ অন্যান্য মুখরোচক খাদ্য দ্রব্য অধিক তেলে ডুবিয়ে ভেজে বিক্রয় করা হচ্ছে যেখানে তেলের ব্যবহারে যেমন প্রশ্ন রয়েছে তেমনি পানির ব্যবহারেও রয়েছে প্রশ্ন। অন্যদিকে সতেজ কৃষিপণ্য উঠানোর পর ধৌতকরণের জন্য যে পানি ব্যবহার করা হচ্ছে তাতেও ভয়াবহ চিত্র দেখা যাচ্ছে। জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রোগ্রাম (এনএটিপি) ফেজ-২ প্রকল্প এর গবেষণা জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনাসহ বিভিন্ন জায়গা হতে বিভিন্ন ফল, সবজি ও ব্যবহারকৃত পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং তাতে দেখা যায়, কুমিল্লা হতে সংগৃহীত ফুলকপি ও সীম এর নমুনার প্রায় ২৭ ভাগ E. coli এবং বাধাকপি, ফুলকপি ও টমেটো নমুনার প্রায় ২৭ ভাগ Shigella দ্বারা আক্রান্ত। অন্যদিকে যশোর থেকে সংগৃহীত টমেটো, লাল শাক ও ঢেঁড়শ এর নমুনার প্রায় ৬৩ ভাগ E. coli দ্বারা আক্রান্ত যা স্বাস্থ্যসম্মত নির্দেশকের সীমানার মধ্যে রয়েছে। গবেষণা কাজের জন্য ৩০ টি নমুনা গাজীপুর অঞ্চল হতে সংগ্রহ করা হয় এবং তাতে দেখা যায়, ফল ও সবজি ধৌতকরণের জন্য বিপণনকৃত কৃষিপণ্যে যে পানি ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানে ক্রোমিয়াম এর উপস্থিতি ১৩৬ পিপিএম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আবার, ক্যাপাসিয়া, গাজীপুর হতে সংগৃহীত নলকূপের পানিতে নিকেল (০.০৪ পিপিএম) এবং কোবাল্ট (০.০২ পিপিএম) এর উপস্থিতি রয়েছে।

পানির অপর নাম জীবন। সকল জীবকুল বেঁচে থাকা ও দৈনন্দিন প্রতিটি কাজের জন্য পানির প্রয়োজন অপরিহার্য। জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের দৈনিক ১.৫-৩.৫ লিটার পানি পান করা দরকার। কিন্তু বিশুদ্ধ পানি গ্রহণ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়। দূষিত বা অস্বাস্থ্যকর পানি ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায়, শহর এলাকায় ৪০ ধরণের উপরে বোতলজাত পানি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কিছুক্ষেত্রে বড় পানির জারে বিভিন্ন খাবারের দোকান ও বিপণিবিতানে সরবরাহ করা হচ্ছে যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে মান সম্মত হচ্ছে না বা পানির গুণগত মানে রয়েছে প্রশ্ন। বেশির ভাগ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বোতলের মোড়কে যে তথ্য পরিবেশন করছেন তা সঠিক নেই বা অনুপস্থিত। ব্যাকটেরিয়া বিষয়ে কিছু তথ্য ছাড়া সেখানে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না বা নেই। জারের পানি ও ব্রান্ড বোতলজাত পানিতে প্রাপ্ত টিডিএস (মিলিগ্রাম/লিটার) এর পরিমাণ বিডিএস স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নীচে রয়েছে। একইভাবে ক্লোরাইড, নাইট্রেট এর পরিমাণও নীচে রয়েছে। পানিতে কলিফর্ম ও ফ্যেকাল কলিফর্মের উপস্থিতি বিদ্যমান (বিডিএস স্ট্যান্ডার্ড মান শূণ্য ধরা হয়েছে)। বিশেষজ্ঞদের মতে খাবার পানির টিডিএস মাত্রা প্রতি লিটার পানিতে ৩০ মিলিগ্রাম হওয়া বাঞ্চনীয়। বর্তমানে বেশিরভাগ বোতল জাত পানি 'রিভারস অসমোসিস' পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় যা জীবাণুমুক্ত হয় তবে খনিজ উপাদানের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পায়। তবে জারে ব্যবহারকৃত পানি মান নিয়ন্ত্রণভাবে উৎপাদন করা হয় বিধায় জারের পানির টিডিএস এর মাত্রা বোতলজাত পানির মাত্রার চেয়ে বেশি থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর মাত্রা অনুযায়ী পানির টিডিএস ৩০০ এর নীচে থাকা 'উত্তম পানি' হিসেবে বিবেচ্য আবার ১২০০ এর উপরে টিডিএস 'অগ্রহণযোগ্য' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কাজেই ফলমুল ও শাকসবজি মানসম্মত পানি দ্বারা ধৌত করা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজনে স্যানিটাইজার ব্যবহার করে শোধন করে নিতে হবে যাতে অণুজীবের সংক্রমণ না ঘটে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এর পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ কৃষিপণ্যে অণুজীবের সংক্রমণ হ্রাস করতে স্যানিটাইজার এর যথাযথ ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করছে যা সতেজ ফলমূল ও শাক-সবজি বা ফ্রেশকাট পণ্যের গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে জীবনকাল বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

স্যানিটাইজার হলো এমন একটি রাসায়নিক যৌগ যা অণুজীবের সংক্রমণ কমাতে সহায়তা করে। সাধারণত: খাদ্যের সংস্পর্শে থাকা অণুজীবকে নির্মূল বা কমাতে ক্লোরিন ব্লিচ বা অ্যামোনিয়াম যৌগ স্যানিটাইজার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের যথাযথ পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যের অণুজীবের সংক্রমণ কমাতে সহায়তা করে। সতেজ ফলমূল ও শাক-সবজি মাঠ হতে বাজার পর্যন্ত স্থানান্তরকালে সরবরাহ চেইনে (Supply chain) বিভিন্ন পর্যায়ে হাত বদলের ফলে জীবাণু সংক্রমণের (Cross contamination) সম্ভাবনা থাকে। দূষিত পানি, মাটি ও অন্যান্য উৎস হতে বিভিন্ন ক্ষতিকর অণুজীব যেমন: E. coli, Salmonellae ইত্যাদি উৎপাদিত এলাকা হতে স্থানান্তরকালে অতি সহজেই সতেজ কৃষিপণ্যে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়াও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকালে স্বাস্থ্যসম্মত ও উপযুক্ত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ না করার ফলেও অণুজীবের উপস্থিতির সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করে ফ্রেশকাট পণ্য স্বাস্থ্যসম্মত ও উপযুক্ত মোড়কে সংরক্ষণ না করার ফলে খাদ্য দ্রব্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর অণুজীবের উপস্থিতি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যায়। আমাদের

দেশে শহরের রাস্তা ও বিপণিবিতানের পাশে অনেক ক্ষুদ্র বিক্রেতাকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সতেজ ফলমূল কেটে বিক্রয় করতে দেখা যায় যেখানে একই পাত্রের পানি বার বার ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলমূল কেটে টুকরো করতে স্টেইনলেস ষ্টীলের চাকু বা ছুরি ব্যবহার না করা ও জীবাণুমুক্ত পানিতে না ধৌতকরণের ফলে বিভিন্ন ক্ষতিকর অণুজীব অতি সহজেই খাবারে প্রবেশের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত অনেকেই বিভিন্ন অসুস্থতায় ভুগছে। উপযুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহারের মাধ্যমে সতেজ কৃষিপণ্যের গুণাগুণ অক্ষুন্ন রেখে সংরক্ষণ করা যায় যা ক্ষতিকর অণুজীবের পরিমাণ কমাতে সহায়তা করে যা ফলমূল ও শাক-সবজির সংগ্রহোত্তর জীবনকাল বৃদ্ধি পায়।

ফলমূল ও শাক-সবজি হতে অণুজীব দূরীকরণ পদ্ধতি

- ফলমূল ও শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ধৌতকরণঃ ফলমূল/শাক-সবজি ধৌতকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম হাত ভালভাবে (১৫-২০ সেকেন্ড) ধুয়ে নিতে হবে। এরপর ব্যবহৃত পাত্র/গামলা ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সামগ্রী (ছুরি, কাঁচি, চপিং বোর্ড) ১ লিটার পানিতে ০.১ গ্রাম ক্যালসিনেটেড ক্যালসিয়াম (০.০১%) অথবা ১ লিটার পানিতে ৫ মিলিলিটার এসিটিক এসিড (০.৫%) দ্বারা ধৌত করতে হবে।

- সাধারণ পানিতে ফলমূল ও শাক-সবজি ধৌতকরণঃ ফলমূল ও শাক-সবজির ক্ষেত্রে বেশির ভাগ রোগ জীবাণুর উৎস মাটি। সংগ্রহকৃত ফলমূল ও শাক-সবজি বা যেকোন কৃষিপণ্য প্রথমেই চলমান অথবা স্থায়ী পানি দ্বারা ধৌত করার মাধ্যমে অণুজীব অনেকাংশে দূর করা যায়। ধৌত করার সময় ফলমূল বা শাক-সবজির উপরিভাগ ১ মিনিট হাত দিয়ে ঘষে ভাল করে পরিস্কার করে নিতে হবে। কিন্তু শাকসবজির ক্ষেত্রে ৪-৫ বার ধুয়ে নিতে হবে যাতে কোন মাটি/ধূলিকোণা অথবা অন্যকোন পদার্থ লেগে না থাকে।

- ফুটানো/সিদ্ধ পানিতে ফলমূল ও শাক-সবজি ধৌতকরণঃ গবেষণা ফলাফলে পর্যবেক্ষণ করা গেছে যে, ফলমূল ও শাক-সবজি চলমান অথবা স্থায়ী পানি দ্বারা ধৌত করার মাধ্যমে যে পরিমাণ রোগ জীবাণু দূর করা যায় তার চেয়ে ফুটানো/সিদ্ধ পানি দ্বারা শাক-সবজি ধৌত করা হলে অণুজীবের পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস পায়।

- শাক-সবজি পর্যাপ্ত তাপমাত্রায় রান্না করাঃ সাধারনত: পর্যাপ্ত তাপমাত্রায় (৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে) রান্না করা অর্থাৎ ভাল করে সিদ্ধ করা হলে খাদ্যে অণুজীবের উপস্থিতি থাকে না বা অণুজীব মারা যায়। এ পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ভর করে রান্নার সময় তাপমাত্রার পরিমাণ, খাদ্য দ্রব্যে পানি সংযোজনের পরিমাণ এবং রান্নার ধরণ (খোলা/বদ্ধ) ইত্যাদির উপর। অবশ্যই রান্নার পূর্বে হাত এবং পাত্র ভালভাবে সাবান/ডিটারজেন্ট/ডিশ ওয়াশার দিয়ে পর্যাপ্তভাবে ধৌত করতে হবে।

- ফলমূল ও শাক-সবজি বিভিন্ন স্যানিটাইজার দ্রবণে ধৌতকরণঃ ক্যালসিনেটেড ক্যালসিয়াম এক প্রকার প্রাকৃতিকভাবে তৈরিকৃত স্যানিটাইজার। প্রথমে নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্যালসিনেটেড ক্যালসিয়াম দ্রবণ তৈরী করতে হবে। একটি পরিস্কার গামলা/পাত্র নিয়ে তাতে ১ লিটার পানিতে ০.১ গ্রাম (০.০১% ক্যালসিনেটেড ক্যালসিয়াম, pH প্রায় ১১) পাউডার যোগ করে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এখন শাক-সবজি/ফলমূল ১-৩ মিনিট উক্ত মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং হাত দিয়ে ভালো করে পরিস্কার করতে হবে। অতঃপর পরিস্কার পানিতে একবার ধৌত করে নিতে হবে এবং পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। এতে করে ক্ষতিকর অণুজীবের সংখ্যা হ্রাস পায় ফলে শাক-সবজি/ফলমূলের সংগ্রহোত্তর জীবনকাল বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও গবেষণা প্রতিবেদনে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলিলিটার এসিটিক এসিড (৫% এসিটিক এসিড) মিশিয়ে ২-৩ মিনিট ফলমূল/শাক-সবজি ডুবিয়ে রাখলে অণুজীবের সংখ্যা হ্রাস পায়। এসিটিক এসিড মিশ্রিত দ্রবণ থেকে ফলমূল/শাক-সবজি উঠিয়ে নিয়ে বাতাসে ৫-৬ মিনিট শুকিয়ে নিতে হবে। এতে করে ফলমূল বা শাক-সবজির গুণগত ও পুষ্টিমানের তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

———— 0 ————

নিরাপদ মাঠ ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা (Bangladesh GAP)

ড. এ এইচ. এম. সোলায়মান
অধ্যাপক, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ও ফ্যাব ল্যাব প্রতিষ্ঠাতা প্রকল্প-পরিচালক, ফ্যাব ল্যাব শেকৃবি

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবারের খাদ্য দিবস উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আনন্দিত। আধুনিক কৃষির এক প্রত্যাশিত লাভজনক ও নিরাপদ ফল-ফসল উৎপাদনের অনন্য বিষয় বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা সম্পর্কে ইতোমধ্যে অনেকেই অবগত হয়েছেন গত কয়েক বছর যাবত। নিরাপদতার দিকটি সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিলে অবধারিতভাবে চলে আসবে উত্তম কৃষি চর্চা অর্থাৎ Bangladesh GAP এর বাস্তবায়নের বিষয়টি। বর্তমান সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বাজারজাতকরণ ও রপ্তানীর স্থানটিতে বেশ ভালোভাবে এগিয়ে যাবে।

বাংলাদেশ-উত্তম কৃষি চর্চা (Bangladesh GAP)

বিশ্ব উত্তম কৃষি চর্চা (Global GAP) সারা পৃথিবীতে নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের বিষয়টি কঠোরভাবে অনুসরণ করে এবং ইহা সকলের নিকট গ্রহনযোগ্য ও বটে। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশেও রয়েছে নিরাপদ খাদ্যমান নিশ্চিৎকরণের নিজস্ব উত্তম কৃষি চর্চা যেমনঃ ইন্ডিয়া গ্যাপ, জাপান গ্যাপ ফাউন্ডেশন, নেপাল গ্যাপ, মালয়েশিয়ান গ্যাপ (Q and G) ইত্যাদি যা সফল ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্যমান নিশ্চিৎকরণে আরো কিছু জনপ্রিয় সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপ যেমন- হেচাপ, আইএসও যা গুদাম, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কে নিরাপদতা প্রদান করে। এ সকল নিরাপদতা মানদন্ড নিশ্চিতে বিশেষ করে ফসল মাঠে নির্দিষ্ট মানদন্ড অনুযায়ী নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা গ্রহনযোগ্য প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতিই হলো বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা (Bangladesh GAP)। বিএআরসি (barc.gov.bd) তাদের ওয়েবসাইটে বাংলাদেশ গ্যাপ এর জন্য আলাদা একটি জানালা খুলেছে যেখানে নীতিমালা, সার্টিফিকেশন মার্ক/লোগো, বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা'র মানদন্ড (Compliance criteria/standard/module)/ মডিউল সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য আপলোড করেছে। সম্প্রতি Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship, and Resilience in Bangladesh (PARTNER) প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট উদ্দেশ্য (PDO) হল বাংলাদেশের কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থায় বৈচিত্রতা (Crop diversification), পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য ও খাদ্য নিরাপদতা (Food safety), উদ্যোক্তা (Entrepreneurship) এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতাকে (Climate resilience) উন্নীত করা। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৯১০৯৩.১২ লাখ টাকা (ডিপিএ-৫৭৫৯৭৯.৯২ লাখ টাকা (৮৩.৩৪%) এবং সরকারী ব্যয় ১১৫১১৩.১৯ লাখ টাকা (১৬.৬৬%) যা পাচ বছর মেয়াদে (২০২৩-২০২৮) বাস্তবায়নের জন্য ৭ টি এজেন্সি; DAE lead, DAM, BARC, BADC, BARI, BRRI, BMDA under Ministry of Agriculture এবং স্ট্রাটেজিক পার্টনার PCU-DAE ছাড়াও ৮টি- প্রতিষ্ঠান - BINA, BIRTAN, BJRI, BWMRI, SRDI, BSRI, Hortex Foundation সকল কৃষি সংস্থা এর অংশগ্রহনে এই প্রকল্পের আওতায় ৫টি ফল (আম, কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, লেবু/জারালেবু) এবং ১০টি সবজি (আলু, বরবটি, বেগুন, পটল, করলা, কাচাঁমরিচ, লাউ, কচুরলতি, কাচাপেঁপে, চিচিঙ্গা) এর গ্যাপ স্ট্যান্ডার্ড ও প্রোটোকল তৈরীর কাজ চলমান। এই ফসলের জন্য বেশ কয়েকটি অঞ্চল প্রাথমিকভবাবে নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ গ্যাপ নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে ৫টি গ্যাপ মডেল ফার্ম, প্রায় ৩ লক্ষ হেক্টর জমি গ্যাপ স্ট্যান্ডার্ড এর আওতায় আনা হবে এবং গ্যাপ এর সম্পৃক্ত দক্ষ কর্মী ও কৃষককে গ্যাপ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ করে বিদেশে ফল -ফসল উৎপাদনে আনেক দূর এগিয়ে যাবে এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সবজি ও ফল এর স্থানীয় বা এলাকাভিত্তিক উত্তম কৃষি চর্চা স্কিম

২০১৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (যা বার্ক, BARC নামে বেশি পরিচিত) বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (FAO-UN) আর্থিক সহায়তায় Bangladesh GAP বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ চাষাবাদ ম্যানুয়াল কৃষি সেক্টরের প্রায় সকল অভিজ্ঞ কৃষিবিষয়ক ব্যক্তিবর্গ মিলে তৈরী করেন। কিন্তু তা পরে আর আলোর মুখ দেখেনি। আমরা ও FAO-UN ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন উপজেলা এবং রাস্তার ধারে খাবার বিক্রয়কর্মীকে নিরাপদ ফল-ফসল উৎপাদন ও বিক্রি নিয়ে সর্বসাকুল্যে প্রায় ২০০০ ব্যক্তি উৎপাদক ও বিক্রয় প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি এবং করছি। এই বাংলাদেশ গ্যাপ নিয়ে প্রমোশন করতে গিয়ে দেখেছি, মাঠ হতে সংরক্ষণাগার পর্যন্ত নিরাপদতা সবচেয়ে বেশী দরকার কারণ উৎপাদন নিরাপদ না হলে পরে যতই চেষ্টা করিনা কেন, খাদ্য নিরাপত্তার খাতিরে নিরাপদতা নিশ্চিত করা যাবেনা ফলে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন টেকসই করা কখনই সম্ভব নয়। তাই অতি দ্রুত Bangladesh GAP বিষয়ক সকল খুঁটিনাটি সকলের কাছে উন্মুক্ত করতে হবে, হ্যাঁ অনেক অবকাঠামোই নেই, তারপরও শুরু করাটা চ্যালেঞ্জ। এখানে বলা রাখা দরকার, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) এর উত্তম কৃষি চর্চা মানদন্ড- খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্যের গুণাগুণ, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, বাগানী বা কৃষক এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা বা গুচ্ছভাবে ওয়েলফেয়ার মডিউল বাস্তবায়ন মডিউল নিয়ে করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপদতা ও গুণাগুণ এর গুরুত্ব বিবেচনা করে ৩টি ক্যাটাগরী যেমন- সংকটাপূর্ণ (Critical), মুখ্য (Major), গৌন (Minor) এ ভাগ করা হয়েছে। এখানে সংকটপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে সকল বৈশিষ্ট্য যা ফল-ফসলের নিরাপদতার পূর্বশর্ত ভঙ্গ করা বা মেনে না চলার কারণে খাদ্য নিরাপদতা বিনষ্ট হবে। এ শর্ত শতকরা ১০০ ভাগ মেনে চলতে হবে। মুখ্য বৈশিষ্ট্য সমূহ মেনে ফল-ফসল উৎপাদন বাধ্যতামূলক এবং গৌন বৈশিষ্ট্য সমূহ মেনে ফল-ফসল উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ফল-ফসল এর ধরণ অনুযায়ী আদেশিত বা বাধ্যতামূলক নয়।

খাদ্য নিরাপদতা ও নিরাপদ ফল-ফসল উৎপাদনে প্রতিপালনীয়/সম্মতি প্রদানের নির্ণায়ক (compliance criteria)ঃ সংকটপূর্ণ (Critical)ঃ শতভাগ (১০০% সম্মতি নেয়া বা প্রতিপালন বাধ্যতামূলক) সম্মতি অথবা প্রতিপালন অপরিহার্য; মুখ্য (Major) (৯০% সম্মতি নেয়া বা প্রতিপালন বাধ্যতামূলক), গৌন; (Minor) (৫০% সম্মতি নেয়া বা প্রতিপালন বাধ্যতামূলক) সার্ক এর উত্তম কৃষি চর্চা ৪টি মানদন্ড- খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্যের গুণাগুণ, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, বাগানী বা কৃষক এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, এবং পৃথক বা গুচ্ছ উৎপাদনকারী ওয়েলফেয়ার মডিউল বাস্তবায়ন ইত্যাদি মডিউলগুলোর মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা মডিউল ফল-ফসল উৎপাদনের সকল লক্ষণীয় বিষয় যেমনঃ ফল-ফসল উৎপাদন এলাকার ইতিহাস ও ব্যবস্থাপনা (Site history and management), রোপন বা বপনযোগ্য বীজ বা প্রজনন উপাদান (Planting materials), GMO, সার ও মাটি অনুষঙ্গ (Fertilizers and soil additives), সেচ-পানি (Irrigation Water), রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার (Chemicals), ফসল সংগ্রহ ও হ্যান্ডলিং পদ্ধতি (harvesting and handling procedure), প্রশিক্ষণ (Training), ফল-ফসল অনুসরণযোগ্যতা এবং পণ্য প্রত্যাহার (Traceability and recall), কাগজ ও নথিপত্র সংরক্ষণ (documents and records), অনুশীলন পর্যালোচনা (review of practices) অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য মডিউলে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পরিত্যক্ত উপকরণ ব্যবস্থাপনা (Waste management), শক্তির দক্ষতা (Energy efficiency), জীব বৈচিত্রতা (biodiversity), বায়ু ও শব্দ দূষন (Air/noise) সকল কৃষি সংশ্লিষ্ট নিয়ামকসমূহ অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে। উদাহরণস্বরুপ: নিরাপদ ফসল উৎপাদনের প্রধান উপকরণ বীজ বা রোপণ/বপন উপাদান যে কোন রোগ-পোকামাকড় আক্রান্ত চিহ্ন মুক্ত থাকতে হবে। সঠিক ও সার্টিফিকেটধারী নার্সারী (সরকারি/বেসরকারি/কৃষি প্রতিষ্ঠান/স্বীকৃত টিস্যু কালচার ল্যাব হতে সংগৃহীত) ভালো গুণাগুন সম্পন্ন রুট স্টক এবং সায়ন সংগ্রহ করতে হবে এবং এই নিয়ামকটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এর স্কোর হবে ৯০% যা অবশ্যই পালন বাধ্যতামূলক তবেই কোন উৎপাদক নিরাপদ ফল-ফসল উৎপাদনের শর্ত পূরণের একটি শর্ত পূরণ করলেন বলে লিপিবদ্ধ করা হবে। এভাবে প্রত্যেকটি মডিউলে উল্লেখিত নিয়ামবলী পালন করে একজন উৎপাদক বাংলাদেশ সরকারের নিরাপদ ফল-ফসল উৎপাদনের সার্টিফিকেট ও মানদন্ড চিহ্ন ব্যবহারের অনুমতি পাবেন। উৎপাদকের মাঠে সরকারী ভাবে চিহ্নিত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন অডিটর বা সরকার কর্তৃক নির্বাচিত ৩য় কোন অডিটর পর্যায়ক্রমে সকল ধাপ পরীক্ষা, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে তার ভুল-ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে নিরাপদ ফল-ফসল উৎপাদনে উৎপাদককে উৎসাহিত করবেন। যদিও এই গ্যাপ এর আওতায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে প্রশিক্ষন এক্সটার্নাল অডিটর কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ দেয়া হয়েছে যারা ISO ১৭০৬৫:২০১২ অনুসরণে যাবতীয় শর্তাবলী পূরণ করবেন এবং মাঠ পর্যায়ে গ্যাপ বাস্তবায়নে অডিট সম্পাদন করে প্রতিবেদন স্কিমওনার (বিএআরসি) ও বিএসিবি (ডিএই) বরাবর প্রেরণ করবে। এখন পর্যন্ত Accreditation board, BACB (DAE), certification board ইত্যাদি গঠন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মনে রাখতে হবে ISO, HACCP, BSTI এসকল প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত ফল-ফসল, উপাদান বা গুদাম থেকে বাজারজাতকরণ সার্টিফিকেট প্রদান করে কিন্তু বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা বা বাংলাদেশ গ্যাপ (Bangladesh GAP) কৃষক, বাগানী বা উৎপাদককে মাঠে নিরাপদ ফল-সবজি চাষে উৎপাদনকারীকে উৎসাহিত ও

সার্টিফিকেট প্রদানে একমাত্র প্রতিষ্ঠান হবে যা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের সাথে ফ্রাপৎভাবে কাজ করতে সক্ষম। এই বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা (Bangladesh GAP) এর বেশ কয়েকটি ধারা বা পর্যায় রয়েছে; যার মধ্যে রয়েছে প্রথম অংশ উত্তম কৃষি চর্চা মানদন্ড (PART I- GAP standards); ২য় অংশেঃ-বাংলাদেশে উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়ন কাঠামো (PART II Structure for implementing GAP in Bangladesh) [ধারা-১: স্কিম মালিকের জন্য নীতিমালা প্রতিষ্ঠাকরণ (SECTION ১. Guidance for Establishing a Scheme Owner); ধারা-২ঃ চালনা কাঠামো (SECTION ২. Governing Structure) এবং শেষ অংশে রয়েছে- উত্তম কৃষি চর্চা সার্টিফিকেট প্রদান (PART III Certification of GAP) যার অন্তর্গত- [ধারা-১-সার্টিফিকেট প্রদান বৈশিষ্ট্য (Section 1. Certification Criteria); ধারা-২-সার্টিফিকেট পাওয়ার নিয়মাবলী; (Section 2. Certification Process); ধারা-৩-সার্টিফিকেট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা কমিটি (Section 3. Requirements for Certification Bodies); ধারা-৪-নিরাপদতার নিশ্চয়তা চিহ্ন ব্যবহারের নিয়ামবলী (Section 4. Rules for Use of Certification Mark)]

Bangladesh GAP ও নিরাপদ সবজি চাষে পদক্ষেপঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নরসিংদীর একটি উপজেলায় পরিবেশবান্ধব সবজি ও ফসল উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় ৫০০জন কৃষক নিয়ে নিরাপদ সবজি চাষে Bangladesh GAP এর অনুসরণ শুরু করেছিল যেখানে কৃষককে বা উৎপাদককে নির্দিষ্ট ফসলের জন্য নিরাপদতার সার্টিফিকেট নিতে হবে যেমন- গ্যাপ টমেটো, গ্যাপ লাউ, গ্যাপ বেগুন ইত্যাদি। বিস্তারিত জানতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর ফিল্ড সার্ভিস উইং অথবা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ওয়েবসাইট অনুসরণ করুন।

বাংলাদেশ গ্যাপ এর খাদ্য নিরাপদতা মডিউলে রাসায়নিক সার ও মাটিতে সংযোজিত অন্যান্য বস্তু ব্যবহার করার সময় বাগানী বা কৃষককে জীবাণুমুক্ত করা, ভারী ধাতুর উপস্থিতি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে মাটির স্বাস্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়টি সংকটপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাসায়নিক পেস্টিসাইড ব্যবহারের ক্ষেত্রে বোতলের গায়ের নিয়ামবলী কঠোরভাবে পালন করা । নিয়ম মেনে রাসায়নিক পেষ্টিসাইড ব্যবহার করতে হবে; পাতা ও ফল-জাতীয় সবজি চাষে পাতা কিংবা ফল আহরণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণ এখন থেকেই শুরু মনে রাখবেন আমাদের দেশে সকল মৌসুমে সকল স্থানে সকল সবজি চাষ করা সম্ভব শুধু সঠিক মানুষ ও প্রতিষ্ঠান থেকে পরামর্শ নিন। আপনার আশে-পাশেই উদ্যানতত্ত্ব সেন্টার (হর্টিকালচার সেন্টার), কৃষি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখান থেকে আপনার যে কোন সমস্যার সমাধান পাবেন । নিরাপদ সবজি চাষে মাঠে বা বাগানে ব্যবহৃত সকল উপাদান এর উৎস তারিখসহ লিপিবদ্ধ করুন যা পরবর্তীতে নিরাপদতার নিশ্চয়তা দিবে।

এখনই করণীয়ঃ আমরা নিরপদ খাদ্য উৎপাদন বলতে মানব ও পশু স্বাস্থের জন্য ঝুঁকিমুক্ত খাবার উৎপাদন, বাজারজাতকরণকেই বুঝি। সমান্তরাল চাষাবাদেও পাশাপাশি এখনই ভাবতে হবে বাণিজ্যিক ভার্টিক্যাল ও ইনডোর চাষাবাদ নিয়ে যা দেশের কৃষি সেক্টরে যুগান্তকারী ভুমিকা রাখবে যা ইতোমধ্যে প্রমান করেছে এশিয়ার বেশ কটি দেশ। আমাদের এখনই সময় আধুনিক স্মার্ট ও নগর কৃষি নিয়ে বেশি গবেষণা, প্রকল্প নিয়ে কাজ করা। নতুন নতুন সৃজনশীল (Innovative) পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণার সাথে সাথে নতুন কৃষি প্রযুক্তিউদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং মাঠ-ফসল ও নগর কৃষি বাজার অনলাইন শপ তৈরীর মাধ্যমে নিরাপদ কৃষি দেশ ও দেশের বাইরে নিজেদের স্বচ্ছ ইমেজ তৈরী ও নিরাপদ খাদ্য সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার এখনই সময়। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা (Bangladesh GAP) এর সকল তথ্য ও সহজে যাতে উৎপাদক আবেদন করতে পারেন এমন নিয়ামাবলী-সম্বলিত আলাদা ওয়েবসাইট দ্রুত করে সরকারের খাদ্য নিরাপদতার আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন। উল্লেখ্য যে নিরাপদ খাদ্য আন্দোলন ও কার্যক্রম সকলের, শুধু সরকারের নয়। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক যে কোন পরামর্শ বা অভিযোগ থাকলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর টোল ফ্রি কল সেন্টারে -১৬১৫৫ নম্বরে ফোন করে (সকাল ৮টা থেকে-রাত ১২টা) এ সংক্রান্ত সকল সহযোগিতা পেতে পারেন।

———— ০ ————

খাদ্যের নিরাপদতা: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত

ড: মো লতিফুল বারী
প্রধান বিজ্ঞানী
উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা:

খাদ্য হলো একটি সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ও জীবনমানের নির্দেশক এবং ইতিহাসবিদরা খাদ্যকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক দিক হিসেবে বিবেচনা করেন, যা সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে প্রতিফলিত করে। খাদ্যের ইতিহাস হলো খাদ্যের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সমাজতাত্ত্বিক প্রভাবগুলির একটি আন্তঃবিভাগীয় অধ্যয়ন। খাদ্য ইতিহাসকে ঐতিহ্যগত রন্ধনসম্পর্কীয় ইতিহাস থেকে পৃথক করা হয়, যা নির্দিষ্ট রন্ধন প্রণালী উদ্ভব এবং পুনঃনির্মাণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে। জীবেরা বেঁচে থাকা এবং প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পাওয়ার জন্য খাদ্যের সন্ধান করে। অন্যদিকে, মানুষ অন্যান্য জীব থেকে আলাদা কেননা তারা শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক কার্যক্রম আশা করে। বর্তমান সময়ে, মানুষের খাদ্য সংগ্রহ ও রান্না করার সময় কম হওয়ায় তারা এখন অবসর সময়কে তাদের জীবনের মান উন্নয়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কার্যক্রমে ব্যবহার করতে পারে। যে কোনো সভ্যতার সঙ্গে খাদ্যের বিধি নিষেধ বা নিরাপদতার বিষয়গুলি ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন সমাজে ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুশাসনের মাধ্যমে খাদ্যবিধি সমূহ, নিষেধাজ্ঞার আকারে বিভিন্ন সমাজে অন্তর্নিহিত ছিল এবং বংশ পরম্পরায় আমাদের কাছে চলে এসেছে। মিশরীয়, চীনা, হিন্দু, গ্রীক এবং রোমান সাহিত্যে এসব প্রাচীন খাদ্য বিধি নিষেধের উল্লেখ রয়েছে। মধ্যযুগে, বাণিজ্য গিল্ডের খাদ্য বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য পণ্যের ভেজাল প্রতিরোধের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল এবং এসব প্রাথমিক খাদ্যবিধি গুলির আইনি উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন প্রতারণার বিরুদ্ধে গ্রাহকদের রক্ষা করা (মিলার ও টেলর, ১৯৮৯)। যদিও জনস্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি তখন বিবেচনায় নেওয়া হয়নি, তবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রতারণা সুরক্ষার সাথে কার্যত অভিন্ন। বাইবেল ধর্ম গ্রন্থে খাদ্য নিরাপদতার বিষয়ে অনেক বিধি নিষেধের উল্লেখ রয়েছে। যেমন, মোজেসের খাদ্যতালিকা সংক্রান্ত আইন, বুক অফ লেভিটিকাসে, যে কোনো আবর্জনা বা মৃত প্রাণী থেকে মাংস ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা, এবং "পাত্রের মধ্যে মৃত্যু" শব্দগুচ্ছ সম্ভবত খাদ্য নিরাপদতার সবচেয়ে সুপরিচিত উদাহরণ, যা বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে (হাট ও হাট, ১৯৮৪)। ইসলাম ধর্ম ৫৭০ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে হারাম এবং হালাল শব্দ প্রদান করে খাদ্য নিরাপদতাকে স্পষ্ট করে। পবিত্র কুরআন সতর্ক করে: 'হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা হালাল ও পবিত্র বস্তু আছে তা খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (সুরা আল-বাকারা ২/১৬৮)। এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে ঐতিহ্যগত বিশ্বাস খাদ্য নিরাপদতায় অবদান রেখেছে এবং কিছু বিশ্বাস কিংবদন্তি গল্প থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মৌখিকভাবে প্রেরণ করা হয়েছিল। খাবারগুলি মানুষের স্বাস্থ্য ভালো রাখার ক্ষমতার জন্য স্বীকৃত ছিল এবং প্রাচীন সাহিত্যে প্রায়শই ঐতিহ্যগত খাদ্য ওষুধের অনুশীলনের উল্লেখ রয়েছে। যার ফলে খাদ্য নিরাপদতা সংক্রান্ত মতামত আজও টিকে আছে। খাদ্য নিরাপদতা বিজ্ঞানের প্রাথমিক ইতিহাস, মানুষের অভিজ্ঞতা এবং রায়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে খাদ্য নিয়ন্ত্রণে ভেজাল শনাক্ত করার জন্য উন্নততর বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আরব বিজ্ঞানী আল চাজিনি, একটি উচ্চ সংবেদনশীল পরিমাপ যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, যার ফলে প্রাচীন বিশ্বের খাদ্য বাণিজ্যে প্রতারণামূলক চর্চা হ্রাস পেয়েছে। মানুষেরা অনুজীব এবং রোগের সাথে তাদের সম্পর্ক বুঝতে শুরু করেননি, যতক্ষণ না লুই পাস্তুর, ১৯ শতকের শেষের দিকে তার গাঁজন এবং পাস্তুরাইজেশন কাজের সাথে প্রথমবার, খাবারের পচন, রোগ এবং অণুজীবের মধ্যে যোগসূত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রাচীন লোকেরা খাবার নষ্ট হয়ে যায় বুঝতে পারছিল, তবে এর কারণ এবং খাবার থেকে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা, সম্পর্ক জানতেন না। যাই হোক, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, গ্রামীণ জনসংখ্যার উন্নয়ন ও সমাজের নগরায়ণের সাথে সাথে বিভিন্ন খাদ্যবিধি প্রণীত হয়েছিল এবং সেইসব খাদ্যবিধি গুলি বর্তমান সভ্যতার উষালগ্নে খুঁজে পাওয়া যায়।

খাদ্য নিরাপদতার ইতিহাস:

খাদ্য নিরাপদতার ইতিহাস সম্ভবত মানব ইতিহাসের মতোই প্রায় পুরানো এবং প্রাকৃতিকভাবে বিষাক্ত খাবারের স্বীকৃতি এবং পরবর্তীতে এড়িয়ে চলার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। । প্রাচীন মানুষ, সম্ভবত পরীক্ষা এবং ত্রুটি দ্বারা, ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে খাদ্য সংরক্ষণের প্রাথমিক রূপগুলির বিকাশ শুরু করেছিল, যা সম্ভবত খাদ্যকে নিরাপদ করে তুলেছিল, যেমন, শুকানো, লবণ দেওয়া, গাঁজন ইত্যাদি। চীনারা প্রাগৈতিহাসিক সময়ে গাঁজন দ্বারা শাকসবজি সংরক্ষণ করত বলে জানা গেছে, এবং প্লিনিয়াস ১ম শতাব্দীতে ইতালিতে মাটির পাত্রে সাদা বাঁধাকপি সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন (মন্টভিল এবং ম্যাথিউস, ২০০৫)। মানুষের খাওয়ার ধরণ, অভ্যাস এবং খাবারের রন্ধন প্রণালী পরিবর্তনের সাথে সাথে খাদ্য নিরাপদতা আইন আরও আনুষ্ঠানিক হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ইসরায়েলের আইনগুলিতে বিভিন্ন খাবার এড়িয়ে চলার পরামর্শ, প্রস্তুতির পদ্ধতি এবং খাদ্য স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মোজেসের খাদ্যতালিকা সংক্রান্ত আইন, বুক অফ লেভিটিকাসে উল্লেখ আছে যে, মোজেস জনসাধারনকে খাদ্য-সম্পর্কিত রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য আইন প্রবর্তন করেছিলেন, যেমন, জামাকাপড় ধোয়া এবং পশু জবাই করার পরে স্নান করা, ইত্যাদি । মিশরীয়, গ্রীক এবং রোমানরাও অনুরূপ আইন প্রবর্তন করেছিলেন (মোসেল এট আল, ১৯৯৫)। পরবর্তীকালে, ইতিহাস জুড়ে, খাদ্য আইন বা আইনগুলি প্রাথমিকভাবে খাদ্যে রাসায়নিক ভেজাল প্রতিরোধ এবং খাদ্য পণ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় খাদ্য নিরাপদতা আইনের কিছু ঐতিহাসিক উন্নয়ন, খাদ্যজনিত রোগজীবাণু এবং খাদ্য নিরাপদতা বইয়ে উপস্থাপিত হয়েছে (বারী এবং উকুকু, ২০১৫)। খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দীতে, চ্যাং চুং-চিং খাদ্যের জন্য নিরাপত্তা বিধিমালা (চিন কুই ইয়াও লুয়েহ)-এর জন্য একটি ম্যানুয়াল তৈরি করেছিলেন যা পূর্ববর্তী অনেক কনফুসিয়ান নিষেধাজ্ঞাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল (নিডহাম, ১৯৬২)। খাদ্য নিরাপদতার বিষয়ে পশ্চিম-ইউরোপীয় জনগন পূর্ব-ইউরোপীয় জনগনের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট ১২৬৬ সালে, রুটির জন্য আইন প্রণয়ন করে বলেছিল যে, "মানুষের শরীরের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়" এমন কোনও প্রধান খাদ্যপণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ। অনিরাপদ খাদ্য নিষিদ্ধ করার আইন প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে এর চেয়ে ভালো বা আরও বেশি সমন্বিত ভাষা খুঁজে পায়নি (হাট এবং হাট, ১৯৮৪)। তা সত্ত্বেও, ১৯ শতকের আগ পর্যন্ত ব্যাপক খাদ্য স্যানিটেশন বা খাদ্য নিরাপদতা আইন গৃহীত হয়নি। ঐতিহাসিকভাবে, শেষ পণ্য পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে, খাদ্য নিরাপদতা ব্যবস্থাপনা শুরু হয়েছিল এবং ১৯২০-এর দশকের গোড়ার দিকে প্রতিরোধমূলক পদ্ধতির দিকে কৌশলগত পরিবর্তনগুলি শুরু হয়, যদিও এই কৌশলগুলি অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছিল (মোসেল এট আল, ১৯৯৫)। পরবর্তীতে, ১৯৩০-এর দশকে আরও প্রতিরোধমূলক খাদ্য নিরাপদতার উপর নতুন করে জোর দেওয়া হয় এবং ১৯৭০ -এর দশকে HACCP কে একটি উন্নত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করে, ব্যবহার করা শুরু হয় (বাউমান, ১৯৯৪)। সুতরাং, খাদ্য নিরাপদতার ইতিহাস হল অসংখ্য আবিষ্কার, উদ্ভাবন এবং বিধিবিধানের ইতিহাস, যা সবই বর্তমানের দিকে জ্ঞান করে।

খাদ্য নিরাপদতার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত:

অতীতে, খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্য পরিচ্ছন্নতা এবং/অথবা খাদ্য নিরাপদতার অনেক ঝুঁকি ছিল এবং মানুষ প্রায়শই খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হতো, এবং অধিকাংশ সংকট তৎকালীন জনগণের প্রজ্ঞা সহযোগিতা এবং প্রচেষ্টায় সমাধান করা হয়েছে। তবে অতীতের সাফল্য ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তা বা খাদ্য নিরাপদতা জনিত সমস্যার সমাধানের নিশ্চয়তা দেয় না। বর্তমানে, মানুষ খাবার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন, যেমন, খাবারে তেজস্ক্রিয় দূষণ, উদীয়মান এবং পুনঃউত্থিত সংক্রামক রোগের জীবানু, GMO ভিত্তিক খাবার, ইত্যাদি। ভবিষ্যতে, আরও গুরুতর এবং উচ্চ-স্তরের ঝুঁকি ঘটতে পারে, কেননা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বে বিভিন্ন বড় ধরণের বিপর্যয় হয়েছে, যেমন, ইউরোপে ব্যাপক ঝড় এবং বন্যা; কানাডায় বরফ ঝড়; মানুষ (এইডস, ইবোলা ভাইরাস) এবং প্রাণী উভয়কে সংক্রামিত করে এমন জীবানু (বিএসই, নিপাহ, কোভিড-১৯), জাপানের সুনামি এবং বিকিরণ ছিদ্রনির্গত হওয়া, আরব দেশগুলিতে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ ইত্যাদি, অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় যা ঠেকানো একক সমাজের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এছাড়া, আবহাওয়া পরিস্থিতি ক্রমশ চরম হয়ে উঠছে, শহরে কেন্দ্রগুলিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ঘনত্ব বাড়ছে, যা এই অঞ্চলগুলিকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। বিশ্বায়ন তার চূড়ান্ত গতিতে (অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক, এবং পরিবেশ) বাড়ছে এবং পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধি করছে, যা বিপজ্জনক রোগজীবাণু, এবং দূষণকারীর বিস্তারকে সহজ করে তুলছে।

এটা প্রত্যাশিত যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, বা প্রকৃতিতে মানুষের কার্যকলাপ বৃদ্ধির সাথে অনেক ঝুঁকি দেখা দেবে এবং ফলস্বরূপ আরও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে। আজকের বিশ্বের বাস্তবতা হল, স্থূলতা এবং/অথবা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা, ক্ষুধার্ত মানুষের চেয়ে বেশি এবং উন্নত দেশগুলির ধনী ব্যক্তিদের তুলনায় দরিদ্র মানুষের স্থূলতা-ঝুঁকি বেশি। বিশ্বের অনেক মানুষ খাদ্য ঘাটতিতে ভুগছে, আবার কেউ বেশি খেয়ে স্বাস্থ্যঝুকিতে রয়েছে। অপুষ্টির পাশাপাশি ভারসাম্যহীন পুষ্টি গ্রহণের কারণে মানুষ অসুস্থ হতে পারে এবং এই ধরনের খাদ্য ঝুঁকি ভবিষ্যতে বাড়বে, তাই সঠিকভাবে মোকাবেলা করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে

"এক স্বাস্থ্য পদ্ধতি" প্রবর্তন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ মানুষ, প্রাণী এবং পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। তাই, সকল জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য, মানুষের স্বাস্থ্য, প্রাণীর স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের স্বাস্থ্যের পারস্পারিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রয়োজন এবং এই ব্যবস্থা প্রবর্তন, মানুষ, প্রাণী এবং পরিবেশের জন্য সর্বোত্তম পন্থা হতে পারে, যদি বাস্তবায়ন করা যায়।

রেফারেন্স:

১) বারী এবং উকুকু, ২০১৫. Foodborne Pathogen and Food Safety (Eds) Published by C.R.C. Press (Taylor & Francis Group), ৬০০০ Broken Sound Parkway N.W., Suite ৩০০, Boca Raton, FL ৩৩৪৮৭, U.S.A.

২) বাউমান. ১৯৯৪. The origin of the HACCP systems and subsequent evaluation. Food Science and Technology Today, ৮: ৬৬–৭২.

৩) হাট এবং হাট. ১৯৮৪. A history of government regulation and misbranding of food. Food, Drug Cosmet. Law J., ৩৯: ৩.

৪) মিলার ও টেলর. ১৯৮৯. Historical development of food regulation in international food regulation handbook. In: R.G. Middlekauf and P. Shubik (eds.). Marcel Dekker, Inc., New York, NY.

৫) মন্টভিল এবং ম্যাথিউস. ২০০৫. Food Microbiology: An Introduction, ASM Press, Washington DC.

৬) মোসেল এট আল. ১৯৯৫. Essentials of the Microbiology of Foods: A Textbook for Advanced studies, John Wiley & Sons, Chichester

৭) নিডহাম. ১৯৬২. Hygiene and preventive medicine in ancient China. J. Hist. Med. Allied Sci., ১৭: ৪২৯–৪.

———— ০ ————

AIMING FOR A ROBUST, COORDINATED, AND COLLABORATIVE FOOD CONTROL SYSTEM IN BANGLADESH

Prof. Samuel Godefroy
Food Control Regulatory Advisor
U.S. Department of Agriculture, Bangladesh Trade Facilitation Projecct

Congratulations and recognition to the Government of the People's Republic of Bangladesh on National Food Safety Day 2024. Great strides are being made by Government and the food and agriculture industry to produce and trade sufficient and safe food to consumers in Bangladesh and in other countries, via growing and diversifying exports. Food safety is not only important for Bangladesh's food and nutrition security but also critical for the country's ambition to increase food exports. In the past year, BFSA promulgated and notified the World Trade Organization (WTO) on new national food standards for a number of topics such as food additives and fortification. In addition, the Bangladesh National Codex program presented the country's position on selected international food standards, marking the first time Bangladesh voiced its position at the international Codex Alimentarius Commission in Rome. These milestones highlight the improving food control system.

Food Control System

An effective food control system is one that is anchored in a robust and modernized food legislative and regulatory framework. The system should enable a structured decision-making process through the reliance on food risk analysis with three components: 1) risk assessment, 2) risk management, and 3) risk communication. The food regulatory actors need to harbor a strong scientific capacity and strive to collaborate and communicate with all stakeholders, including: the competent regulatory authorities, food processors and manufacturers, researchers and academia, and with consumer and health organizations.

Since its establishment in 2013, BFSA was structured to be the leading food regulatory authority in the country, which embodies the principles and guidance issued by Codex Alimentarius Commission, the international food standard setting body, in the Principles and Guidelines for National Food Control Systems (CXG82-2013).

As such, BFSA was set-up to offer the necessary support to all other food regulatory agencies in the country and to rely on food risk analysis principles as the decision-making framework. The breadth of the mandate of BFSA from standard setting, establishing food safety criteria, certification, enforcement, monitoring, and provision of food information gives BFSA the ability to act as the leading food safety coordinator and to serve as a hub for food safety information accessible to all.

During the past decade, BFSA has invested in developing a strong core competency in food regulatory science that will shape the future of food safety decision-making in the country. Such investments have enabled BFSA to launch and carry-out undertakings such as the modernization of national food standards by aligning them with Codex standards.

The investments in food safety risk assessment are particularly worth noting, given that these disciplines are the backbone of sound food decision-making and can enable Bangladesh to fulfil its international obligations as a member of WTO, which requires that decisions concerning import and export of food and agricultural products are anchored in a scientific assessment and are based on contemporary data that has been collected according to the latest risk assessment methodologies.

Center of Excellence in Food Safety Risk Assessment

BFSA is positioned to serve as a center of excellence for food risk assessment in Bangladesh, providing food safety risk assessment services for other regulatory agencies and industry stakeholders. The Authority can develop a core competency in food risk assessment to support standard setting, decision-making, and offering guidance in response to food safety incidents. This starts by supporting other fellow food regulatory organizations, within their mandate to develop food regulatory decisions, but also to check compliance and enforce such decisions. The resulting impact will be a standardization and harmonization of approaches over food regulatory decisions, whether proactive i.e., a standard or a regulatory measure, or reactive, i.e., in response to a food safety incident.

The projected Center of Excellence in Food Safety Risk Assessment also entails—and as a prerequisite—the continued investment in data collection and analysis. In particular, gathering data on food occurrence information for priority hazards in food, as well as data about food consumption; both are critical to compile food exposure information for Bangladesh.

Data Analysis and Sharing

Such data and resources will not only be useful for BFSA and other competent food regulatory authorities in the country, but will also benefit the food industry, researchers, and educators, which are interested in getting access to such data for various reasons. Foremost, the food production sector will benefit from such information to develop studies and assessments to submit to BFSA and to other food regulators in Bangladesh. The data and information are needed to support requests to approve a new food additive, a pesticide application, or veterinary application covering animal-source foods. Compiling risk assessments and data produced by the food industry can be reviewed by and made available to BFSA and other regulators. This will enshrine collaborative mechanisms and promote the responsibility of food producers in ensuring the safety of food products. This will also harmonize and increase predictability in regulatory decision-making because the data, analytical methods, and approaches followed for the use of such data would be known to all.

In doing so, the BFSA will be illustrating the motto that **food safety is indeed a collaborative matter and is "everyone's business".**

The author, Dr. Samuel Godefroy, is the former Director General of Health Canada's Food Directorate, Canada's Food Standard Setting body and a former Vice Chair of the FAO/WHO Codex Alimentarius Commission. Samuel serves as an international expert advisor in food control regulation, Codex standards, and risk-based compliance for cross-border trade for the U.S. Department of Agriculture, Bangladesh Trade Facilitation project. The project supports the Government of Bangladesh to comply with WTO Trade Facilitation Agreement and to expand international trade in food and agricultural products.

USDA

BANGLADESH TRADE FACILITATION

———— 0 ————

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মাটি ও পানিতে ভারি ধাতুর (হেভি মেটাল) ফাইটোরিমেডিয়েশন ঃ একটি পরিবেশবান্ধব, কার্যকর ও টেকসই ডিটক্সিফিকেশন পদ্ধতি

ড. মো. আরিফুল ইসলাম
উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ড. মোঃ হারুনর রশিদ
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট

ভূমিকাঃ

কৃষির টেকসই স্থিতিশীলতা এবং মানবসভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মাটি ও পানি হচ্ছে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রাকৃতিক সম্পদ। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন ও কৃষি বিপ্লবের দরুন ভারি ধাতু (হেভি মেটাল) দ্বারা মাটি ও পানি দূষণ, বৈশ্বিক স্তরে বর্তমানে একটি গুরুতর পরিবেশগত উদ্বেগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ভারি ধাতুর অর্ধায়ু কমপক্ষে বিশ বছরের ও অধিক হয় যা প্রকৃতিতে স্থিতিশীল অবস্থায় বিরাজমান থাকে। প্রকৃতিতে যেসকল উপাদানের আনবিক ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে ৫ গ্রা. এর অধিক হারে বিদ্যমান তাদেরকে ভারি ধাতু হিসেবে ধরা হয়ে থাকে এবং সার্বজনীন দূষণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভারি ধাতু দুইটি ভাগে বিভক্ত যেমন- (১) অত্যাবশ্যকীয় ও (২) অনাবশ্যকীয়। কোবাল্ট (Co), কপার (Cu), ক্রোমিয়াম (Cr), আয়রন (Fe), নিকেল (Ni), ম্যাঙ্গানিজ (Mn) ও জিংক (Zn) এর মতো ভারি ধাতুগুলোকে অনুপুষ্টি (মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট) হিসেবে বিবেচনা করা হয় কিন্তু বেশি পরিমাণে গৃহিত হলে জীবের জন্য বিষাক্ত আকার ধারণ করে। অন্যদিকে ক্যাডমিয়াম (Cd), মার্কারি (Hg) এবং সীসা (Pb) অনাবশ্যকীয় ভারি ধাতু হিসেবে স্বীকৃত যা যেকোন জীবের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

বিভিন্ন ধরণের শিলায় ভারি ধাতু প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে কিন্তু মানুষের কিছু কার্যকলাপ প্রকৃতিতে সেগুলোর উপস্থিতি অতি মাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। কৃষিতে কৃষিজ রাসায়নিক দ্রব্যাদি, পয়ঃনিষ্কাশন বর্জ্য, বায়ো-সলিডস, বর্জ্য পানি ও সার এর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার মাটিতে ভারি ধাতুর অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করে যা মাটিতে ক্রমাগত স্থিতিশীল অবস্থা ধারণ করে এবং উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, বিশ্বব্যাপি এক কোটির ও অধিক মানুষ ভারি ধাতু কর্তৃক দূষিত মাটির দ্বারা আক্রান্ত হয়। ভারি ধাতু ফসলের শিকড় ও মাটির আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে শস্যে বিরাজমান থাকে যা পরবর্তীতে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির সৃষ্টি করে।

এসকল কার্যকলাপের কারণে সৃষ্ট দূষণ জনস্বাস্থ্য, আবাসভূমি ও পরিবেশকে মারাত্মক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দূষিত বর্জ্যের জৈব উপাদানগুলি পরিবেশবান্ধব উপায়ে ধ্বংসযোগ্য কিন্তু পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা প্রবণতার দরুণ ভারি ধাতু ও এর থেকে সৃষ্ট ধাতুবৎ (মেটালয়েডস) অন্যান্য উপাদান পরিবেশের জন্য নতুন এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে উদ্ভুত হয়েছে। এভাবেই, মাটি ও পানিতে ভারি ধাতু কর্তৃক সৃষ্ট দূষণ বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

মাটি ও পানিতে ভারি ধাতুর উৎসসমূহ ঃ

জৈব সঞ্চয়ের মাধ্যমে জীবের শরীরে বিষাক্ততা সৃষ্টির কারণে ভারি ধাতু সারা বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ভারি ধাতুকে সাধারণত ধাতু ও ধাতব উচ্চ মৌলিক ঘনত্ববিশিষ্ট ধাতব পদার্থ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে যা ঘনত্ব, ওজন এবং পারমানবিক সংখ্যা অনুসারে উপবিভক্ত। ক্যাডমিয়াম (Cd), ক্রোমিয়াম (Cr), কোবাল্ট (Co), কপার (Cu), সীসা (Pb), পারদ (Hg) ও জিংকসহ (Zn) সমগোত্রীয় অন্যান্য ধাতুকে উদাহরণস্বরুপ উল্লেখ করে গবেষকবৃন্দ ভারি ধাতুর পারমানবিক ঘনত্বের একটি আদর্শ পরিমাণ স্থির করেছেন যা ৪১ গ্রা./ঘন সে.মি এর অধিক হতে হবে। সামান্য পরিমাণ ভারি ধাতুর উপস্থিতি ও বাস্তুতন্ত্রের (স্থলজ ও জলজ) উপর তীব্র প্রভাব ফেলে। বায়ু নির্গমনের মতো বিচ্ছুরণের উৎস হিসেবে বিবেচিত নিয়ামকসমূহ মাটি ও পানি দূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে স্বীকৃত। বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশের পাশাপাশি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ও পানি দূষণকারী হিসেবে এগুলো সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক।

ভারি ধাতুর প্রাকৃতিক উৎসগুলো হল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমি ক্ষয়, পাথরের অবস্থান বিচ্যুতি অন্যদিকে মানুষসৃষ্ট উৎসসমূহের মধ্যে অসম্পূর্ণভাবে দহনকৃত জীবাশ্ম, খনিজ উত্তোলন, জমি ভরাট, ধাতব পরিশোধন বর্জ্য, বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন কারখানার বর্জ্য, রঞ্জকশিল্পের বর্জ্য, প্রসাধন কারখানার বর্জ্য, কৃষি রাসায়নিক দ্রব্যাদির বর্জ্য, সামরিক অপারেশন ও যানবাহনের নির্গমন হচ্ছে অন্যতম উদাহরণ। খনি, পয়ঃনিষ্কাশন, রঞ্জক, ধাতুর মিশ্রণ তৈরির কারখানা ইত্যাদির বর্জ্য পানিতে আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, কপার, পারদ, সীসাসহ অন্যান্য ধাতুর মতো বিষাক্ত ভারি ধাতুর উপস্থিতি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। পরিবেশ দূষণের জন্য প্রাকৃতিক উৎসের থেকে মনুষ্যসৃষ্ট উৎসগুলি বেশি দায়ী। মনুষ্যসৃষ্ট কিছু প্রধান কার্যকলাপকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে যা পরিবেশে বিষাক্ত ভারি ধাতুর উপস্থিতি মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে (চিত্র-১)। বিভিন্ন ধরণের খনিজ পদার্থের উত্তোলন/গলন অথবা কৃষিজ রাসায়নিক দ্রব্যাদিসমূহ প্রয়োগের সময় আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, সীসা, পারদ, নিকেল, জিঙ্ক ও ইউরেনিয়ামের মতো ভারি ধাতুসমূহ মাটি ও পানিতে যুক্ত হতে পারে।

চিত্র-১ ঃ মাটি ও পানিতে ভারি ধাতুর (হেভি মেটাল) উপস্থিতির জন্য দায়ী মনুষ্যসৃষ্ট প্রধান উৎসসমূহ

এছাড়াও কিছু ব্যাকটেরিয়ার শারীরবৃত্তিক কার্যকলাপ মাটি ও পানিতে মনোমিথাইল মার্কারি (পারদ) বা ডাইমিথাইল মার্কারির মতো বিষাক্ত ভারি ধাতু গঠনে সহায়তা করে যা পানির গুণাগুন হ্রাস করে। গবেষকদের মতে, পানিতে আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, পারদসহ এদের সমগোত্রীয় অন্যান্য ভারি ধাতুর উল্লেখযোগ্য উৎস্য হচ্ছে শিল্পকারখানার অপোরিশোধিত বর্জ্য অন্যদিকে পয়ঃনিষ্কাশন বর্জ্যকে মাটি, উদ্ভিদ ও খাদ্যে কপার, নিকেল, ক্রোমিয়াম, সীসা এবং জিঙ্কের মতো কার্যকরি ক্ষতিকর উপাদানের সাথে সম্পৃক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

পানিতে ভারি ধাতুর উপস্থিতি হ্রাস করা কঠিন সেই জন্য এক্ষেত্রে শুধুমাত্র জারণ অবস্থার রূপান্তর পদ্ধতি প্রযোজ্য যা জলজ জীবের বিপাক ক্রিয়ার পাশাপাশি পরিবেশগত বৈচিত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের উল্লেখযোগ্য ব্যাঘাত ঘটায়। গবেষণামতে, জলজ পরিবেশে ভারি ধাতুর (সীসা, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, মার্কারি এবং জিঙ্ক) উপস্থিতির জন্য পরিবেশগত বেশ কিছু আচরণ দায়ী। মাটিতে ভারি ধাতুর উপস্থিতির কারণে ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত হতে পারে, চাষাবাদের জন্য উপকারি অণুজীবসমূহ বিলুপ্ত হতে পারে, মাটির স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে এবং সর্বোপরি ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যহারে হ্রাস পেতে পারে। উপরন্তু, শস্যে সঞ্চিত ভারি ধাতু মানবদেহের পাশাপাশি বাস্তুতন্ত্রের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ভারি ধাতুর প্রভাব

অনেক ভারি ধাতু ও এর ধাতুবৎ উপাদান (মেটালয়েডস) এর সামান্য পরিমাণ উপস্থিতিও মারাত্মকভাবে স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে এবং এইভাবে ভারি ধাতু ক্রমাগতভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। মুক্ত র‍্যাডিকেল বা আয়ন তৈরির মাধ্যমে ভারি ধাতু জারণ প্রক্রিয়ার নিয়ামকসমূহকে প্রভাবিত করে। এছাড়াও এগুলো রঞ্জক (পিগমেন্ট) ও এনজাইমের প্রধান ধাতুসমূহের প্রতিস্থাপক হিসেবে কাজ করে থাকে। বিষাক্ততার দিক থেকে আর্সেনিক, মার্কারি, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, কপার, সীসা, টিন ও জিঙ্ক এর মতো

ভারি ধাতুগুলো অধিকতর বিষাক্ত। ভারি ধাতু এবং উহার আনবিক ঘনত্ব ও জারণ ধর্মের উপর নির্ভর করে বিষাক্ত ভারি ধাতুসমূহ বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে (সারণী-১)।

সারণী-১ ঃ মানব স্বাস্থ্যের উপর বিভিন্ন ভারি ধাতুর নানাবিধ ক্ষতিকর প্রভাব

ভারি ধাতু	মানবদেহে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব
আর্সেনিক	মানবদেহের মূল কোষীয় ক্রিয়াকলাপকে বাধাগ্রস্ত করে
ক্যাডমিয়াম	দীর্ঘস্থায়ী রক্তস্বল্পতা, জীনের বিবর্তন, বৃক্কঘটিত কার্যক্রমে বাধাপ্রদান এবং ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী
ক্রোমিয়াম	চুল পড়া সমস্যার সৃষ্টি করে
কপার	মস্তিস্ক ও কিডনীর বিকলাঙ্গতা, লিভার সিরোসিস, পাকস্থলি ও আন্ত্রিক প্রদাহজনিত সমস্যার সাথে সম্পর্কিত
মার্কারি	কতিপয় লক্ষণের মধ্যে উদ্বিগ্নতা, স্বয়ংক্রিয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় বাধাগ্রস্ততা, বিষন্নতা, সমন্বয় সাধনে সমস্যা, ক্লান্তি, চুল পড়া, অনিদ্রা, মানসিক অস্থিরতা, আলসার এবং মস্তিস্ক, কিডনি, ফুসফুসজনিত শারিরিক জটিলতা অন্যতম
নিকেল	চুলকানি ও অ্যালার্জি, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণের ফলে ফুসফুস, নাক ও সাইনাসের ক্যান্সার, হেমাটোটক্সি তৈরির মাধ্যমে চুল পড়া, স্নায়ুবিক বিষক্রিয়তা, জীনগত বিষক্রিয়তাসহ, কিডনি ও লিভারের বিষক্রিয়তার জন্য দায়ী
সীসা	সীসার বিষক্রিয়া শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বাধাগ্রস্ততা, বুদ্ধি হ্রাস, শেখার অসুবিধা এবং শিশুদের ভারসাম্যগত সমস্যাসহ রেচনজনিত সমস্যা এবং হৃদপিন্ড ও রক্তসংবহনতন্ত্রের সমস্যাজনিত রোগের কারণ হয়
জিঙ্ক	অতিমাত্রায় সেবন করলে মাথাঘোরাসহ শারীরিক ক্লান্তিজনিত সমস্যার সৃষ্টি করে

মাটি ও পানি থেকে ভারি ধাতুর ফাইটোরিমেডিয়েশন

ফাইটোরিমেডিয়েশন মাটি ও পানি দূষণের প্রধান উৎসগুলো পুনরুদ্ধার করতে মূলত ধাতু শোষণকারী উদ্ভিদগুলোকে কাজে লাগায়। ফাইটোরিমেডিয়েশন পদ্ধতির মাধ্যমে ভারি ধাতুর শোষণের ক্ষেত্রে ফাইটোস্ট্যাবিলাইজেশন, রাইজোডিগ্রেডেশন, ফাইটোএক্সট্রাকশন, ফাইটোডিগ্রেডেশন, ফাইটোঅ্যাকুমুলেশন এবং ফাইটোভোলাটালাইজেশন এর মতো কিছু প্রক্রিয়া জড়িত (চিত্র-২ ও সারণী-২)। ফাইটোরিমেডিয়েশনের জন্য সহায়ক উদ্ভিদগুলোর শিকড়ে উচ্চ মাত্রার ভারি ধাতু শোষণক্ষমতার পাশাপাশি অন্যান্য ধাতুর উপস্থিতি সহ্য করা এবং পরিবেশগত বৈচিত্রের সাথে খাপ খাওয়ানোর মতো শারীরবৃত্তিক সামর্থ্য বিদ্যমান রয়েছে। কিছু জলজ উদ্ভিদ যেমনঃ Eichhornia crassipes, Eichhornia stagnina, Agrostis stolonifera এবং Phragmites australis এর ক্যাডমিয়াম, নিকেল ও সীসা শোষণের সক্ষমতা রয়েছে এবং উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো ভারি ধাতুর দ্বারা দূষিত জলাভূমিকে শনাক্তকরণে ও তা থেকে ভারি ধাতুর ফাইটোরিমেডিয়েশনে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, জলজ উদ্ভিদ Phragmites australis এর কোষের উচ্চমাত্রার ক্যাডমিয়াম ও নিকেল শোষণক্ষমতা রয়েছে যেখানে Echinochloa stagnina এর অধিক মাত্রার সীসা শোষণের ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়াও Ludwigia stolonifera নামক জলজ উদ্ভিদেরও উচ্চ মাত্রার ক্যাডমিয়াম শোষণ ক্ষমতা রয়েছে। এইভাবে, মাটি ও পানি থেকে ভারি ধাতুর উপস্থিতি দূরীকরণের জন্য ফাইটোরিমেডিয়েশন পদ্ধতি হচ্ছে একটি সাশ্রয়ী, সহজসাধ্য, পরিবেশবান্ধব ও কার্যকর কৌশল।

ফাইটোরিমেডিয়েশন পদ্ধতিসমূহ

ক. ফাইটোএক্সট্রাকশন

উদ্ভিদের শিকড়ের মাধ্যমে বিষাক্ত উপাদানকে কচি কান্ডে গ্রহণ ও পরিবহনকে ফাইটোএক্সট্রাকশন বলে যা কখনও কখনও উদ্ভিজ্জশোষণ (Phytoabsorption), উদ্ভিজ্জসঞ্চয়ন (Phytoaccumulation) অথবা ফাইটোসিকুয়েস্ট্রেশন (Phytosequestration) নামে পরিচিত। স্যাঁতস্যাতে কর্দমাক্ত স্থানে জন্মানো বারোটি (১২) জলজ উদ্ভিদের শিকড় ও কচি কান্ড নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে যে, সেগুলোর শিকড় ও কচি কান্ডের আয়রণ সঞ্চয়নের সামর্থ্য আছে। জলজ শাক Amaranthus spinosus L. এর কচি কান্ড জিংক ও ম্যাঙ্গানিজ সঞ্চয়ক (accumulator) হিসেবে কাজ করে। A. spinosus L. I Ricinus communis ছাড়া বাকি অন্যান্য উদ্ভিদগুলোর পাতাকে আয়রণ, জিংক ও ম্যাঙ্গানিজ এর শোষণকারী অঙ্গ হিসেবে পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, পরিবেশ থেকে ভারি ধাতুর ফাইটোএক্সট্রাকশন এর ক্ষেত্রে সৌন্দর্যবর্ধনকারী জলজ উদ্ভিদসমূহের আশাব্যঞ্জক সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথাগত

পরিশোধন কৌশলগুলোর তুলনায় এই ফাইটোএক্সট্রাকশন পদ্ধতিটিকে অধিকতর পরিবেশবান্ধব বলে মনে করা হয়। পরিশোধনের বর্জ্য পানি দিয়ে সেচ দেওয়া কৃষি জমিতে জন্মানো কতিপয় শাকসজি খাওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকির পাশাপাশি এর ফাইটোএক্সট্রাকশন সামর্থ্যের উপর গবেষণা করে দেখা গিয়েছে যে, এসকল শাকসজি জাতীয় জলজ উদ্ভিদের ক্যাডমিয়াম ও মার্কারির মতো ভারি ধাতুর শোষণ ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল।

খ. ফাইটোস্ট্যাবিলাইজেশন

ফাইটোস্ট্যাবিলাইজেশন প্রক্রিয়ায় দূষিত মাটিতে ভারি ধাতুর সঞ্চালন রোধ করার জন্য ধাতু-সহনশীল উদ্ভিদ ব্যবহার করা হয় যা পরিবেশে ভারি ধাতুর জৈব প্রাপ্যতাকে হ্রাস করে দেয়। ফলস্বরুপ, সেগুলো ভূগর্ভস্থ পানিতে স্থানান্তরিত হতে বা খাদ্যচক্রে সংযুক্ত হতে অক্ষম হয়ে পড়ে। ফাইটোস্ট্যাবিলাইজেশন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, Helianthus petiolaris উদ্ভিদের শিকড় মাটি থেকে ৫০ মি.গ্রা/কি.গ্রা পর্যন্ত সীসা আয়ন এবং ৫০ মি.গ্রা/কি.গ্রা পর্যন্ত ক্যাডমিয়াম আয়ন শোষণ করে যা উহার কচি কান্ড ও পাতার মতো বায়বীয় অংশের দ্বারা মাটি থেকে শোষিত ক্যাডমিয়াম ও সীসার তুলনায় ৩ (তিন) গুন বেশি। Vossia cuspidate নামক উদ্ভিদের দূষিত পানি থেকে ভারি ধাতুর ফাইটোস্ট্যাবিলাইজেশন ক্ষমতার উপর গবেষণা করে দেখা গিয়েছে যে, মাটির নিচের অংশের টিস্যুগুলোর ভারি ধাতু শোষণ করার ক্ষমতা মাটির উপরের অংশের কচি কান্ডের তুলনায় অনেক বেশি।

গ. রাইজোফিল্ট্রেশন

রাইজোফিল্ট্রেশন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে দূষিত পানি থেকে দূষণকারী পদার্থের উপস্থিতি দূরীকরণের জন্য উদ্ভিদের শিকড় ব্যবহৃত হয়। মূল শিকড় থেকে নির্গত শাখা শিকড়গুলো ভারি ধাতু শোষণ করে শিকড়ের পারিপার্শ্বিক পিএইচ কে পরিবর্তন করে দেয়। গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, মাটি থেকে মার্কারি (পারদ) শোষণ ও জৈব সঞ্চয়ণের (bioaccumulation) জন্য ভূট্টার (Zea mays) কার্যকারিতা অত্যাধিক। দক্ষিণ আফ্রিকার কোয়াজুলু নাটাল প্রদেশের একটি পয়ঃনিস্কাশন প্লান্টের বর্জ্য থেকে রাইজোফিল্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় ভারি ধাতুর দূরীকরণের জন্য পরিচালিত একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, Kyllinga nemoralis নামক উদ্ভিদ তার শিকড়ের সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে ২১% থেকে ৩৩% পর্যন্ত ক্যাডমিয়াম শোষণ করতে পারে যা নির্দেশ করে যে রাইজোফিল্ট্রেশন প্রক্রিয়া দূষিত পানি থেকে ভারি ধাতুর পরিশোধনের জন্য একটি কার্যকর প্রক্রিয়া।

ঘ. ফাইটোভোলাটালাইজেশন

এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ বিভিন্ন দূষণকারী পদার্থকে কম বিপজ্জনক উদ্বায়ী উপাদানে রূপান্তর করতে ব্যবহৃত হয় যা পরে পাতার পত্র সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ধারণাটি জৈব দূষণকারী পদার্থসমূহের পাশাপাশি সেলেনিয়াম, মার্কারি ও আর্সেনিকের মতো ভারি ধাতুগুলোকে দূরীভূতকরণের কাজে ব্যবহার করা যায়। গবেষণামতে, Astragalus racemosus উদ্ভিদ সেলেনিয়ামকে ফাইটোভোলাটালাইজেশন প্রক্রিয়ায় ডাই মিথাইল ডাই সেলেনাইডে রূপান্তর করে এবং Arabidopsis thaliana উদ্ভিদ আয়নিত পারদকে (মার্কারি) গ্যাসীয় পারদে রূপান্তর করে যা পারদের উদ্বায়ীতা বৃদ্ধি করে। Pteris vittate উদ্ভিদ বিপাকক্রিয়ার মাধ্যমে আর্সেনিক এর মতো ভারি ধাতুকে উদ্বায়ী অবস্থায় রূপান্তর করতে পারে।

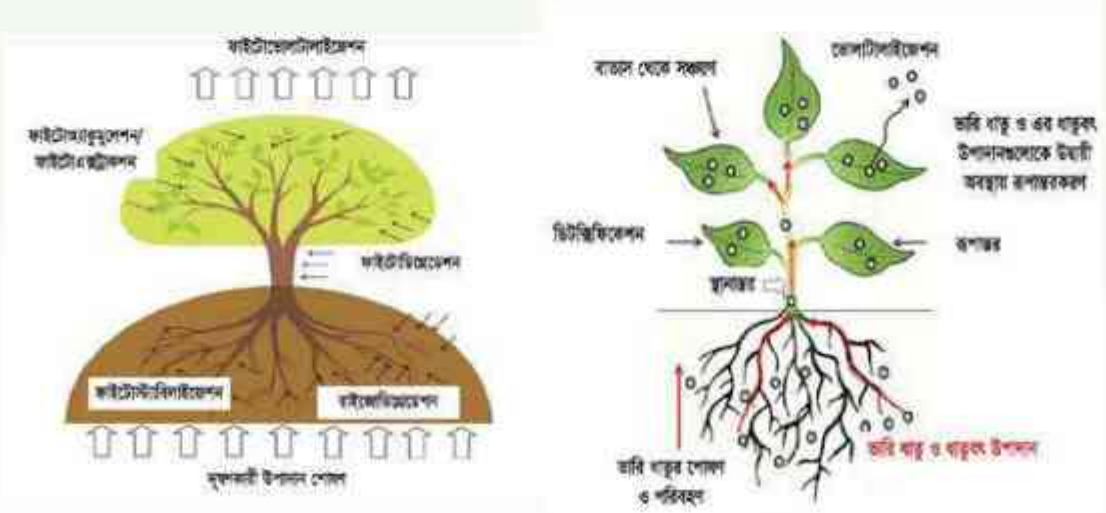

চিত্র-২৪ ফাইটোরেমিডিয়েশন পদ্ধতিতে মাটি ও পানি থেকে ভারি ধাতুর শোষণের কার্যকৌশল

সারণী-২ ঃ ভারি ধাতুর শোষণের জন্য বিভিন্ন ফাইটোরেমিডিয়েশন পদ্ধতিসমূহ

ফাইটোরেমিডিয়েশন পদ্ধতিসমূহ	প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ	কার্যকৌশল	দূষণকারী উপাদানের ধরণ
ফাইটোভোলাটাইলাইজেশন	উদ্বায়ী দূষক এর মাধ্যমে দূষণের ক্ষেত্রে	পাতার পত্রসংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে উদ্বায়ীকরণ	জৈব/অজৈব দূষণকারী
ফাইটোস্ট্যাবিলাইজেশন	খনি দূষণের দ্বারা সৃষ্ট দূষণে	জটিল যৌগে রূপান্তরকরণ	অজৈব দূষণকারী
ফাইটোএক্সট্রাকশন	নিম্ন থেকে মাঝারি দূষিত স্থানসমূহে	অতিমাত্রায় সঞ্চয়ণ	অজৈব দূষণকারী
রাইজোফিল্ট্রেশন	বর্জ্য পানিতে	উদ্ভিদ শিকড়ের সংবহনতন্ত্রে সঞ্চয়ণ	জৈব/অজৈব দূষণকারী

উপসংহার

মাটি, পানি ও মানুষের জন্য গুরুতর ঝুঁকিসমূহের মধ্যে ভারি ধাতুর (হেভি মেটাল) দূষণ অন্যতম যা মূলত খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে। এই জন্য মাটি ও পানি থেকে ভারি ধাতুর দূষণ প্রতিরোধ করা হলে খাদ্যশস্য এবং মাছ ও চিংড়িসহ সামগ্রিক খাদ্য-শৃঙ্খলকে নিরাপদ রাখা সম্ভবপর হবে। এক্ষেত্রে, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব কৌশল এই দূষণগুলোর প্রতিকারের জন্য একটি কার্যকর পন্থা বলে বিবেচনা করা হয় যা নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলস্বরুপ, জলাশয় ও মাটির গঠনগত গুণাগুণের ন্যূনতম বিচ্যুতি বজায় রেখে পরিবেশ থেকে দূষণকারী উপাদানসমূহ দূরীকরণের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কার্যকর উদ্ভিদ-ভিত্তিক ডিটক্সিফিকেশন পদ্ধতির মধ্যে ফাইটোরিমেডিয়েশন হচ্ছে অন্যতম পন্থা। গবেষণালব্ধ ধারণার প্রায়োগিক ফলাফলের ভিত্তিতে ফাইটোরিমেডিয়েশন পদ্ধতিকে আরও নিবিড় ও ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিনিয়ত জোরদার হয়ে উঠছে কারণ এটি কেবল পরিবেশগত প্রক্রিয়ার কারণে যে উপকার সাধন করে তার জন্যই নয় বরং পরিবেশ থেকে ভারি ধাতু অপসারণের জন্য দীর্ঘদিনের সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি ভারি ধাতুর বিষক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের স্বকীয় গুণাগুণ সুরক্ষার জন্য সম্ভাব্য হুমকিসমূহকে ফাইটোরিমেডিয়েশন পন্থার মাধ্যমে নিরসণ করা যায়। মোদ্দাকথা হচ্ছে, ফাইটোরিমেডিয়েশনকে ভারি ধাতুর ডিটক্সিফিকেশনের বিকল্প পন্থা হিসেবে ধাতু ও ধাতুবৎ উপাদানের শোষণকারী উদ্ভিদের ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত একটি সাশ্রয়ী, কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব পন্থা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে এধরণের গবেষণা একেবারেই অপ্রতুল। সুতরাং, ক্রমবর্ধমান জনগণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পুনোরুদ্ধারে ফাইটোরিমেডিয়েশন পদ্ধতির প্রয়োগ বৃদ্ধির জন্য ফাইটোরিমেডিয়েশন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার উপর বিভিন্ন ধরণের অনুঘটকের প্রভাবগুলো আরও ভালভাবে অনুসন্ধান করার জন্য আমাদের দেশে এ সম্পর্কিত নিবিড় গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া অত্যাবশ্যক।

১ উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট
২ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট
৩ মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ.দা), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট

DESIGNER EGGS PRODUCTION AND ITS HEALTH BENEFIT

Professor Dr. Md. Elias Hossain
Department of Poultry Science
Bangladesh Agricultural University

Designer or nutritionally enriched eggs are ones whose composition has been altered from that of a typical egg to include more medicinal chemicals, higher levels of vitamins and minerals, lower cholesterol, and more omega fatty acids. Designer food refers to food that is designed to have some health benefits other than its traditional nutritional value. 'Designer food', 'functional food' and 'fortified food' are synonyms. Eggs are a cheap source of high quality protein along with a balanced ratio of vitamins (except vitamin C) and minerals but due to the high content of cholesterol (200 mg/egg), the per capita consumption of eggs is low. A reduction in consumption has a direct impact on the poultry industry; hence attempts are being made to manipulate and improve the nutritive value of the eggs. Improvements in nutrients generate today's so-called functional or designer eggs.

Different types of designer eggs

- Omega 3 fatty acid enriched eggs
- Low cholesterol eggs
- Vitamin E enriched eggs
- Herbal enriched eggs
- Pigment enriched eggs
- Lutein enriched eggs
- Iodine enriched eggs
- Vitamin-D enriched eggs
- Selenium enriched eggs
- Mineral enriched eggs
- Pharmaceutical designer eggs

Omega-3 fatty acid enriched egg

Omega-3 fatty acids are quite beneficial for human health. The main benefits of omega-3 eggs for consumers are the fatty acids that enhance phospholipids, which results in improved health. Other beneficial effects have been reported, including lower plasma triglyceride concentrations systolic and diastolic blood pressures, and platelet aggregation. Consumption of modified eggs reduced overall plasma cholesterol levels in several trials. Omega-3 fatty acids help prevent heart diseases, skin diseases and auto immune disorders. The daily intake of 0.5-to-1.0-gram omega-3 fatty acids is recommended for an individual for a healthy life. The food industry is taking steps to return these healthful

fatty acids to human diets. In this regard, poultry meat and eggs can serve the purpose if enriched with omega- 3 fatty acids. Laying hens can absorb and deposit dietary fatty acids without considerable modification in the composition. Designer eggs provide omega-6/omega-3 PUFA (1:1) or PUFA/SAFA (1:1) ratios that are balanced. By adding specific nutritional supplements to the diets of laying hens, such as groundnut oil, fish oil, safflower oil, linseed, fish meal, or algae, it is possible to increase the amount of omega-3 fatty acids in the eggs.

Low cholesterol egg

A large egg typically has between 200 and 220 mg of cholesterol. Pharmacological intervention (drugs) or dietary management can be used to lower the cholesterol in eggs. Drugs reduce cholesterol in eggs by preventing the hen from synthesizing cholesterol or by preventing cholesterol from the blood from being transferred to the ovary's developing yolk. The most effective way to lower egg cholesterol content is to lower the energy consumption of the hen. Therefore, feeding hens with a special all-vegetarian diet that is higher in protein and fiber, and enriched in vitamin E can result in the production of low cholesterol eggs.

Vitamin enriched egg

It is possible to develop designer eggs with increased vitamin concentrations, especially for A and E. While a hen's food can affect the amount of vitamins in her eggs, hens can also differ in how well they absorb certain vitamins. Vegetable oils contain vitamin E, a significant antioxidant that guards against cancer and other illnesses. Designer eggs can have increased contents of antioxidant vitamin E and A, which can have a protective impact against heart diseases pointed out that the inclusion of designer eggs into the human diets by 12 to 16 eggs per month increased vitamin E consumption up to the level of 23 mg per day.

Herbal enriched eggs

Depending on the herbs fed to the hens, herbal enriched eggs can be made by incorporating active principles of herbs such as lutein, sulforaphane, taurine, lumiflavin, eugenol, allicin, and many more. To enhance hen performance and produce super eggs with added herbal enrichment, poultry feed can incorporate phytobiotics, or plant-derived products containing multiple plant secondary metabolites. Herbs such as garlic/onion leaves, spirulina, basil leaves, turmeric powder, citrus pulp, flaxseed, red pepper, fenugreek seeds, etc. will be added to chicken feed as supplements. All of these suggest that spreading awareness of herbal-enriched foods can potentially improve human health in addition to hens' general health.

Pigment enriched egg

Certain hydroxy compounds called xanthophylls, of which zeaxanthins are the most effective, are found in egg yolks. These compounds change the color of the yolk and may reduce the risk of cataracts and age-related macular degeneration, boost antioxidant levels, and lessen peroxidative damage to lipids. High concentrations of carotenoids are found in certain pigmented feed ingredients used to feed laying hens, such as yellow corn and its derivatives (corn distiller's dried grains, corn gluten meal), alfalfa meal, marigold-petal meal and dried algae meal.

Mineral enriched egg

The majority of minerals, especially calcium and phosphorus, are known to be found in egg shells. However, through dietary supplementation, scientists have been able to successfully raise the micromineral contents, particularly those of selenium, iodine, zinc, copper, and chromium.

Pharmaceutical designer egg

With the advancement of biotechnology, we can produce genetically modified chickens which then produce eggs containing the desired compound e.g., insulin for the treatment of diabetic patients.

Prospect of designer egg

One of the most crucial elements that significantly affects health is diet, and eggs can be a helpful means of helping people consume more essential nutrients. As a result, research is being done to create dietary components with high nutritional values that have the potential to control immune system responses, treat conditions like diabetes and cancer, control blood pressure, lower cholesterol, and ease allergies and cardiac issues. The proper labeling on the finished packaging needs to emphasize the health advantages of designer eggs. People's awareness about health and nutrition is increasing day by day. So, the production and marketing sector can be increased and improved. It will also increase the employment opportunity. Therefore, Designer egg production has a great prospect in Bangladesh.

Limitation of designer egg production

Bangladeshi people are below the margin, they can't afford the price of designer eggs. At present, the regular price of the egg is 120-140tk/dozen, whereas the omega 3 enriched egg price is 240tk/dozen, folate enriched egg price is 180tk/dozen. These designer eggs are sold only super shops. The consumer of those products is limited. As designer egg is more perishable food, storage should be maintained strictly. Consumer trust issue is also an important factor. The nutrient value of designer eggs is certified, but most people can't trust it.

Conclusion

One of the most crucial elements that significantly affects health is diet, and eggs can be a helpful means of helping people consume more essential nutrients. As a result, research is being done to create dietary components with high nutritional values that have the potential to control immune system responses, treat conditions like diabetes and cancer, control blood pressure, lower cholesterol, and ease allergies and cardiac issues. Essential nutrients like fatty acids, minerals, and vitamins can be supplied by designer eggs that have been supplemented with extra amounts of desired nutrients and related compounds from feed. They might serve as a possible source of medications that give the body the antibodies it needs to stay healthy.

———————— 0 ————————

নিরাপদ দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যই হোক আমাদের আদর্শ খাদ্য

ড. সহদেব চন্দ্র সাহা
পরিচালক
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

দুধকে বলা হয় মানুষের উত্তম বা আদর্শ খাদ্য। প্রোটিন, ফ্যাট/চর্বি, কার্বোহাইড্রেট, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন, পানি ইত্যাদি দুধের প্রধান রাসায়নিক উপাদান। এই উপাদানগুলি দুধে সাধারণত একটি হারে নির্দিষ্ট থাকে। বিভিন্ন কারণে এই গঠন পরিবর্তিত হতে পারে। দুধ উৎপাদক প্রাণী, প্রাণীর খাদ্য, বয়স ও প্রকারের উপর দুধের গঠন নির্ভরশীল। সাধারণত গরুর দুধে ৮৭.৫% পানি, ৩.৮% চর্বি, ৩.২% প্রোটিন, ৪.৮% কার্বোহাইড্রেট, ০.৭% খনিজ পদার্থ থাকে। এ সমস্ত উপাদান ছাড়াও দুধে খুব অল্প পরিমাণে ফ্যাটি এসিড, এমাইনো এসিড, ল্যাকটোজ, শর্করা, নাইট্রোজেনাস বেসেস ও ভিটামিন বিদ্যমান। দুধের ভিটামিন সাধারণত A, B, C এবং D জাতীয়। গরুর দুধের pH সাধারণত ৬.৭-৬.৯। অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া pH-এর এই মাত্রা খুব পছন্দ করে। ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য এটা হলো সর্বোত্তম pH। দুধ যেমন মানুষের উত্তম বা আদর্শ খাদ্য তেমনি ব্যাকটেরিয়ার খুব পছন্দের খাবার বিধায় ব্যাকটেরিয়া আবাদের জন্য দুধ একটি চমৎকার মাধ্যম। তাই দুধের নিরাপদতা রক্ষা করা অতীব জরুরি। পৃথিবীতে বাহুল ব্যাব হৃত দুধের উৎস হচ্ছে গাভি, মহিষ, ভেড়া ও ছাগল। চারটি কারণে খ্যাদ্যঅণুজীববিজ্ঞানে দুধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:-

ক। শিশু ও অধিকাংশ বয়স্কদের জন্য উত্তম খাদ্য।

খ। দুধ প্রধানত ব্যাকটেরিয়ার বংশ বৃদ্ধি/ আবাদের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

গ। দুধ অতি অল্প সময়ে ও অতি সহজে দ্রুত নষ্ট/পচনযোগ্য একটি পুষ্টিকর খাদ্য।

ঘ। দুধ থেকে বহু দুগ্ধজাত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করা যায়।

দুধের সাধারণ ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীব :-

সাধারণত সুস্থ গরুর বাঁটে দুধ থাকে প্রায় অণুজীবমুক্ত। বাহিরের পরিবেশ থেকে ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীব গরুর বাঁটে, বোঁটার নালিতে জন্মাতে সক্ষম। সাধারণত বোঁটার ছিদ্র দিয়ে ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীবরা বাঁটের নালিতে প্রবেশ করে দুধে প্রবেশ করতে পারে। ফলে গরুর বাঁট থেকে প্রথম যে দুধ বের হয়ে আসে, তাতেও থাকতে পারে অসংখ্য অণুজীব। এ দুধে প্রতি মিলিলিটারে অণুজীবের সংখ্যা থাকে কয়েকশত থেকে কয়েক হাজার। সুস্থ গরুর দুধ বহিরাগত অণুজীব দ্বারা কনটামিনেটেড হতে পারে। গরুর বাঁট থেকে দুধ দোহনের সময় এবং পরে অণুজীবরা দুধের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং দুধের মান নষ্ট করে। দুধ ধারণ পাত্র, ধুলিকণা, গোবর, গো-মূত্র, গরুর গায়ে লেগে থাকা ময়লা, গরুর লেজ, অপরিষ্কার হাত ইত্যাদি থেকে অণুজীবরা দুধে প্রবেশ করে, বংশ বিস্তার করে এবং দুধের মান নষ্ট করে। যথাযথ স্বাস্থ্যকর পরিবেশে দুধ দোহানো উচিত। এ সময় গরুর বা ছাগলের চামড়া পরিষ্কার রাখা উচিত। প্রয়োজনে এদের বাঁট বা বোঁটা ব্যাকটেরিওসাইডাল দ্রবণ দ্বারা ধৌত করা উচিত। দুধ রাখার পাত্রটিও ব্যাকটেরিওসাইডাল দ্রবণ দ্বারা ধৌত করা আবশ্যক। তবে খেয়াল রাখতে হবে দুধ রাখার পাত্রটিতে যেন কোনোভাবে ডিটারজেন্ট/কোনো রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ না থাকে। কোনো অবস্থাতেই খোলা আকাশের নীচে দুধ দোহানো উচিত নয়। সাধারণত বাজারে বিক্রিত খোলা দুধে অণুজীবের সংখ্যা বেশি থাকে। অপাস্তুরিত অবস্থায় বাজারের দুধে প্রচুর সংখ্যায় রোগ উৎপাদক ও কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া বিরাজ করে। পাস্তুরিত দুধেও অনেক সময় অল্পসংখ্যক এই ধরনের অণুজীব দেখা যায়। পাস্তুরাইজেশনের পূর্বে দুধে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রতি মিলিলিটারে ১০টি এবং ব্যবহারকারী বা খরিদ্দারদের সরবরাহকালীন সময়ে এর সংখ্যা ১টির বেশি হওয়া উচিত নয়। একটি সর্বসম্মত বা আদর্শমান হচ্ছে দুধে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রতি মিলিলিটারে ১০টির বেশি হওয়া উচিত নয়। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয়মান অনুযায়ী পাস্তুরিত দুধ স্বাস্থ্যসম্মত

হবে যদি উক্ত দুধে প্রতি মিলিলিটারে (ml) কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা ১০টির কম থাকে এবং ক্ষতিকর (Pathogenic) ব্যাকটেরিয়া যেমন *Salmonella, Listeria* ও *Cmpylobacter* অনুপস্থিত থাকে। প্রতি মিলিলিটার পাস্তুরিত তরল দুধে ১০টির অধিক কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া এবং এবং ক্ষতিকর (Pathogenic) ব্যবকটেরিয়া যেমন *Salmonella, Listeria* ও *Cmpylobacter* প্রভৃতির একটি করে সংখ্যা উপস্থিত থাকলেও ধরে নিতে হবে প্যাকেটজাত দুধ সঠিকভাবে পাস্তুরিত হয়নি বা পাস্তুরিত হবার পর দুধ বাহিরের পরিবেশের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা দূষিত (কনটামিনেটেড) হয়েছে বা পাস্তুরিত দুধের সঙ্গে কাঁচা বা তাজা দুধ মিশ্রিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে গরুর দুধে পাস্তুরাইজেশনের পূর্বে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা অধিক থাকে যা খাবার অযোগ্য। পাস্তুরাইজেশন দুধে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা সহনশীল থাকা উচিত। বাজারের কাঁচা দুধকে যদি সাধারণ তাপমাত্রায় ২৪ ঘণ্টা রাখা হয় তবে দুধে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত হারে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। বাজারের খোলা কাঁচা দুধে সাধারণত Enterobacteriaceae পরিবারের সদস্য ছাড়াও *Streptococcus, Micrococcus, Bacillus cereus, Bacillus polymyxa, B. subtilis, Clostridium, Pseudomonas, Flavobacterium, Mycobacterium,* Lactic Acid bacteria ইত্যাদির বিভিন্ন প্রজাতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় এবং দুধের গুণাগুণ ও মান নষ্ট করে। *Clostridium* এবং Coliform ব্যাকটেরিয়া সাধারণত গোবর বা মাটি থেকে দুধে এসে মিশে। এ সমস্ত ব্যাকটেরিয়া দুধে গ্যাস ও দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করে। রেফ্রিজারেটারে সংরক্ষিত অবস্থায়ও কিছু সাইক্রোফিলিক বা ঠাণ্ডাপ্রিয় ব্যাকটেরিয়া দুধের রঙ পরিবর্তন করে, আঠালো অবস্থার সৃষ্টি করে এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। কয়েক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া দুধে এনজাইম সৃষ্টি করে। এই এনজাইমের ক্রিয়ায় দুধের প্রোটিন কেসিন (Casein) ভেঙ্গে অন্য দ্রব্যে পরিণত হয়। ফলে দুধের মান নিম্ন হয়। এরা সাধারণত দুধের অরোগ (Non-pathogenic) উৎপাদক অণুজীব। এরা শুধু দুধের রাসায়নিক ধর্ম পরিবর্তন করে। মানুষের রোগ উৎপাদক ও অরোগ উৎপাদক উভয় প্রকার অণুজীবই দুধের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। ডিপথেরিয়া (Diphtheria), ব্রুসেলোসিস (Brucellosis), কিউ ফিভার (Q Fever), টাইফয়েড (Salmonellosis), Listeriosis (Listeria infection in humans), যক্ষ্মা (Tuberculosis), ডাইরিয়া (Diarrhea) ইত্যাদি রোগের অণুজীব দুধের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার উপকারি ব্যাকটেরিয়া রয়েছে যাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

দুগ্ধজাত দ্রব্য ও ব্যাকটেরিয়া

বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরিতে বিভিন্ন ধরনের অণুজীব ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য বিভিন্ন দেশে প্রচলিত। নীচের তালিকাতে দুগ্ধজাত দ্রব্য ও ব্যাকটেরিয়ার পরিচিতি দেয়া হলো।

দুগ্ধজাত দ্রব্য ও সংশ্লিষ্ট ব্যাকটেরিয়া

দুগ্ধজাত দ্রব্য

ক্রমিক নং	দুগ্ধজাত দ্রব্য	ব্যবহৃত ব্যাকটেরিয়া
১	দই (Curd)	*Streptococcus lactis, Lactobacillus lactis*
২	মাখন (Butter)	*Lactobacillus lactis, Streptococcus thermophilus*
৩	টক দই (Yoghurt)	*Streptococcus thermophilus*
৪	পনির (Cheese)	*Streptococcus cremoris, Streptococcus lactis*
৫	অম্ল দুধ (Acidophilus Milk)	*Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus*
৬	বুলগেরিয়ান দুধ	*Lactobacillus bulgaricus*
৭	কিফির (Kefir)	*Lactobacillus bulgaricus*
৮	কুমোমিস (Koumiss)	*Lactobacillus bulgaricus*

দুধের পাস্তুরাইজেশন (Pasteurization of milk)

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সে ফলের রস এবং তরল পানীয়ের পচন (spoilage) রোধ করার জন্য তাপ প্রয়োগে অণুজীবমুক্ত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানী Louis Pasteur একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, তাঁর নাম অনুসারে এই পদ্ধতির নাম হয় পাস্তুরাইজেশন। ১৮৬৪ সালে Louis Pasteur পাস্তরাইজেশন পদ্ধতি চালু করেছিলেন। তরল পানীয় ও বিয়ার উৎপাদনকালে অপ্রত্যাশিত অণুজীবদের তাপ প্রয়োগে ধ্বংস করা হয়। এলকোহলিক ফার্মেন্টেশনে তাপমাত্রা ১৪৫$\pm^{0}$ ফারেনহাইটে ৩০ মিনিট স্থির

রাখলে কার্যকারিতা সফল হয়। বর্তমানকালে পাস্তুরাইজেশন বলতে দুধের পাস্তুরাইজেশন বুঝায়। দুধকে সম্পূর্ণ স্টেরিলাইজ না করে তাপমাত্রা কিছুটা কমিয়ে রোগ উৎপন্নকরী অণুজীব ধ্বংস করাকে বলা হয় পাস্তুরাইজেশন। দুধকে দীর্ঘ সময় টাটকা (fresh) রাখা প্রক্রিয়ার নাম পাস্তুরাইজেশন।

দুধ পাস্তুরাইজেশনের দুটি উদ্দেশ্য

ক। দুধের রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব ধ্বংস করা

খ। দুধ সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করা

পাস্তুরাইজেশনে দুধ সম্পূর্ণরূপে অণুজীবমুক্ত হয় না। কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রজাতির অণুজীব ধ্বংস করা হয় যারা দুধে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। পাস্তুরাইজেশন তাপমাত্রায় ৯০-৯৯% অণুজীবরা মারা যায়। এই প্রক্রিয়ার দু'টি দিক। একটি নিম্ন তাপমাত্রায় বেশি সময় রাখা এবং অন্যটি উচ্চ তাপমাত্রায় অল্প সময় রাখা।

পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতি

দু'টি পদ্ধতিতে পাস্তুরাইজেশন সম্পন্ন করা হয় ।

ক। হোল্ডিং পদ্ধতি (Holding method)

এই পদ্ধতিতে দুধকে ১৪৫±° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ৩০ মিনিটকাল উত্তপ্ত করে দুধের রোগ উৎপন্নকারী অণুজীব ধ্বংস করা হয়। এটি নিম্ন তাপমাত্রা দীর্ঘ সময় পদ্ধতি।

খ। উচ্চ তাপমাত্রা ও অল্প সময় পদ্ধতি (High temperature and short time method)

এই পদ্ধতিতে দুধকে ১৬১±^{0} ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড উত্তপ্ত করে দুধের রোগ উৎপন্নকারী অণুজীব ধ্বংস করা হয়। বলা যেতে পারে পাস্তুরাইজেশন বলতে বুঝায় যে পদ্ধতিতে দুধের প্রত্যেকটি কণা বা দুগ্ধজাত দ্রব্যকে ১৪৫±^{0} ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট উত্তপ্ত করে বা ১৬১^0 ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড উত্তপ্ত করে বিশেষ ধরনের রোগ উৎপন্নকারী অণুজীব ধ্বংস করা হয়। পাস্তুরাইজেশন তাপমাত্রায় সাধারণত *Mycobacterium tuberculosis, Brucella abortus, Coxiella burnetii,* Coliform ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি ধ্বংস হয়। দুধের মধ্যে *Mycobacterium tuberculosis* ধ্বংস করার জন্য প্রথমে পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে ১৪৩° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট উত্তপ্ত করা হতো কিন্তু পরবর্তীকালে দুধে *Coxiella burnetii* আবিষ্কারের পর পাস্তুরাইজেশন তাপমাত্রা ২±^{0} ফারেনহাইট বাড়িয়ে ১৪৫±^{0} ফারেনহাইটে রেখে ৩০ মিনিট স্থির করা হয়। এই অণুজীবটি দুধের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে এবং মানুষ ও গরুর দেহে কিউ জ্বর সৃষ্টি করে। *Coxiella burnetii* ১৪৫±^{0} ফারেনহাইটে ৩০ মিনিটকাল বেঁচে থাকতে সক্ষম নয়। কিন্তু ১৪৩±^{0} ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ৩০ মিনিটে *Coxella burnetti* ধ্বংস হয় না। বর্তমানে অনেক দুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকারি প্রতিষ্ঠান অতিউচ্চ তাপমাত্রায় (Ultra HighTemperature-UHT) ১৩৫°-১৪০° সেলসিয়াস -এ মাত্র কয়েক সেকেন্ড রেখে প্যাকেট জাত করে দ্রুত কক্ষ তাপমাত্রায় সংরক্ষন করে থাকে।

উপসংহার

দুধ সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য আদর্শ খাদ্য হলেও বয়স বিবেচনায় দুধকে পরিবর্তীত অবস্থায় (Processed) তৈরী করে নিতে হয়। যেমন শিশু এবং বয়স্কদের জন্য দুধে ননীর (Fat) পরিমাণ নির্ধারিত করে দিতে হয়। দুধের সকল পর্যায়ে এবং সকল পরবর্তীত অবস্থাতেই নিরাপদতা রক্ষা করা অতীব জরুরি। যেকোন অবস্থাতেই দুধ অনুজীব দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে। ক্ষতিকর কোন জীবাণু (Pathogenic Microbes) দ্বারা যে কোন পর্যায়ে দুধের দুষণ (Contamination) ঘটলে তা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে। আর অ-ক্ষতিকর জীবানু (Non- Pathogenic Microbes) দ্বারা দুষণ ঘটলে দুধের পুষ্টি-মান নষ্ট হয় যা আমাদের আর্থিক ক্ষতি এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়া দুগ্ধ প্রদানকারী প্রণীর খাদ্যাভাসের ফলে দুধে রাসায়নিক দুষণ (Chemical Contamination) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে। কাজেই নিরাপদতর নিরিখে দুধে সকল ধরণের দুষণমুক্ত রাখাই কাম্য। তাই

FOOD SAFETY: NAVIGATING THE REGULATORY LANDSCAPE IN BANGLADESH

Debabrata Roy Chowdhury
Director Legal
Regulatory & Corporate Affairs and Company Secretary

1. Existing Scenario: An Introspection

Bangladesh recognizes the paramount importance of ensuring food safety for its consumers. To address this concern, the country has implemented various regulations and policies. The primary regulatory body responsible for safeguarding food safety is the Bangladesh Food Safety Authority (BFSA), which was formed under the Food Safety Act 2013. The BFSA formulates and implements food safety standards, conducts inspections, and enforces regulations.

However, the reality in Bangladesh is different. In addition to the Food Safety laws, there are other laws, rules, regulations, policy orders, and standards that govern the marketing of food products, including imports and exports. For example, the Food Safety Act of 2013 and the relevant rules and regulations under the BFSA are intended to be the overarching legislation for all food-related matters. However, the Bangladesh Standards Testing Institution (BSTI) authority, operating under the BSTI Act of 2018, along with its rules and over 80 applicable food-related standards, also regulates the marketing of food products. Additionally, the Import Policy Order and Export Policy Order, framed under the Import and Export Control Act of 1950, and the Breast-milk Substitutes, Infant Foods, Commercially Manufactured Complementary Foods and the Accessories Thereof (Regulation of Marketing) Act 2013 and the Rules 2017 thereof also play a role in governing the marketing of food products. Unfortunately, certain provisions within these laws under different regulatory bodies are inconsistent, conflicting, and sometimes do not align with global standards such as CODEX and EU regulations.

From an administrative perspective, the challenges are significant. All these food-related laws fall under the purview of multiple ministries, including the Food Ministry, Commerce Ministry, Industry Ministry, and Health Ministries. This fragmented governance structure adds complexity and potential coordination issues in ensuring comprehensive food safety regulations.

In summary, while Bangladesh has taken steps to address food safety concerns, the presence of multiple laws and regulations governing the marketing of food products, along with administrative challenges, creates inconsistencies and conflicts. These issues need to be addressed to establish a more effective and streamlined food safety framework that aligns with global standards. This will not only ensure the safety of food for consumers but also create significant opportunities in the global market for Bangladesh, which is crucial to achieve the Vision 2041 for Bangladesh, known as Smart Bangladesh Vision.

2. Complexities: Navigating the Compliance Puzzle

Ensuring food safety in Bangladesh is complex due to the decentralized nature of the food industry, with numerous small-scale producers and informal markets. This makes it challenging to monitor and regulate the entire food supply chain effectively. Additionally, the presence of multiple regulatory bodies and laws governing the marketing of food products creates inconsistencies and overlaps, hindering a streamlined approach to food safety. Lack of consumer awareness about food safety further complicates efforts to ensure safe food practices.

Addressing these complexities requires a comprehensive approach. It involves strengthening coordination and collaboration among regulatory bodies to harmonize regulations and eliminate inconsistencies. Enhancing the capacity of regulatory agencies through training and resources can improve their effectiveness in monitoring and enforcing food safety standards. Additionally, raising consumer awareness through educational campaigns and outreach programs is crucial to promote safe food practices.

Overall, addressing the complexities of ensuring food safety in Bangladesh requires a multi-faceted approach that considers the decentralized nature of the food industry, streamlines regulations, and enhances consumer awareness. By tackling these challenges, Bangladesh can make significant progress towards a safer and more secure food system for its consumers.

3. Challenges: Infrastructure and Capability Constraints

In addition to the aforementioned complexities, ensuring safe food in Bangladesh faces a significant challenge due to inadequate infrastructure and capabilities. Despite the establishment of the Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) to safeguard food safety, it faces resource constraints and limited capacity to fulfill its responsibilities effectively.

One major limitation is the insufficient availability of laboratory facilities and equipment for comprehensive testing and analysis of food samples. Accredited laboratories are essential for detecting contaminants, pathogens, and other potential hazards in food to ensure its safety. However, the lack of well-equipped and accredited laboratories hampers the timely and accurate identification of such hazards, impeding the regulatory authorities' ability to take appropriate actions.

Furthermore, there is a shortage of trained personnel with expertise in food safety and quality assurance. Skilled professionals are necessary for conducting inspections, enforcing standards, and providing guidance to food producers and vendors. However, the limited number of trained personnel poses a challenge in effectively monitoring and regulating the food industry.

The combination of inadequate infrastructure and limited capabilities creates a gap in promptly identifying and addressing potential food safety hazards. This increases the risk of unsafe food reaching consumers and compromising public health.

To overcome these challenges, it is crucial to invest in strengthening the infrastructure and capabilities of the regulatory authorities. This includes providing adequate funding for establishing and maintaining well-equipped laboratories. Additionally, training programs should be implemented to enhance the skills and knowledge of food safety personnel. Fostering partnerships with academic institutions and international organizations can facilitate knowledge exchange and technical assistance to bridge the existing gaps.

By addressing the inadequate infrastructure and capabilities gaps, Bangladesh can enhance its ability to effectively monitor, regulate, and ensure the safety of food throughout the country. This, in turn, will contribute to the overall well-being and health of the consumers.

4. Governance: Evaluating Adherence and Enforcement

Despite regulations in place, ensuring adherence to and enforcement of these regulations remains a significant concern in Bangladesh. The informal food sector, which constitutes a substantial portion of the overall food industry, operates outside the purview of regulatory authorities, evading proper scrutiny and oversight. This poses a risk of unsafe food products entering the market and reaching consumers. The informal food sector includes small-scale producers, street vendors, and local markets that may not have the necessary licenses or permits to operate legally. These entities often neglect proper hygiene practices, quality control measures, and food safety standards.

The lack of oversight and regulation in both the formal and informal sectors creates a loophole for the distribution of unsafe food, endangering consumers.

Lack of accountability within the regulatory system further undermines the enforcement of food safety regulations. Instances of favoritism and lax enforcement compromise the integrity of the regulatory process. This allows non-compliant food businesses to operate without consequences and erodes public trust in regulatory authorities.

Addressing these challenges requires a multi-faceted approach. Strengthening the regulatory framework by closing gaps and addressing inconsistencies is crucial. Extending the reach of regulatory authorities to cover the informal food sector and implementing stricter enforcement measures are necessary. Enhancing transparency, accountability, and anti-corruption measures within the regulatory system is essential for fair and effective enforcement of food safety regulations.

Raising consumer awareness about their rights and the importance of choosing safe food products is vital. Empowering consumers to make informed choices and demand safe food can create market pressure for businesses to comply with regulations and prioritize food safety.

Collaboration and cooperation between regulatory authorities, law enforcement agencies, industry associations, and consumer advocacy groups are essential to collectively tackle these challenges. By addressing adherence and enforcement concerns, Bangladesh can significantly improve the safety and quality of its food supply, safeguarding the health and well-being of its consumers.

5. Finding the Right Path: Essential Course Corrections

To enhance the safety of food in Bangladesh, a comprehensive approach is necessary.

Firstly, the regulatory framework should be strengthened by updating and harmonizing existing regulations. This involves developing specific standards for different food products and establishing a comprehensive food safety management system. It is important to consider the Food Safety Act, its Rules and Regulations as the base law, and ensure that similar provisions under other food-related laws in Bangladesh refer to the provisions under the Food Safety laws only.

Secondly, significant investment in infrastructure and capabilities is required. The government should allocate resources to improve laboratory facilities, provide advanced equipment, and enhance the overall capacity of regulatory authorities. This will enable thorough monitoring, testing, and analysis of food samples to identify and mitigate potential hazards.

Raising awareness among consumers about food safety is of utmost importance. Implementing public campaigns and educational programs will educate individuals about safe food handling, storage, and consumption practices. Empowering consumers with knowledge will enable them to make informed choices and demand safe food from producers and retailers, creating a market-driven incentive for businesses to prioritize food safety.

Collaboration and cooperation between regulatory authorities, industry stakeholders, and consumer advocacy groups are also vital. Regular consultations and partnerships can facilitate knowledge sharing, best practices, and the exchange of information to collectively address food safety concerns.

By implementing these measures, Bangladesh can significantly improve the safety of its food supply. A robust regulatory framework, enhanced monitoring and enforcement capabilities, and an empowered consumer base will contribute to a safer and healthier food environment for all consumers.

6.0 Wrapping Up: Key Takeaways

In conclusion, ensuring the safety of food in Bangladesh requires a comprehensive and proactive approach. While existing regulations provide a foundation, it is crucial to address complexities, improve infrastructure and capabilities, and enhance adherence and enforcement. By taking these steps, Bangladesh can make significant progress towards creating a safer food environment and safeguarding the health and well-being of its consumers. Achieving the goal of safe food for all in Bangladesh will require collective efforts, collaboration, and continuous improvement.

———— 0 ————

FOOD SAFETY: WHO GLOBAL STRATEGY

Faria Shabnam
National Professional Officer-Nutrition
WHO Country Office of Bangladesh

Ensuring safe food as a primary determinant of human health and basic human rights is a shared responsibility among multiple stakeholders. The World Health Organization (WHO) since its establishment, provided leadership in assessing the global burden of Foodborne Diseases (FBDs), strengthened the national foodborne disease surveillance system, and thus has a steadfast commitment to reducing the burden of foodborne diseases.

Food Safety has become an integral part of the Sustainable Development Goals (SDGs). There is a growing awareness on the need to strengthen national food safety systems to improve the protection of public health. National governments should provide strong leadership in response to current and emerging food safety challenges.

Among these challenges, climate change is a key driver of the existing food safety risk. Some food safety issues associated with climate change that are likely to result in increased risks are the emergence of existing and new foodborne pathogens and parasites. Food waste and losses from unsafe food also burden waste management systems and exacerbate food insecurity hindering the progress towards a key target of SDG 12.

Interests and demands for food safety will result in increased attention and resources on food safety, which will eventually improve the protection of consumers, reduce risks from unsafe foods, and establish greater trust and confidence in the national food control system. The rise of new technologies and digital transformation is needed for novel food ingredients, production, and analytical methods; which will increase need for risk assessment of the application of new technologies for food production. Changing expectations and behavior change around food is required to change the purchasing patterns of consumers and mitigate the risk of misinformation on social media platforms.

Vision of the WHO Global Strategy for Food Safety (2022-2030) is that everyone, everywhere, consume safe and healthy food to reduce the burden of FBDs. The strategy gives stakeholders the tools they need to strengthen their national food safety systems and collaborate with partners around the country. This strategy is forward-looking, evidence-based, people-centered, and cost-effective.

The five strategic priorities and relevant strategic objectives are:

1. Strengthening national food control systems

In strengthening the national food controls, governments should ensure that modern, harmonized and evidence-based framework of food legislation founded on a sound legislative and policy base, including the clear articulation of goals and objectives, expected outcomes and performance evaluation frameworks. The structure of the national food controls should include a system for coordination of functions of all the competent authorities across the entire food chain and be fully described in legislation, together with the roles and responsibilities of all national, subnational, and local competent authorities. Effective national food controls require operational coordination at the national level and strengthen structure and process that is appropriate to the national setting. Development and implementation of fit for purpose standards and guidelines in modern food control systems should be flexible. To verify if food business operators comply with food legislation; competent authorities should have adequate well-qualified and experienced staff and possess adequate facilities, financial resources, and equipment to carry out their duties properly. It is also important to establish a multisectoral One Health coordination mechanism, which enables the identification of early warning of food safety emergencies and the

proactive introduction of preventative measures. To respond to food safety emergencies, each country requires a multi-agency, multidisciplinary national food safety emergency plan with appropriate links between food control authorities, public health authorities and as necessary with other responsible agencies.

2. Identifying and responding to food safety challenges resulting from global changes and food systems transformation

As Food systems are complex and multidimensional webs of activities, it requires awareness towards global changes and food systems transformation. Governments must be ready for expected and unexpected changes in food systems and movements of food and the potential impact these changes could have and incorporate preparedness mechanism for cooperation and coordination across all relevant national competent authorities. At the same time government needs to adapt risk management options to emerging foodborne risks brought about by transformation and changes in global food systems and movement of food.

3. Improving the use of food chain information, scientific evidence, and risk assessment in making risk management decisions

The application of risk assessment, risk management and risk communication are now well embedded in the food safety legislations. Comprehensive information along and beyond food chain needs to be gathered and utilized when making informed risk management decisions. Eventually it require promoting the generation and use of scientific evidence and risk assessment when establishing and reviewing food control measures. Ensuring transparency and consistency in risk management decisions at the national level are important attributes that increase trust and confidence in the regulatory system.

4. Strengthening stakeholder engagement and risk communication

Regulatory frameworks on food safety are necessary to define the shared responsibilities of stakeholders, including regulators, FBOs, academia, research institutions and consumers. This framework should also be comprised of acceptable and established measures to monitor compliance and address non-compliance, thus protecting the public from unsafe or fraudulent practices. A consultation platform should be established on the national food safety agenda that can assess use of non-regulatory schemes for enhancing food safety across the food chain. The regulatory framework will facilitate communication, capacity-building and engagement with food business operators, academia, and consumers.

5. Promoting food safety as an essential component in domestic, regional, and international food trade

As, the Codex Alimentarius Commission has a specific mandate to develop science-based international food standards, so it is essential for the country to strategically invest actively engage in the work of this and align with the standards. By strengthening food control systems and capacity building in regulatory systems for the domestic market, interaction between national agencies responsible for domestic food safety and those facilitating international fair-trading practices; country will protect consumer's health and ensure fair practices in the food trade and promote international harmonization of food standards. National authorities with international agencies and networks should be strengthened to establish standards and guidelines for food to ensure a visible and acceptable level of consumer protection.

Bangladesh can review, redesign, or strengthen its national food safety systems as appropriate based upon the strategic priority areas and strategic objectives identified in this strategy. As food safety systems in the country are in various stages of development, the prioritization of strategic actions should be tailored to Bangladesh's situation. The development, updating, and implementation of national food safety strategies comprises four steps:

- Conduct situation analysis
- Develop a national strategy and action plan for food safety
- Implement the national strategy and action plan, and
- Conduct regular reviews of the implementation and adjust the plan and strategy as appropriate

WHO can support in accelerating global action to improve food safety and mainstream food safety in the health and development agenda, synthesize evidence and generate normative guidance, enhance technical cooperation, build partnership and foster global collaboration.

খাদ্যদূষণ: পথে ঘাটে

রেজাউল করিম সিদ্দিকি
সাধারণ সম্পাদক, বিসেফ ফাউন্ডেশন
উপস্থাপক, মাটি ও মানুষ

সাধারণ মানুষ ঘরের খাবার যতটা পছন্দ করেন, বাইরের খাবার তার চেয়ে বেশি পছন্দ করেন। সাধারণ কর্মজীবী মানুষের একটি বড় অংশকে বাধ্য হয়েই বাইরের খাবার খেতে হয়। আবার যারা ভ্রমণে থাকেন তাদেরকেও বাইরের খাবারের উপর নির্ভর করতে হয়। যারা কেনাকাটা করতে বাজারে যান তারাও কিন্তু বাইরের খাবার খান শখ করে। অনেকে আবার সিডিউল করে, দল বেঁধে বাইরের খাবার খেতে যান। প্রতিদিন হোটেল রেস্তোরাঁর সংখ্যা যেমন বাড়ছে, ক্রেতার বা খদ্দের এর সংখ্যাও বাড়ছে। সম্প্রতি আবার চালু হয়েছে হোম সার্ভিস। ভাত, ডাল থেকে শুরু করে বিরিয়ানি, তেহারি, চাইনিজ সব খাবারই এখন ঘরে বসে পাওয়া যায়। তার মানে মানুষ শখে বা সুখে, অসুখে-বিসুখে বাইরের খাবারের উপর নির্ভর করছেন আবার অনেকে আসক্ত হয়ে পড়েছেন বাইরের খাবারের প্রতি।

বাইরের খাবারের মধ্যে একদিকে রয়েছে নামী দামি হোটেল রেস্তোরাঁ, আরেক দিকে রয়েছে ছোট ছোট দোকান যেগুলো রাস্তার পাশে, বাস স্ট্যান্ড বা লঞ্চ ঘাটে, হাটে বাজারে, বটতলায়, খেলার মাঠে বা পার্কে ভ্রাম্যমান বা অস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা। আবার বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত মেলায়ও দেখা যায় খাদ্যের দোকান। সেখানেও কিন্তু ভিড় কম নয়। বাইরের খাবার গ্রহণ করাটা আমাদের আচরণের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

অনেকে শখ করে রাস্তার খাবার খেয়ে থাকেন। আবার বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রয়োজনে এসব খাবার খেয়ে থাকেন। চাকরিজীবী, শিক্ষার্থী, স্বল্প ও মধ্য আয়ের মানুষ খরচ বাঁচাতে এই খবর গ্রহণ করেন।

রাজধানীতে কত মানুষ রাস্তার খাবার খেয়ে থাকেন, তার সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই। ২০১৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলা হয়, রাজধানী ঢাকায় প্রতিদিন প্রায় ৬০ লাখ মানুষ রাস্তার খাবার খেয়ে থাকেন। এখন তো এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। আর রাজধানীর সাথে সারা দেশ যুক্ত হলে প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ আওতায় আসবে।

সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাদ, সাধ্য এবং সময় বাঁচানোর খাতিরে লোকজন এসব রাস্তার খাবারের দোকানে ভিড় জমান। বিশেষ করে বাণিজ্যিক অফিস-আদালত এলাকায় স্বল্প আয়ের মানুষের অন্যতম ভরসা এসব খাবার। তবে বিভিন্ন এলাকায় বৈকালিক আড্ডা জমছে এখন রাস্তার খাবারের ভ্যানকে কেন্দ্র করে। সাশ্রয়ী দামে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা মানুষ এসব খাবার খাচ্ছেন।

এইসব খাদ্য বিক্রয় হয় মূলত খাদ্য কতটা মুখরোচক, দোকানের ডেকোরেশন কতটা ভালো তার উপর ভিত্তি করে। সাধারণ গ্রাহক বা ক্রেতারা খাদ্যের গুণগত মান, এর পুষ্টিগুণ ইত্যাদি খুব একটা দেখেন না।

বিশ্বের অনেক দেশে রাস্তার খাবারের ভূমিকা রয়েছে। দাম কম হওয়ার কারণে দেশি বিদেশি সকলেই রকমারি খাবারের স্বাদ নিতে রাস্তার খাবার বেছে নেন। থাইল্যান্ডের ব্যাংকক, ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটি থেকে শুরু করে ভারতের মুম্বাই ও কলকাতা, জাপানের টোকিও, মরক্কোর মারাকেশ, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামি, মিসরের কায়রো, ইন্দোনেশিয়ার বালি সব জায়গার রাস্তার খাবার সবার কাছেই অন্যতম আকর্ষণের বিষয়।

দিন দিন রাস্তার খাবারের চাহিদা বাড়ছে আর মান কমছে। বাংলাদেশে এর চিত্রটি খুব ভালো না। এসব খাবারে যে পানি ব্যবহার করা হয়, সেটা সবচেয়ে ভয়াবহ। বিপুলসংখ্যক মানুষ এই খাবার খেলেও এটি নিয়ে মাথাব্যথা কম । এইসব খাদ্যের কারণে মানুষের রোগ বালাই ও চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, রাস্তার খাবারে দূষণ ঘটে মূলত পানি থেকে। পানি থেকেই ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে খাদ্যশৃংখলে । খাবার তৈরি, পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত পাত্র এবং আশপাশের ধুলাবালি থেকেও ব্যাকটেরিয়া খাবারে যায়।

যায় বিক্রেতার হাত থেকেও। অনেকে বলেন খাবার তৈরি হয় বিশুদ্ধ পানিতে কিন্তু পরিবেশন পাত্র পরিষ্কার করতে কি মিনারেল পানি ব্যবহৃত হয়? এই অনিরাপদ পানির ব্যবহার খাবারকে দুষিত করে ফেলে। বিক্রেতার নোংরা হাত, গামছা, প্লেট ও কাগজেও জীবাণু থাকে। মাছি বা অন্যান্য কীটপতঙ্গের কারণেও দূষণ ঘটে। বিক্রেতা বারবার টাকা ধরার কারণেও জীবাণু ছড়ায়। রাস্তার খাবার যাঁরা বিক্রি করেন, তাঁদের বসার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। ধুলাবালি, রোগজীবাণু সহজেই খাবারে মিশে যাচ্ছে।

সেদিন গিয়েছিলাম এক বিয়ের অনুষ্ঠানে নামকরা এক কনভেনশন হলে। সেখানে দেখলাম নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের A মার্ক করা স্টিকার। বোঝা গেলো এই কনভেশন হলটি নিরাপদতার অনেকগুলো মান অর্জন করেছে। ঘুরে এলাম তাদের কিচেন, ওয়াশরুম। বেশ পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্থ। ভালোই লাগল এই দৃষ্টিতে যে অন্তত এই কনভেনশন হলে মানুষ নিরাপদ খাবার পাবে। যদিও বলা হয় বাইরের খাদ্যের মধ্যে রান্না করা খাদ্য সবচেয়ে নিরাপদ।

কিন্তু আরও কত হোটেলে তো যাই নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের স্টিকার তো সবখানে দেখা যায় না! উচ্চ মধ্যবিত্ত বা বিত্তবানদের হোটেল রেস্টুরেন্ট নিরাপদ হলে তো আর নিরাপদতার মান নিশ্চিত হবে না। সাধারণ মানুষ যেখানে বেশি যায় সেদিকের দিকেও সমান দৃষ্টি দিতে হবে। পেশাগত কারণেই রাস্তাঘাটের অনেক দোকানে খেতে হয়, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৃষ্টি থাকে খাদ্যটি নিরাপদ কিনা, কিন্তু তারপরও কখনও কখনও ভুল হয়ে যায়, অনেকবার খাদ্য দুষণের শিকার হয়েছি।

আমাদের এক বন্ধু ছিলেন সম্প্রতি গত হয়েছেন। ট্যুর এর সময় তিনি রাস্তায় নানা জিনিস খেতেন, কদবেল, সশা, ফুচকা ইত্যাদি আর প্রতিবারই তিনি ফুড পয়জনিং এ আক্রান্ত হতেন। আমরা তাঁকে সাবধান করলেও মানতেন না। তার সঙ্গী ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশন এর একজন প্রযোজক। শুধু তাদের জন্য আমাদের ব্যাগে ওরস্যালাইন রাখতে হত। আমার আত্মীয় পরিজনও এমন ভুল প্রতিনিয়ত করেন। অনেকবারই তারাও বিপদে পড়েন। কিন্তু তারাও কথা শোনেন না। বাঁধা দিলে রাগ করেন, কেউ কেউ ব্যঙ্গ করে বলেন আপনি মনে হয় পানিও ধুয়ে খান। যদি কেউ আসক্ত হয়ে পড়েন তাঁকে সঠিক পরামর্শ দিয়ে লাভ নেই । আসলে জিভের মতো বড় শত্রু আর কেউ নাই। যা খুশি খেতেও যেমন ছাড়ি না, যা খুশি বলতেও ছাড়ি না।

আমরা যারা নিরাপদ খাদ্য নিয়ে কথা বলি তারা বেশির ভাগ কথা বলি উৎপাদন বিষয়ে। খাদ্য প্রস্তুত, প্রক্রিয়াজাতকরণ নিয়ে কথা কম হয়। আবার বড় বড় শিল্প নিয়েও কথা কম হয় না, কিন্তু বাদ পরে যায় স্ট্রিট ফুড, হোটেল রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি নিয়ে। প্রতিষ্ঠিত হোটেল রেস্টুরেন্টকে অনেক সময় আইনের আওতায় আনা যায় কিন্তু স্ট্রিট ফুড ব্যবসায়ীকে এর আওতায় আনবেন কিভাবে?

বর্তমানে যার যেমন ইচ্ছা খাবারের দোকান খুলে বসছেন, কেউ অনলাইনে আবার কেউ ফুটপাথ, রাস্তার পাশে, যেখানে সেখানে। সেদিন দেখলাম এক ব্যক্তি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পিঁয়াজু খাচ্ছেন, টিসু পেপার দিয়ে ধরে। নিজের হাতের কোন স্পর্শ যাতে কোনভাবেই না লাগে সেদিকে সচেতন দৃষ্টি। কিন্তু ওদিকে পিঁয়াজু বিক্রেতা যে হাতে টাকা নিচ্ছেন সেই হাতেই আবার পণ্য দিচ্ছেন। টাকার মাধ্যমে যে ক্ষতিকর অনুজীব ওই খাদ্যে আসতে পরে তা বিক্রেতা বা খদ্দের কেউ ভেবে দেখছেন না। রেস্টুরেন্টে নিজের গ্লাস বা প্লেট নতুন করে ধুচ্ছেন, কিন্তু যে পানি ব্যবহার করে ধুচ্ছেন সেটি কি নিরাপদ? খাবার সময় হাত ধুচ্ছেন শতভাগ মানুষ। কিন্তু কোন পানি দিয়ে ধুচ্ছেন সেটি কয়জন দেখছেন?

খাদ্য নিয়ে ব্যবসা একটি সংবেদনশীল কাজ। এর সাথে জড়িত পুষ্টি ও শরীর গঠনের নানা বিষয়। ব্যবসায়ীগণ স্বাদ তৈরির জন্য যত মনোযোগী, এর পুষ্টিমান নিয়ে ততটা নন। খাদ্য নিয়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বড় বড় দোকান গড়ে তুলতে লাইসেন্স লাগে, কিন্তু অনলাইন ব্যবসায়, রাস্তার দোকান এগুলোর জন্য কোন নিয়ম কানুন নাই। যে কোনো রাস্তার পাশে খাদ্যের দোকান আর ওষুধের দোকানের কোন অভাব নেই। ওষুধের দোকানে গিয়ে দেখবেন সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে গ্যাস এর ওষুধ।

এসব কারণে গণহারে খাদ্য ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করা ঠিক না। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে এ নিয়ে ভাবতে হবে। বিশেষ করে যারা খাদ্য বিক্রি করবেন তাদের হ্যান্ডলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দরকার। হাতে গ্লোভস, নাকে মাস্ক, খবরের কাগজ ব্যবহার না করা, পানি ব্যবহারে সতর্কতা, পাত্র পরিষ্কার করতে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহারসহ খুঁটিনাটি সব দিকেই সচেতনতা তৈরি দরকার। রান্না করা খাদ্য বলুন, বা ফল, জুস, শরবত বিক্রয় বলুন সব ক্ষেত্রে বিধিমালা তৈরি করে তা প্রয়োগ করা দরকার। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, এই সব বিধিমালা কেবল শাস্তি প্রদানের জন্য নয়, এগুলো করা দরকার তৃণমুলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।

আমরা জানি যারা বড় বড় খাবারের দোকান বা চেন খুলে বসেন, তাদের অনেক টাকা, তারা নিজের বিনিয়োগ নিরাপদ রাখতে সঠিক পন্থা অনুসরণ করবেন এটাই প্রত্যাশা। যদিও অনেকে এখানেও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন। কিন্তু রাস্তার পাশের বিক্রেতারা অনেকেই নিরাপদতার সাধারণ নিয়মটাই জানেন না। আবার এখানেই সবচেয়ে বেশি ব্যবসায়ী আর বেশি খদ্দের সম্পৃক্ত। আর সে কারণেই পথে ঘাটের খাদ্য নিয়ে অধিকতর মনযোগ নিরাপদ খাদ্য পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়ন ঘটাবে তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

———— 0 ————

নিরাপদ মাংসের প্রাপ্যতা ও ভোগে করণীয়

মো. কাওছারুল ইসলাম সিকদার
উপসচিব
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

আমিষ জাতীয় খাবার বলতে আমরা মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও ডাল জাতীয় খাবারকেই বুঝি। এদেশে একসময় প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন মাছের প্রাচুর্য থাকলেও কখনই মাংসের প্রাচুর্যতা ছিল না। বিশেষ করে রেড মিট বা লাল মাংস (গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া) এদেশের মানুষেরা কালে-ভদ্রে খেতো। মেহমান বা অতিথি আপ্যায়নে হোয়াইট মিট বা সাদা মাংস (মুরগী, হাঁস, কবুতর) পরিবেশন করা হতো। রেড মিট সাধারণত কোরবানি ঈদ, বিবাহ অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়। তাই বছরের বিশেষ কয়েকটি দিন ব্যতীত লাল মাংস খুব কম মানুষই ভোগ করতে পারত। তার কারণ হলো এদেশের গরুর জাত ছোট আকারের, এগুলোর মাংস উৎপাদন ক্ষমতাও কম। অধিকাংশ পশুই এক থেকে দুই মণ ওজনের হতো। প্রধানত হাল চাষের প্রয়োজনে পশু পালন করা হতো, তাই একান্ত প্রয়োজন না হলে কেউ জবাই করত না। তবে কখনো কোন প্রাণী অসুস্থ বা বয়স্ক হয়ে পড়লে তখন তা জবাই করে গ্রামবাসী ভাগ করে নিত। এদেশের আবহাওয়াও পশু পালনের জন্য খুব একটা অনুকূল ছিল না। কারণ বছরের অধিকাংশ সময় দেশ জলমগ্ন থাকত। পর্যাপ্ত পশুর খাবার মিলত না। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পশুর অসুখ বিশুখ লেগেই থাকত। ছিল না পশুর জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ডাক্তার, তাই মরকে প্রতিবছর গৃহস্থের গোয়াল থেকে পশু হারিয়ে যেতো। কৃষক হয়ে পরত নিঃস্ব। এ অবস্থায় পশুর মাংস খাওয়া তো দূরের কথা চাষাবাদের প্রয়োজনে ষাড় কিংবা বলদ পাওয়া যেত না। সেকারণে চাষাবাদে গাভীকেও ব্যবহার করতে হতো। অনেক সময় এ সংকট মোকাবেলায় কৃষকেরা একে অপরের পশু নিয়ে সম্মিলিতভাবে চাষাবাদ করতে বাধ্য হত।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে মাংসের চাহিদা দ্রুত বাড়তে থাকে। সরকার পশু পালনকে উৎসাহিত করার জন্য স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদান করে। ফলে দেশে পশু পালন ও মাংসের ভোগ বাড়তে থাকে। দেশে পশু খামারের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে গরুর মাংসের চাহিদা না থাকায় বাংলাদেশে এর প্রাপ্যতা একসময় সহজলভ্য ছিল। ভারতের সাথে বাংলাদেশের প্রায় তিন দিকেই সীমান্ত। একসময় সীমান্তের প্রায় পুরোটাই অরক্ষিত ছিল। সেকারণে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রকারে সারা বছর দেশে গরু প্রবেশ করত। বিশেষ করে কোরবানির সময় গরুর আমদানি ছিল লক্ষণীয়। ভারতের হিন্দুদের কাছে ধর্মীয়ভাবে গরুর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হওয়ায় বাংলাদেশই ছিল তাদের অনুৎপাদনশীল গরু রপ্তানীর প্রধানক্ষেত্রে। পরবর্তীতে নিকট অতীতে ভারত হতে বাংলাদেশে গরু রপ্তানী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সে প্রেক্ষাপটে দেশে সংকর জাতের গরু পালন বাড়তে থাকে। দেশের সর্বত্র গবাদি পশু খামার গড়ে উঠে। বিদেশ হতে উন্নত জাতের পশু ও পশুখাদ্য আমদানি শুরু হয়। দেশে পশুখাদ্যের মিল গড়ে উঠে। পশু খামার জনপ্রিয় ও লাভজনক হওয়ায় দেশেই কোরবানীর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গরুর যোগান মিলে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বেশ উন্নত জাতের গরু থাকলেও বাংলাদেশে সেগুলো রপ্তানী হতো না। তাদের রক্ষণশীল নীতির কারণে দুর্বল ও বয়স্ক গরুই শুধুমাত্র এদেশে প্রবেশ করত। ভারতের উন্নত জাতের গরুর সাথে দেশীয় দুর্বল জাতের গরুর মিশ্রণ হয়নি। সেকারণে দেশে দীর্ঘকাল গরুর ভালো জাত তৈরী হয়নি। কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা এবং সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন দেশ হতে আমদানিকৃত উন্নত পশুর মাধ্যমেই মূলত এদেশে উন্নত সংকর জাতের গরুর প্রচলন ঘটে।

শহরাঞ্চলের মানুষেরাই গরুর মাংস বেশী ভোগ করে। শহরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষের আয় ও আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে গ্রামের তুলনায় ভোগ বেশি। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা, জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধিও কারণে পশুখাদ্য আমদানি মূল্য ও পরিবহন খরচ বেড়ে যায়। বেড়ে যায় ঔষধের মূল্য। দেশে গরু খামারে প্রয়োজনীয় শ্রমিকে অপ্রাপ্যতা ও উচ্চ মজুরীর কারণেও পালন অলাভজনক হয়ে পড়ছে। তাই কমছে মাংস উৎপাদনের উর্ধ্বমুখী গতিধারা, বাড়ছে দাম যা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রেতাদের নাগালের বাহিরে। করোনা

মহামারি, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ, দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির গতিধারায় অল্প-স্বল্প সংখ্যক মানুষের নিকট অর্থ চলে যাওয়ায় খুব দ্রুত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। মধ্যবিত্ত ও গরিব শ্রেণীর অনেকের আর্থিক সামর্থ হ্রাস পেয়েছে। আর্থিক সক্ষমতার বিচারে বলা চলে দেশে সার্বিকভাবে লাল মাংস ভোগের প্রবণতা কমে আসছে। অথচ শরীরগঠন, প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টের জন্য মাংসের বিকল্প নেই। মাংস তথা আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাবে দৈহিক গঠন ও উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে। উন্নত দেশ ও জাতি গঠন বাধাগ্রস্থ হবে। তাই অর্থনৈতিক স্বার্থেই পশুপালন এবং মাংস উৎপাদনে সরকারি প্রণোদনা বৃদ্ধি করতে হবে।

বর্তমানে নিরাপদ মাংস উৎপাদনে বহুবিধ সমস্যার বিদ্যমান। এই সমস্যা মাত্রাগত ও কালবর উভয় প্রকারেই বাড়ছে। তাই উৎপাদন পর্যায় হতে শুরু করে ভোগ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশী হওয়ায় খাদ্যচাহিদা বাড়ছে এবং সর্বত্র কৃষি কাজ হচ্ছে। তাই গরুর চারণক্ষেত্র দিন দিন কমছে। পশুর জন্য চারণভূমি নেই বললেই চলে। দেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ইত্যাদি শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে গেলে সেখানে পশু চড়ানো হতো। সেটিও দিন দিন কমছে অথচ উন্নত দেশ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এসকল দেশের পশুরা সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে এবং প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ঘাস খেয়ে বড় হতে থাকে। তাই এসকল দেশের পশুর মাংসের স্বাদ ভাল, চাহিদা বেশী। অথচ বাংলাদেশে ঘাসের অপর্যাপ্ততার কারণে কৃত্রিম উপায়ে পশুখাদ্য তৈরী করে তা পশুকে খাওয়ানো হচ্ছে। যার কারণে মাংসের গুণগত মান ও স্বাদ প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছে না। এজন্য উন্নত চারণভূমির তৈরীর প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে, যাতে নিরাপদ মাংস তৈরী হয় এবং মাংসে চর্বির পরিমান কম থাকে। উন্নত মানের মাংস পেতে হলে পশুর জন্য বিস্তৃর্ণ চারণভূমি তৈরী করে উন্নত প্রোটিনসমৃদ্ধ ঘাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য যে সকল চরে এখনো মানব বসতি গড়ে উঠেনি সেখানে চারণভূমি তৈরী করে পশু পালনের ব্যবস্থা নিতে হবে। তবেই সুস্বাধু, পুষ্টিকর, কম চর্বিযুক্ত মাংস উৎপন্ন সম্ভব হবে।

পশুখাদ্যের উচ্চ মূল্য পশুপালনকে অলাভজনক করে তুলছে। গরু একটি তৃণভোজী প্রাণী বলা হলেও অধিক মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য একে উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ কনসেনট্রেট খাদ্য প্রদান করা হয়। এই খাদ্যের বেশীরভাগ আমদানিকৃত এবং পশুখাদ্য মিলে অন্যান্য খাদ্য উপকরণ আনুপাতিক হারে মিশিয়ে পশুখাদ্য তৈরী করা হয়। দেশীয় জাতের ছোট গরুর জন্য তেমন খাদ্যের প্রয়োজন হতো না। প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ঘাস খেয়েই বড় হতো। কিন্তু বর্তমানে যে উন্নত জাতের গরুর পালন হচ্ছে, তার জন্য চাই অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ উন্নত জাতের ঘাস ও অন্যান্য খাদ্য। উচ্চ মূল্যের কারণে যা সংগ্রহ করা সাধারণ কৃষক বা খামারীর জন্য দুঃসাধ্য। জীবাশ্ম জ্বালানির উর্ধ্বমূল্যের কারণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবহনে খরচ বেড়ে গেছে। সেইসাথে বিদ্যুতের উপর সরকারের ভর্তুকি হ্রাসে প্রতিনিয়ত বিদ্যুতের দাম বাড়ছে। এতে খামারের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ এবং মাংস সংরক্ষণ খরচ বাড়ছে। নিরাপদ ও টেকসই মাংস উৎপাদনে পশুখামার লাভজনক পর্যায়ে রাখতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

পরিবেশ দূষণের কারণে নিরাপদ পশু খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে সীমিত হয়ে আসছে। দেশের প্রায় সর্বত্রই কলকারখানার বর্জ্য দ্বারা মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত হয়ে পড়ছে। সার্বিকভাবে দেশে প্রাকৃতিক পানির প্রবাহ ও বর্ষার স্থায়ীত্ব কমছে। উজান হতে পানির প্রাপ্যতা কমে যাওয়ায় বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে। এতে করে মানবসৃষ্ট ও কলকারখানায় তৈরি বর্জ্যে মাটি পানি ও বাতাস দ্রুত দূষিত হয়ে পড়ছে। দূষিত স্থানে উৎপন্ন ঘাস খাদ্য হিসেবে গ্রহণের কারনে পশুর খাদ্যও অনিরাপদ হচ্ছে। আর অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের কারণে পশুর মাংসও অনিরাপদ হয়ে পড়ছে। যা মানব দেহে দীর্ঘ মেয়াদে বিভিন্ন প্রকারের জটিল রোগ তৈরী করছে। দেশে পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দূর্বলতায় সর্বত্র পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। যত্রতত্র পশু জবাইয়ের কারণে পশুর রক্ত, মলমূত্র, হাড় ও চামড়া প্রভৃতি আশপাশের মানববসতি, ক্ষেত-খামার ও নদী নালায় ছড়িয়ে পড়ছে। রক্তের মাধ্যমে দ্রুত জীবাণুর বিস্তার ও পশু মলমূত্র অন্যান্য উপকরণ মাটি, পানি ও বায়ুকে দূষিত করছে। যা জনস্বাস্থের জন্য হুমকি। সেইসাথে শস্য, মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণীর জন্যও বিষাক্ত পরিবেশ তৈরী করছে। তাই পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত ও আধুনিক করতে হবে যাতে পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা পায়। নিরাপদ কৃষি ও পশু পালনের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য পৃথক কৃষি অঞ্চল গঠন জরুরি। যেখানে পরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পায়ন ও কৃষির ব্যবস্থা থাকবে।

প্রাণীর কল্যাণে উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। দেশের প্রাণী পালনের জন্য যে উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন তা অনেকাংশেই রক্ষা করা সম্ভব হয় না। যে দেশের মানুষের নিজেদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই, সেখানে পশুদের জন্য উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করা দূরহ বটে। উন্নত জাতের পশু পালনে উন্নত বাসস্থান, পরিচ্ছন্নতা, নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা, আলো, বাতাস, খাদ্য প্রয়োজন। সেইসাথে প্রয়োজন উন্নত পরিবহন, চিকিৎসা, বিশুদ্ধ বাতাস, পানি ও নিরাপদ খাদ্য। এগুলো সংস্কার করা সম্ভব না হলে নিরাপদ মাংস ও দুধ উৎপাদন সম্ভব হবে না।

গরুর সুস্বাস্থ নিশ্চিতে যথাযথ ঔষধ নির্বাচন ও ডাক্তারি পরামর্শ গ্রহণ জরুরি। এদেশের অনেক পশু পালনকারী ও খামারি নিজ ইচ্ছেমত অনিরাপদ ঔষধ নির্বাচন করে পশুকে খাওয়াচ্ছে। চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিত পশুকে অনিরাপদ ঔষধ প্রদানের কারণে পশুর

স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। নিরাপদ মাংস ও দুধ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। তাই স্বীকৃত পশু ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ব্যতীত ঔষধ বিক্রয় বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কসাইদের প্রশিক্ষণ নেই। তারা খাদ্য নিরাপদ রাখার বিষয়ে সচেতন নয়। দেশে গরু পালনেও বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সম্পন্ন কর্মঠ শ্রমিকের ঘাটতি প্রকট হচ্ছে। বর্তমান প্রজন্ম এ ধরনের কাজে খুব একটা পারদর্শী নয়। তাই খামারে উপর্যুক্ত জনবলের অভাব প্রকট হচ্ছে। মাংস যে একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য সে ব্যাপারে কসাইরা মোটেই সচেতন নয়। ব্যক্তিগতভাবেও তারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে, অপরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান ও অপরিচ্ছন্ন অনিরাপদ উপকরণ ব্যবহার করে। তাই তাদেরকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে যেমনি অবহিত করা প্রয়োজন তেমনি নিরাপদ মাংস ভোক্তার নিকট সরবরাহে যে সকল বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এছাড়া নিরাপদ মাংস ভোক্তার নিকট পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

দেশে সরকারিভাবে অদ্যাবধি আধুনিক কসাইখানা তৈরী হয়নি। যার কারণে দেশের সর্বত্র প্রচলিত পদ্ধতিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনিরাপদ উপকরণ দিয়ে পশু জবাই হচ্ছে। দেশে যত পশু জবাই ও বিক্রয় হয় তার ৯৫% অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রচলিত পদ্ধতিতে জবাই হয়। মাত্র ৫% পশু নিরাপদতার দিকসমূহ বিবেচনা করে বেসরকারিভাবে নির্মিত উন্নত কসাইখানায় জবাই হয়। মাংস অতি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য বিধায় তা দ্রুত জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। অথচ পশু জবাইয়ের পর অনিরাপদ পানি, উপকরন ও পরিবহন ব্যবহার হচ্ছে। মাংস অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে, খোলা অবস্থায়, উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় সারাদিন দোকানে ঝুলিয়ে বিক্রি হচ্ছে। অথচ মাংসের নিরাপদতা রক্ষায় পরীক্ষাপূর্বক সুস্থ সবল পশু জবাই, পশু জবাইয়ের পর ডাক্তার দিয়ে পুনরায় পরীক্ষা এবং জীবাণুমুক্ত উপকরণ দিয়ে মাংস কাটা, নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিক্রয় করা প্রয়োজন। যেটি সচরাচর আমাদের দেশে দেখা যায় না। যেহেতু পশুপালন হতে শুরু করে মাংস ভোগ পর্যন্ত যে কোনো সময়ে, যে কোনো পর্যায়ে মাংসে ভৌত, রসায়ন বা জৈবিক দূষণ ঘটতে পারে তাই উন্নত কসাইখানা ও ডাক্তারি পরীক্ষা ভিন্ন যে পশু জবাই হয় তার নিরাপদতার নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব নয়। তাই দেশের সকল শহর, নগরে উন্নত কসাইখানা নির্মাণসহ উন্নত শীতল পরিবহন ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে মাংস বিপনন নিশ্চিত করতে হবে।

পশুবিপণন একটি বড় সমস্যা। পশু খামারিরা পশু পালন করে মূলত কোরবানি ইদে বিক্রয়ের জন্য। বছরের অন্যান্য সময়ে কসাইদের নিকট পশু বিক্রয়ে উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় না। কোরবানি ইদে চাহিদা বেশী থাকে তাই একসাথে অনেক পশু বিক্রয় করা যায় এবং দামও ভাল পাওয়া যায়। কিন্তু পশু হাটে পৌঁছাতে স্থানীয় প্রভাশালী চক্র, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হস্তক্ষেপ, উচ্চ পরিবহন খরচ ও পশুর হাটের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অবকাঠামোর অভাবের কারণে পশু খামারিদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বর্তমানে অনেক খামারে বেশ বড় জাতের পশু লালন-পালন করা হচ্ছে। এ সকল পশুর ক্রেতা সাধারণত উচ্চবিত্ত শ্রেণির, যারা অনলাইনে পশু ক্রয় করে। এরা সাধারণত পশুর হাটে এসে পশু ক্রয় করেন না। এর কারণ একদিকে নিজেদেরকে সাধারণ জনগণের অলক্ষ্যে রাখা, অপরদিকে বিক্রেতার আর্থিক দিকটিও অপ্রকাশিত রাখা। যে সকল খামারিরা অনলাইনে কোরবানির পশু বিক্রয়ের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয় এবং পশু হাটে পশু বিক্রয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তারা অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতা খুঁজে পায় না। পরবর্তী বছর পর্যন্ত পশু পালনের ঝুঁকি এড়াতে খামারীরা লোকসানে পশু বিক্রয় করে। এ সকল কারণে উচ্চ জাতের গরুর পালন তথা মাংস উৎপাদন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে। অপরদিকে বাজারে মাংসের নিম্ন যোগান ও উচ্চ চাহিদার ভারসাম্যহীনতায় মাংসের দাম বাড়ছে। যা টেকসই পশুপালন এবং নিরাপদ মাংস উৎপাদনকে ব্যাহত করে।

দেশে উচ্চ গুণগত মান সম্পন্ন নিরাপদ মাংসের ক্রেতা কম। এর কারণ মূলত উচ্চ মূল্য। এমনিতেই দেশে মাংসের দাম আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের তুলনায় বেশী। যারা নিরাপদ মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের সাথে সম্পৃক্ত তাদের মাংসের দাম খোলা বাজারের মাংসের দামের তুলনায় আরো বেশী। নিরাপদ মাংস আন্তর্জাতিক বাজারের দামের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। স্বনামধন্য ও নামি দামি হোটেল রেস্তোরাঁর ব্যবস্থাপকরাও উচ্চ মূল্যের কারণে নিরাপদ মাংস ক্রয়ে অনীহা প্রকাশ করে। নিরাপদ মাংস দ্বারা তৈরী খাবারের মূল্য স্বভাবতই উচ্চ হবে। আর উচ্চ মূল্যে খাদ্য গ্রহণে ক্রেতা সাধারণের অনীহা তথা গ্রাহকের চাহিদার ঘাটতি থাকায় প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে ব্যবসায়িরা ঝুঁকি নিতে চান না। তাই অধিকাংশ হোটেল রেস্তোরাঁ নিরাপদ মাংসে খাবার তৈরীও বিক্রয় করে না। সেকারণেই দেশে বেসরকারি পর্যায়ে আধুনিক কসাইখানা ও খামার ব্যবস্থা প্রসার লাভ ঘটছে না। মূলত সরকারি নির্দেশনা এবং বাধ্যকতার অভাবে দেশে নিরাপদ মাংস ব্যবস্থপনা অধ্যাবধি গড়ে উঠেনি। তাই নিরাপদ মাংস উৎপাদনে প্রয়োজন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং আইনি পদক্ষেপ।

দেশে ফ্রিজিং করা লাল মাংস আমদানি করা হচ্ছে। এসকল মাংসের অধিকাংশই সাধারণ ও নিম্নমানের হোটেল রেস্তোঁরায় কম দামে সরবরাহ করা হয়। এই মাংসের বেশীরভাগই মহিষের, যদিও হোটেল রেস্তোঁরায় গরুর মাংস বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অবকাঠামোগত দূর্বলতার জন্য আমদানিকৃত মাংস পরিবহন, সংরক্ষণ, বিপণন ও রান্না পর্যন্ত (Cool chain) শীতলীকরণ ব্যবস্থা

সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সেইসাথে বিদ্যুতের ঘাটতি ও এর উচ্চমূল্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করার অন্যতম কারণ। এই মাংস ভোক্তার নিকট যখন পৌঁছে তখন সেটি অনেকাংশে আর নিরাপদ থাকছে না। তাই প্রায়শই পত্র পত্রিকায় পঁচা, দুর্গন্ধযুক্ত মাংসের অভিযোগ লক্ষ করা যায়। নিম্নমূল্যের মাংসের চাহিদার কারনে আমদানিকারকগণও যথাযথ গুণগত মানের মাংস আমদানি ও সরবরাহ করছে না। সেইসাথে জনসাধারণে অসচেতনতা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নজরদারির অভাব এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে দেশে নিরাপদ মাংস আমদানি ও বিপণন হচ্ছে না। নিরাপদ মাংস সরবরাহ ও বিপণনে হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকল মাংস আমদানিকারকদের অধিকতর স্বচ্ছতা অবলম্বন করা উচিত। যাতে ভোক্তা সাধারণ কোন ধরনের মাংস খাচ্ছে তা অবহিত হতে পারে। সেই সাথে মাংস বিপণন ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির পরিবহন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তবেই নিরাপদ মাংস ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটবে।

মাংস যাতে অনিরাপদ না হয় সেজন্য জবাইয়ের পূর্বে ও পরে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি:

- জবাইয়ের পূর্বে গরুর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে নিতে হবে এবং নিরোগ শরীরের পশু জবাই করতে হবে। লক্ষ্য করতে হবে যেন পশুটির স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস চলে, শরীরের তাপমাত্রা যথাযথ থাকে এবং মুখ থেকে কোনরুপ অনাকাঙ্খিত ফেনা বের না হয়।
- পশুটিকে জবাই করার ১২-২৪ ঘন্টা পূর্ব হতে খাবার প্রদান বন্ধ রাখতে হবে তবে পর্যাপ্ত পানি পান করাতে হবে।
- পশুটিকে যত্নসহকারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিচর্যা করতে হবে, পশুটিকে বিরক্ত করা যাবে না।
- দ্রুত ও ধারালো ছুরি দিয়ে জবাই করতে হবে। জবাইকালে শরীরে কোন রকম জখম যেন না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত পরিবেশে জবাই করতে হবে ও মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণে নিরাপদ ছুরি ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করতে হবে এবং যতটা সম্ভব হাতের স্পর্শ পরিহার করতে হবে।
- মাংস কাটার পর দ্রুত সংরক্ষণে ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করে সংরক্ষণ বা -১৮º C এর ফ্রিজিং করে দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণে ব্যবস্থাগ্রহণ।
- মাংস একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবাণুমুক্ত পরিবেশে নিম্ন তাপমাত্রায় (ফ্রিজিং ভেন) পরিবহন করতে হবে।
- যারা মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বিপণনে জড়িত তাদের হাতে গ্লাভস, মাথায় ক্যাপ, শরীরে পরিচ্ছন্ন এপ্রোন পরিধান করতে হবে।
- মাংস ধরার পূর্বে ও পরে ভালোভাবে নিরাপদ জীবাণুমুক্ত পানিতে তরল সাবান দ্বারা হাত ধুয়ে নিতে হবে।
- মাংস ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যবহৃত আংটি, চেইন বা অন্য কোন অলংকার থাকলে তা খুলে কাজ করতে হবে। যাতে গণনার মাধ্যমে মাংসে ভৌত, রাসায়নিক ও জীবানু সংক্রমন না ঘটে।
- বিপণনে মাংস ১০º C এর নিম্নে রাখতে হবে।
- কোন রকম রাসায়নিক উপকরণ বা সংরক্ষক (Preservative) ব্যবহার করা যাবে না।
- বিপণনের স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উচ্চ সূর্যালোকমুক্ত, ধুলাবালিহীন ও বৃষ্টি ও বাতাস হতে মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে মাংসের গুণগত মান ক্ষুণ্ন না হয়।
- মাংসকে অবশ্যই তরল বর্জ্য, পশু পাখি ও কীটপতঙ্গ হতে মুক্ত রাখতে হবে।
- বিক্রিত মাংস খাদ্যমান সম্পন্ন কাগজ বা পাত্রে নিয়ে বিক্রয় করতে হবে। যাতে মাংসে কোন রকম দূষণ না ঘটে। মাংসে কোন ক্রমেই খবরের কাগজ বা ছাপানো কাগজ ব্যবহার করা যাবে না।
- মাংস সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ ও ডাস্টবিন নিয়মিত জীবাণুমুক্ত উপাদান দিয়ে পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

———— ০ ————

নিরাপদ খাদ্য, স্মার্ট বাংলাদেশ ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

ড. খালেদা ইসলাম
পরিচালক
পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ শিহাব উদ্দীন
নিরাপদ খাদ্য অফিসার
জেলা- নিলফামারী, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

সাধারণত যেসব আহার্য উপাদান জীবদেহের বৃদ্ধি, শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ এবং ক্ষয়পূরণ করে তাকে খাদ্য বলে। 'নিরাপদ খাদ্য আইন,২০১৩' অনুসারে খাদ্য বলতে যা কিছু চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য বা পেয়সহ সকল প্রকার প্রক্রিয়াজাত,আংশিক-প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত আহার্য উৎপাদন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বা প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত উপকরণ বা কাঁচামাল ও যা মানবদেহের জন্য উপকারী আহার্য হিসাবে জীবনধারণ, পুষ্টিসাধন ও স্বাস্থ্যরক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় তাকেই বুঝায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণ আবশ্যক। ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২৫/১ ধারায় প্রত্যেক মানুষের খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। তবে সেই খাদ্য অবশ্যই নিরাপদ এবং ভেজালমুক্ত হতে হবে। প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য হলো নিরাপদ খাদ্য আর খাদ্যকে ভেজাল ও দুষণমুক্ত করে স্বাভাবিকভাবে বিতরণ নিশ্চিত করাই হচ্ছে খাদ্যের নিরাপদতা। নিরাপদ খাদ্যের অন্যতম শর্ত হচ্ছে পুষ্টিগুণ ঠিক রাখা, পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপদতা নিশ্চিত করা এবং খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণে সকল ধরনের নিয়ম বা আইন মেনে চলা।

প্রায় ১৮ কোটি মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মোটামুটি সক্ষমতা অর্জন করলেও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। দেশের লাখ লাখ মানুষ প্রতিনিয়ত রাস্তাঘাট, ফুটপাত, লঞ্চ স্টিমার, বাসস্ট্যান্ড, হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবার খেয়ে থাকে। মুখরোচক এইসব খাবারের মান নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন ওঠে। কারণ, ভোক্তারা এসব খাবার খেয়ে নানাভাবে অসুস্থ ও স্বাস্থ্য-সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এসব খাদ্যসামগ্রীতে মেশানো হচ্ছে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর রং ও রাসায়নিক উপাদান। এসব রাস্তা বা ফুটপাতে যেসব খাবার তৈরি ও বিক্রি হয়, তা কতটা স্বাস্থ্যসম্মত তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। রাস্তার পাশে খোলা স্থানে তৈরী করা এসব খাদ্যসামগ্রীতে দূষিত পানি ও ভোজ্যতেলের একাধিকবার ব্যবহার এবং পরিমাণের চেয়ে বেশি রং অথবা রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি। বাতাসে ধুলা-বালি, গাড়ির কালো ধোঁয়া, অপরিচ্ছন্ন হাত ও পরিধেয় বস্ত্র থেকে জীবাণু সংক্রমণ হয়ে খাদ্য অনিরাপদ হয়। অন্যদিকে শহর এবং গ্রামে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত খামারে মাছ অথবা হাঁস-মুরগি কিংবা ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিষাক্ত বর্জ্যের ব্যবহার অহরহ। কম মূল্যে এসব রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে খাদ্যের উৎসই অনিরাপদ হয়ে উঠছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের বিকল্প নেই এটি জানার পরও একই সমাজে বাস করে জেনে বুঝেই শুধু আর্থিক লাভের আশায় একে অপরকে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলছি। অনিরাপদ খাদ্যগ্রহণের ফলে মানুষের শরীরে পেটের পীড়া, ডায়রিয়া, বমি, জ্বর, আমাশয়, টাইফয়েডসহ নানা ধরনের অসুস্থতা দেখা দেয়। ফলে একটি পরিবারের আয়ের একটি বড় অংশ চিকিৎসার জন্য খরচ করতে হয় যেটি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য কষ্টকর। ফলে সংসারের খরচের উপর চাপ বেড়ে যায়। একটি জরিপ থেকে জানা গেছে, অনিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমে প্রায় ২০০ প্রকার রোগ বিস্তার লাভ করে এবং দূষিত খাদ্য গ্রহণ করে বছরে প্রতি ১০ জনে ১ জন মানুষ অসুস্থ হয়। ফলশ্রুতিতে, সারা বছর বিশ্বে প্রায় ৪ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে প্রণীত হয় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩। এই আইন বাস্তবায়নে ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সালে "জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য" রূপকল্পকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৩টি বিধিমালা এবং ৮টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করেছে। নাগরিক সচেতনতায় নিরাপদ খাদ্য আইন প্রণীত হওয়ার পর থেকে প্রচারণা, মনিটরিং, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, খাদ্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবসায়ী ও ভোক্তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। তবে পর্যাপ্ত লোকবলের ঘাটতি থাকার কারণে যে পরিসরে কার্যক্রম চালানো প্রয়োজন, তা

পূরণে কর্তৃপক্ষকে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে। তদুপরি , খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী মানহীন খাদ্যদ্রব্য তৈরী ও বিপণন করে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। আবার নিয়ন্ত্রণহীন বাজারে অসহায় দরিদ্র মানুষ উপায়ন্তর না দেখে স্বল্প দামে মানহীন দ্রব্য ক্রয় করে দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতায় পরে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে।

'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'-এর উদ্দেশ্য হলো মূলতঃ- নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা, খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা এবং একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কার্যকর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা। নিরাপদ খাদ্য আইনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারায় বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। যেমন- খাদ্যে বিষাক্ত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত ধারা- ২৩ অনুযায়ী: মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য বা এর উপাদান বা বস্তু (যেমন-ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ফরমালিন, সোডিয়াম সাইক্লামেট), বালাইনাশক (যেমন-ডিডিটি, পিসিবি, তৈল) খাদ্যের রং বা সুগন্ধি বা অন্য কোন বিষাক্ত দ্রব্য সংযোজন বা প্রক্রিয়াসহায়ক দ্রব্য কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করা অথবা অনুরূপ দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় করার কারণে শাস্তি হিসেবে অনূর্ধ্ব ৫ বছর এবং অনূর্ধ্ব ১০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধার রাখা হয়েছে। ধারা-২৫ নম্বরে বলা হয়েছে: কোন ভেজাল খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা অথবা আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করার অপরাধে অনূর্ধ্ব ৩ বছর এবং অনধিক ৬ লক্ষ টাকা অথবা উভয় দণ্ডের শাস্তির বিধার রাখা হয়েছে। সর্বমোট ৯০টি ধারা সংবলিত এই আইনে একই রকমের অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তির বিধার রাখা হয়েছে। ভোক্তা এবং বিক্রেতা উভয়েরই নিরাপদ খাদ্য আইন এবং এর শাস্তির ধরণ সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। কারণ, একদিকে যিনি বিক্রেতা অন্যদিকে তিনিই ভোক্তা। ভোক্তা এবং বিক্রেতার বেশিরভাগই জানেন না নিরাপদ খাদ্য আইনে অপরাধের শাস্তি কী।

পারিবারিকভাবে আমাদের সচেতনতার অংশ হিসেবে নিরাপদ খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা মেনে চলা আমাদের জন্য আবশ্যিক।

এ নির্দেশনা গুলো হলো-

(১) খাবার প্রস্তুত ও গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
(২) খাদ্যবাহিত রোগ প্রতিরোধে কাঁচা ও রান্না করা খাদ্য আলাদা করে রাখা।
(৩) সঠিক তাপমাত্রায় খাবার রান্না করতে হবে। খাদ্যের কেন্দ্রস্থ তাপমাত্রা ৭০ ডিগ্রি সেঃ এ ন্যূনতম ২ মিনিট জাল করতে হবে।
(৪) অনেক সময় পারিবারিকভাবে খাবার ফ্রিজে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম মানা হয় না। তৈরীকৃত খাদ্য দ্রব্য ফ্রিজে নরমালে ৪ ডিগ্রি সেঃ এর নিচের এবং ডিপে দীর্ঘসময় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেঃ এর নিচের তাপমাত্রায় রাখতে হবে।
(৫) নিরাপদ পানি দ্বারা শাক-সবজি ফলমুল পরিষ্কার করে নিতে হবে।

খাদ্যের নিরাপদ সংরক্ষণ ও পারিবারিক সচেতনতার জন্য এ কর্তৃপক্ষ 'নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করেছে। এ নির্দেশিকায় নিরাপদ খাদ্য ক্রয়, রান্না, পরিবেশন ও সংরক্ষণের প্রতিটি ধাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া খাদ্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে গুগল প্লে-স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যায় 'খাদ্যকথন' অ্যাপ ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক যেকোন পরামর্শ ও অভিযোগ থাকলে যে কেউ কোন টোল ছাড়াই কল করতে পারবেন '১৬১৫৫' এই নম্বরে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১-এর সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় সরকার এখন ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ প্রতিষ্ঠার জন্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে চারটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে স্মার্ট বাংলাদেশ।

স্তম্ভগুলো হলো-

- স্মার্ট সিটিজেন
- স্মার্ট সোসাইটি
- স্মার্ট ইকোনমি ও
- স্মার্ট গভর্নমেন্ট।

এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের লক্ষ্য জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও একইসঙ্গে নিরাপদ খাবারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে নিরাপদ খাবার নিশ্চিতের বিকল্প নেই। স্মার্ট বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে টেস্টিং ল্যাব প্রতিষ্ঠার

কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি দেশের বাইরে থেকে অনিরাপদ খাদ্য যাতে দেশের ভোক্তার কাছে না আসতে পারে তার জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ পোর্ট এন্ট্রিতেও টেস্টিং ল্যাব স্থাপন প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা বাড়ানোর পাশাপাশি খাদ্য সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার। এর ফলে বাংলাদেশের জনগণ স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। এ লক্ষ্যে চাই সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তরসহ সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ।

স্মার্ট বাংলাদেশে খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন:

- ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেমস: ফুড সাপ্লাই চেইন-এ ডিজিটাল মনিটরিং এবং সেন্সর ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে অব্যাহতি অবস্থা মনিটর করা হয়।
- ট্রেসাবিলিটি প্রযুক্তি: পণ্যের উৎপাদন থেকে গ্রহণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পথের ট্রেসাবিলিটি সহজে যাচাই করা প্রয়োজন।
- ডেটা এনালাইসিস: রিস্ক বেসড ডেটা এনালাইসিস অতি গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিগ ডেটার ব্যবহার বাড়াতে হবে।
- শিক্ষা এবং সচেতনতা: কনজিউমারের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে শিক্ষা এবং সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। এক্ষেত্রে ডিজিটাল ডিভাইস, সোসাল মিডিয়া, ইনটারনেট অব থিংকস ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- সহযোগিতা এবং সমন্বিত উদ্যোগ: সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় জোরদার করতে কাজ করতে হবে।

এইসব উপায়ে একটি স্মার্ট বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট খাদ্যের নিরাপদতা এবং পুষ্টি গবেষণার আওতায় শিক্ষা ও গবেষণা, খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণসহ খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত সকল বিভাগকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। এ ইনস্টিটিউট মনে করে পুষ্টি ও খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন খাদ্যের সমৃদ্ধি, পুষ্টিগতমান, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জ্ঞান, ওজনের ভিত্তিতে পুষ্টিগত খাবারগ্রহণ ও খাবারে বৈচিত্র্য রক্ষা। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করতে অনলাইনে খাদ্যপণ্যের নিরাপদতা যাচাই করার জন্য একটি ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহার করা যেতে পারে, যেটি খাদ্য নিরাপদতা অনুসন্ধান করতে সহায়ক হতে পারে।স্মার্ট বাংলাদেশে খাদ্য সরবরাহে সমৃদ্ধি ও নিরাপদতা সহজভাবে অনুসন্ধান করার জন্য এবং গুণগত ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য নিশ্চিত করতে সার্বিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হতে পারে।এক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্ট সংস্থা, সরকার এবং খাদ্য নিরাপদতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগ প্রয়োজন।পর্যায়ক্রমিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সকল সুফলকে কাজে লাগিয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অংশীজনদের প্রায়োগিক ভূমিকার মাধ্যমে আমরা খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সক্ষম হতে পারি। এভাবেই স্মার্ট বাংলাদেশে নিশ্চিত হবে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা তথা স্মার্ট বাংলাদেশে শতভাগ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা একটি অনিবার্য বাস্তবতা। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারে মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হবে। একইসাথে ভবিষ্যৎ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে এ-সকল প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হবে। এভাবেই সমন্বিত প্রচেষ্টায় স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত হবে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার হবে সুস্থ, কর্মক্ষম ও স্মার্ট জনগোষ্ঠী।

——————— 0 ———————

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ভূমিকা, সুযোগ ও সম্ভাবনা

শেখ মো: জামিনুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

নিরাপদ খাদ্য এরূপ একটি শর্ত বা নিশ্চিত অবস্থা বোঝায় যা ভোক্তার প্রত্যাশিত ব্যবহার বা খাবারের জন্য তাদের কোনোরূপ ক্ষতি হবে না। এ ধারণাটি খাদ্য উৎপাদন হতে ভোগ পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে, যা খাদ্য গ্রহীতাকে এ সংক্রান্ত বিষয় হতে সর্বাত্মকভাবে নিরাপদ ও সুস্থ রাখবে। নিরাপদ খাদ্য বলতে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত, ভেজালমুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যকে বোঝায়। এরূপ খাদ্য বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধের শারীরিক চাহিদা পূরণে সক্ষম এবং অপার কর্ম উদ্দীপনা, উৎসাহের সঞ্চার করা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষণকালীন উপোস ক্লান্তি ও দুর্বলবোধ না করে সুস্থ থাকাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

নিরাপদ খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। খাদ্যকে স্বাভাবিক এবং ভেজাল ও অন্যান্য দূষণ থেকে নিরাপদ অবস্থায় বিতরণই হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য। বিশ্বব্যাপী সব সরকারই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। কারণ বেঁচে থাকার রসদই হচ্ছে খাদ্য। আর সেই খাদ্য অবশ্যই নিরাপদ হওয়া জরুরি।

সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। ভেজাল ও দূষণমুক্ত নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির জন্য সরকার 'নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩' প্রণয়ন করেছে। এরপর ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি, ভেজাল ও দূষণবিরোধী অভিযান পরিচালনা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রম ও দেশি-বিদেশি সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে সফলভাবে এগিয়ে চলছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের এই অধিকার পূরণকল্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা গবেষণার ওপর এখন গুরুত্ব দিয়েছি। 'নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩' এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। জনসাধারণের সচেতন উপলব্ধি ও সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য আইনের প্রয়োগ ও নিরাপদ খাদ্য আন্দোলন বেগবান করা সম্ভব। উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে খাদ্যের নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান বজায় রাখা জরুরি। দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, তার যেমন সচেতনতা প্রয়োজন; তেমনি যিনি ভোগ করবেন, তার ক্ষেত্রেও নিরাপত্তার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। আমি আশা করছি, জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অংশীজনদের প্রায়োগিক ভূমিকার মাধ্যমে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সক্ষম হবো, ইনশাল্লাহ"

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ভূমিকা:

ক্ষুদ্র ঋণ নয়, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে টেকসই দারিদ্র্যমুক্তি-এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি দর্শন। এটি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যকর দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এর অতি উচ্চ সুদ, জবরদস্তিমূলক সাপ্তাহিক আদায় ব্যবস্থা, কৃষিজ খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত না করে অতিমাত্রায় অকৃষি কাজে বিনিয়োগ, প্রশিক্ষণবিহীন ঋণ গ্রহীতাদের দক্ষতার অভাব ইত্যাদি। এটি লক্ষণীয় যে, ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাগণ এক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধের জন্য অন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে তাঁরা দারিদ্র্য বিমোচনের পরিবর্তে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে একটি কার্যকর টেকসই ও জনমুখী আর্থিক মডেলের প্রবর্তন এবং পল্লী এলাকার দরিদ্র মানুষকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠিয়ে আনার

প্রেক্ষাপটে ২০০৯ সালে গৃহীত 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প পরবর্তীতে 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প চালু করা হয়। প্রকল্পটি চারবার সংশোধিত হয়ে ২০২১ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হয় এবং ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক উক্ত প্রকল্পের স্থায়ীরূপ হিসেবে এককভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

- মোট গ্রাম সমিতি গঠন : ১,২০,৩২৫ টি
- পল্লী এলাকার দরিদ্র পরিবার অন্তর্ভুক্তি : ৫৬ লক্ষ ৭৭ হাজার
- দরিদ্র সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ : ২০৮৬.০০ কোটি টাকা
- গ্রাম সমিতিসমূহের জন্য মোট তহবিল গঠন : ৭৬০৯.০০ কোটি টাকা
- সদস্যদের বাড়িতে পারিবারিক খামার স্থাপন : ৩৩ লক্ষ ৩৭ হাজার
- গ্রামীণ অর্থনীতিতে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ : ১১০৪০.০০ কোটি টাকা
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে : ২ লক্ষ ৭৪ হাজার জনকে
- গ্রাম পর্যায়ে ডিজিটাল আর্থিক সেবা প্রদান : ৫৬ লক্ষ ৭৭ হাজার জনকে
- দরিদ্র মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি : ৫৬ লক্ষ ৭৭ হাজার জনকে

ব্যাংকটির ৫১% শেয়ারের মালিক সরকার এবং বাকি ৪৯% শেয়ারের মালিক সমিতির সদস্যগণ। ব্যাংকটির অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো সমিতির দরিদ্র সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করা। পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে এমন কর্মকাণ্ডকে নিরুৎসাহিত করে আয়বর্ধক খামার গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব খাতে মাইক্রো ক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা যার মধ্যে অন্যতম হলো মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ, বনায়ন, নার্সারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদি। সমিতির সদস্যগণ অধিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র এবং কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত। দেশের খাদ্য উৎপাদনে এসকল সদস্যরা যথোপযুক্ত ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

বিগত ২১.০৫.২০২৩ খ্রি: তারিখে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এবং নিখাদ অর্গানিক এগ্রো লিমিটেডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নিখাদ অর্গানিক এগ্রো লিমিটেড একটি অর্গানিক, ভেজালমুক্ত পণ্য উৎপাদকারী ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান। কৃষক ও উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সরাসরি নিরাপদ ও বিষমুক্ত পণ্য সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাত ও মোড়কীকরণ করে সরাসরি ভোক্তার নিকট খাদ্যপণ্য পৌঁছানো, উৎপাদিত পণ্যের কাঙ্খিত মান বজায় রেখে ভোক্তার নিকট ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করা এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে নিখাদ অর্গানিক এগ্রো লিমিটেড। এছাড়াও নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্য পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে মানুষের জৈবিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ও প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে।

সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্যাবলি:

- নিখাদ অর্গানিক এগ্রো লিমিটেডের নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যয়ে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সমিতির দরিদ্র সদস্যদের নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্যপণ্য উৎপাদনে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- নিখাদ অর্গানিক এগ্রো লিমিটেডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা সদস্যদের নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্যপণ্য উৎপাদনে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণ সহায়তা প্রদান।
- নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে সামাজিক সচেতনেতা তৈরি।
- পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্য পণ্য বাজারজাতকরণে নিখাদ অর্গানিক এগ্রো লিমিটেড কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

- উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে বিপরীতে উদ্যোক্তা সদস্যরা যেন ন্যায্যমূল্য পেয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং ব্যাংকের ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয় সে বিষয়টি নিখাদ অর্গানিক এগ্রো লিমিটেড কর্তৃক নিশ্চিত করা।
- যোগ্য উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলা।
- দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা।
- নারী উদ্যোক্তা সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া।
- পর্যায়ক্রমে নিরাপদ খাদ্যপণ্য উৎপাদনে আগ্রহী সদস্যদের নিয়ে উক্ত খাতে আলাদা সমিতি গঠন করা যারা শুধুমাত্র নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকবেন।

নিরাপদ খাদ্য আন্দোলনে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সুযোগ এবং সম্ভাবনা:

- প্রায় ২.০০ কোটি দরিদ্র মানুষের প্রতিষ্ঠান পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক মূলত কৃষিজ খামার স্থাপনের নিমিত্ত উপকারভোগীদের ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে যাদের মধ্যে ৯০% উপকারভোগী সদস্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষিপণ্য উৎপাদনে সাথে জড়িত তাই নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে এই সকল উপকারভোগীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।
- মূলত উৎপাদন ধাপে নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্যপণ্য উৎপাদনের সুযোগ বেশি তাই এইক্ষেত্রে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সমিতির উপকারভোগী সদস্যগণ যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবেন।
- পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের উপকারভোগী সদস্যগণের উৎপাদিত কৃষিজপণ্য যথাসময়ে সংরক্ষণ করা গেলে উক্ত কৃষিজপণ্যের গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভব হবে সেই প্রেক্ষাপটে প্রতিটি জেলা শহরে সুবিধাজনক অবস্থানে একটি করে কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা গেলে অবিক্রিত কৃষিজপণ্য সংরক্ষণ সম্ভব এবং সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে কৃষকদের রক্ষা করা যাবে।
- ব্যাংকের সমিতির দরিদ্র সদস্যগণকে নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্যপণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করার সুযোগ রয়েছে যা নিয়ে অত্র ব্যাংক ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে।
- ব্যাংকের সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্য পণ্য বাজারজাতকরণে নিখাদ অর্গানিক এগ্রো লিমিটেডের সাথে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।
- নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে সামাজিক সচেতনেতা তৈরিকরণ।

নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্যপণ্য উৎপাদনের বিষয়টি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার নিমিত্ত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক অগ্রসৈনিক হিসেবে সরকারের পাশাপাশি কাজ করতে প্রস্তুত। নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্যপণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং মনিটরিং এর পাশাপাশি সরকারের সহায়তা অত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশি প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় তহবিল যোগানের মাধ্যমে সমিতির উপকারভোগী সদস্যদের নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্যপণ্য, কৃষিজপণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও ঋণ সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে বলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মনে করে।

নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব সামাজিকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রতি বছর ২রা ফেব্রুয়ারি "জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস" ঘোষণা করা হয়েছে, তাই উক্ত দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক দৃঢ় সংকল্পে কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা

———— 0 ————

FOOD SAFETY AND TRADE: BANGLADESH'S SHRIMP EXPORT PERSPECTIVE

Md. Moshiul Alam
Joint Chief
Bangladesh Trade and Tariff Commission & Former Senior Consultant, USAID Project

Shrimp is considered one of the most commonly consumed food. By the end of the 1970s, the beginning of commercial Shrimp farming started in Bangladesh with nine fish processing plants being set up in Chittagong and Khulna and that gave rise to the present export-oriented shrimp industry. Since the 1980s, there has been a dramatic increase in shrimp farming, especially in the coastal areas, where this has been termed the "Blue Revolution". Shrimp processing is one of the most organized, well-developed, and export-oriented sectors of the country.

Key Segments of the Shrimp Processing Industry

The companies in the sector are aware of food safety risks and testing requirements and most of the units are certified for ISO 22000/FSMS 22000 or HACCP. Some of these companies have well-equipped quality assurance (QA) labs. The companies in the sector are subject to inspection from the FIQC wing of the Department of Fisheries, which is also the key testing agency for approving export consignments.

Table 1: Key Segments of the Shrimp Processing Industry

Segment	Current Trends	Risks, Hazards and Concerns
Shrimp Processing	One of the most organized, well developed, and export-oriented sectors. Shrimp accounts for 85% of the country's aquaculture exports.	Presence of antibiotics; pathogenic microbes such as Salmonella spp., E. coli, Listeria monocytogenes, and Vibrio spp.; and viral infections such as white spot and yellow head diseases

Source: Report on Food Safety System in Bangladesh: Current Status of Food Safety, Scientific Capability, and Industry Preparedness"

Shrimp Export of Bangladesh

In the 1990s, Shrimp sector was the second largest export sector of Bangladesh after Readymade Garments (RMG). In 2022-23, fish sector (HS Chapter 03) stood after RMG, Footwear, Jute, Headgear. In other words, out of the total fish sector export earnings of US 421.74 million in FY 2022-23, shrimp alone earned US 276.25 million. The value of shrimp export has increased from 357.71 million US in FY 2018-19 to 357.71 million US in FY 2021-22. In last fiscal year the volume of export has decreased (Graph-1).

Graph 1: Shrimp Export from FY 2018-19 to FY 2022-23

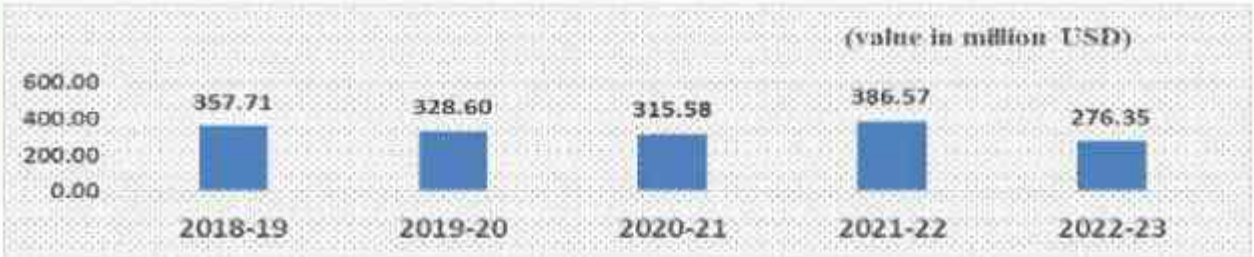

Source: Export Promotion Bureau

Bangladesh's shrimp are mainly export to the European Union (EU), the United States (US), United Kingdom (UK), Japan, and Russia accounting for more than 97.47% of the total shrimp export. The rest is exported to countries in the Asia and Middle East. In 2022-23, shrimp export to the EU accounted for 67.43% of the total export, while the share of the UK was 16.57%, the USA was 7.04%, Japan was 3.98%, and Russia was 2.43% respectively. Evidently the importance of the EU market for this particular export product of Bangladesh is very high (Fig 1).

Fig 1: Major Export of Shrimp and Pawn

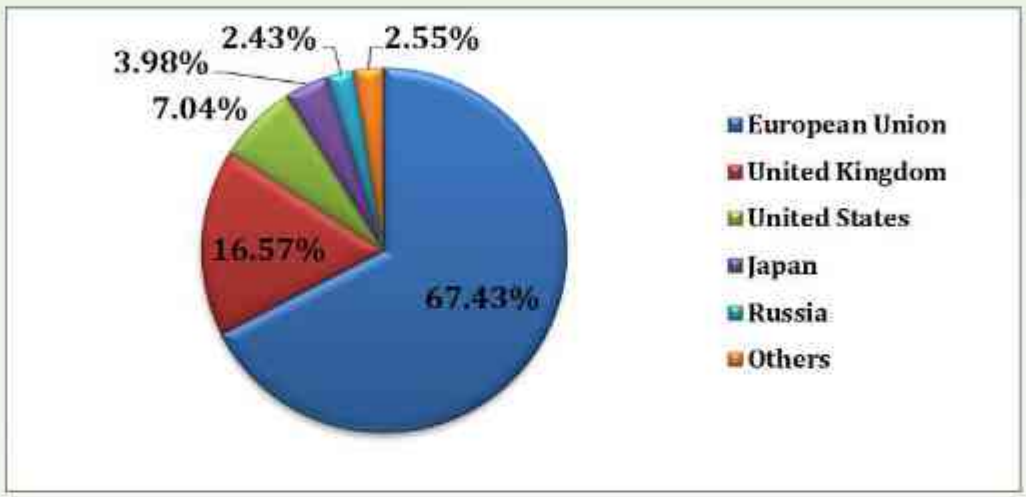

Source: Analyzed from Export Promotion Bureau Database

In FY 2022-23, Bangladesh exports other Shrimps and Prawns (HS 03061700) in 41 countries. Among them top 10 markets 6 are under European Union. Other remaining markets are UK, US, Japan and Russia. But China, Canada and UAE markets are staying with Bangladesh shrimp export with in top 20 destination (Table-1).

Table-1: Top 10 Export Countries for Other Shrimps and Prawns (HS 03061700) Export from Bangladesh in FY 2022-23

Sr. No	Country	Export Value (ml USD)
1	Belgium	52.85
2	Netherlands	50.57
3	UK	45.80
4	Germany	37.94
5	US	19.44
6	France	17.47
7	Japan	11.01
8	Portugal	8.22
9	Russia	6.71
10	Spain	5.04

Source: Export Promotion Bureau & Tariff Analysis Online

EU Ban on Shrimp Import from Bangladesh

The sanitary issue related to fisheries products and fish trade is dealt through the Agreement on SPS measures of the WTO. The EU ban on imports of shrimp from Bangladesh in 1997, imposed on the ground of heath safety and hygiene, is an example which encapsulates many of the concerns related to the SPS measures. This commodity did not meet the stringent provisions of EU's HACCP regulations. The ban

originated concerns as regards standards in areas related to health safeguards, quality control, infrastructure and hygiene in the processing units. Shrimp process for global markets has to comply with the international standards specified by Codex Alimentarius Commission provisions and has to meet buyer specifications as well as regulatory requirements of the importing country. Unfortunately, Bangladesh has difficulty in meeting with the required safety standards and quality management.

Regulatory Framework for Shrimp in Local and International level

In Bangladesh at national level Ministry of Fisheries and Livestock is in charge of overall administration. On November 26, 2020, the Ministry of Fisheries and Livestock enacted the Fisheries and Fisheries (Inspection and Quality Control) Act 2020 to enforce new laws reflecting the repealed provision of the Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance 1983. The Act outlines standard setting; quality control; competent authorities; licensing; healthy environment inspections of factories, establishments, and markets; fisheries registration; and the import-export of fish and fish products. The Act also outlines penalties for using harmful chemicals, adulteration, intrusion of impurities, and the use of illicit drugs and chemicals.

At international level there are two WTO important agreements are SPS and TBT. The Codex Alimentarius is a collection of internationally recognized standards, codes of practice, guidelines, and other recommendations relating to foods, food production, and food safety. Among other functions, it is responsible for setting international standards for safety and hygiene.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

HACCP is a process, the application of which can prevent shrimp from all sorts of possible contaminations from any possible sources beginning from culture up to the market. Shrimp importers particularly the USA and the European countries are highly concerned about the quality and safety of the shrimp produced and processed in the exporting countries. Previously, quality was maintained with respect to decomposition, filth content and pathogenic bacteria. These are not enough now-a-days. International organizations and buyers have already introduced Bioterrorism Act, Antidumping Act, Traceability and HACCP to ensure quality and safety of the shrimp products. Traceability Regulation introduced in 2002 requires creation of capability of the concerned establishment to exactly know how, when, where the culture, post-harvest, handling, processing, marketing have been done.

HACCP and Traceability are the mechanisms through which one will be able to know the total production history which upon analysis would detect the reasons and the real source of contamination thus enabling to correct the results to ensure supply of safe fish food.

Quality Management Assurance

The Ministry of Fisheries and Livestock of the Government of Bangladesh (GOB) has established a Fish Inspection and Quality Control (FIQC) wing in the Department of Fisheries to provide statutory support to processing- plants and to fulfill the international requirement and achieve international recognition regarding Fishery products. FIQC has three stations located at Dhaka, Chittagong and Khulna with moderate laboratory facilities. Each station is managed by qualified technical personnel and equipped with chemical, bio-chemical and microbiological testing facilities. Bangladesh government emphasized mainly two issues: (i) quality and safety (bacteriological quality, contaminants, residues, additives and traceability), and (ii) trade issues (labeling, documentation and GSP).

Opportunity of Shrimp Market at Globally

The Shrimp market size is estimated at 123.43 billion USD in 2023, and is expected to reach 134.80 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 1.48% during the forecast period (2023-2029) in Table-2. At globally the EU, US, Japan, and China are leading countries as per consumption Shrimp. As a least developed country (LDC) country, Bangladesh are enjoying duty free quota free (DFQF) in EU, Japan, China until 2026. Fortunately, EU, UK has extended the DFQF opportunity until 2029. Bangladesh's can avail to grab this market to maintain food safety criteria and others compliance issue.

Table 2: Shrimp Market Size in 2029

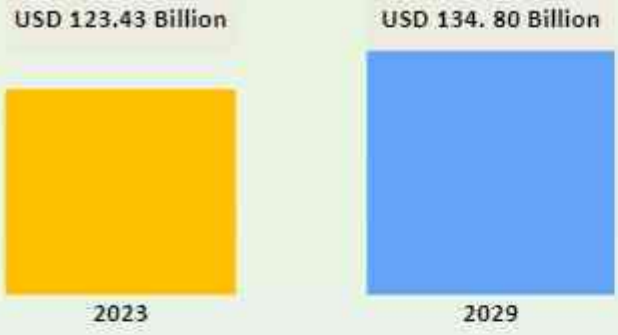

Source: Mordorintelligence

Unfortunately, Bangladesh's global share is too insignificant, only 0.27 billion export value out of 123.43 billion in 2023. Bangladesh government and business community may provide attention to increase share market considering compliance issue such as food safety, variety, SPS, TBT issues etc.

Challenges

Require more scientific qualified technical manpower to effectively conduct the quality assessment. FIQC needs maintain to update modern laboratory and equipment facilities to detect the presence of antibiotics and other hazardous chemicals in shrimp according to the EU standard. Prevalent food safety hazards in the sector include the presence of antibiotics; pathogenic microbes such as Salmonella spp., E. coli, and viral infections such as white spot and yellowhead diseases.

Recommendations

Both government and exporters and may pay attention of major investments in plant infrastructure and personnel training in order to achieve international technical and sanitary standards. Besides, industry to ensure food safety, traceability, environmental sustainability and social responsibility is needed. Moreover, quality control measurement standard should be more developed machine, instruments and laboratory should have enough facilities with modern and sophisticated, refrigerated carrier van and handling of shrimp with food graded plastic basket for food safety. In addition, mass level of the stakeholders need institutional and industry related education immediately.

Conclusion

Shrimp has high demand in the international market, but due to the poor rate of production and some other problems Bangladesh cannot available this opportunity. It could be growth possible, by compliance food safety ensure and quality management maintenance to achieve more export earnings on shrimp from Bangladesh.

Reference

Ministry of Finance (2023) Bangladesh Economic Review [Bangladesh-Economic-Review-2023 - Finance Division, Ministry of Finance-Government of the People\'s Republic of Bangladesh (portal.gov.bd)]

Saujanya Suman, Srirama Manyam, K V Satyanarayana and K Vijayaraghavan (2021), "Food Safety System in Bangladesh: Current Status of Food Safety, Scientific Capability, and Industry Preparedness" funded by United States Agency for International Development (USAID).

Export Promotion Bureau Database [http://www.epb.gov.bd/]

WTO Tariff Analyses Online database [https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tao_help_e.htm

Trade Policy Review of Bangladesh [https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp485_e.htm]

সমন্বয়ের ভিত্তিতে নিরাপদ খাদ্য: সবাই মিলে, সবার জন্য

আতাউর রহমান মিটন
সভাপতি
বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এবং সহ-সভাপতি, বিসেফ ফাউন্ডেশন

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া রাজনৈতিক সংঘাতের প্রেক্ষাপটে সর্বজনীন খাদ্য নিরাপত্তা যখন হুমকির সম্মুখীন, কোথাও কোথাও যখন খাদ্যাভাবের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তখনও বাংলাদেশের মানুষ খাদ্য নিরাপত্তার চাইতে নিরাপদ খাদ্যের যোগানের নিশ্চয়তাকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে। এটা নিঃসন্দেহে আনন্দের যে, কৃষি প্রধান বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ খাদ্য-রপ্তানি, বিশেষ করে কৃষিজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানিতে আশাবাদ দেখতে শুরু করেছে। তবে এক্ষেত্রে বিরাজমান অন্যতম চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে খাদ্য নিরাপদতার মানদণ্ড অনুসরণ। উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে। সরকারের এই রূপকল্প বা স্বপ্নীল প্রত্যাশা বাস্তবায়নে খাদ্যের নিরাপদতাকে পেছনে নয়, সামনে আনতে হবে। অগ্রাধিকার দিতে হবে এই খাতে অন্যান্য মেগা প্রজেক্ট এর মতই। এই প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপদতার নিশ্চয়তা বিধানে সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সমন্বয়ক সংস্থা 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' কর্তৃক "জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪" উদযাপনের প্রাক্কালে নাগরিক সমাজের পক্ষে কতিপয় ভাবনা ও সুপারিশ এখানে তুলে ধরছি।

মূল আলোচনায় যাবার আগে আমি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত বর্তমান সরকার এবং সেই সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে পুনরায় দায়িত্ব লাভ করায় মাননীয় সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি মহোদয়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিগত পাঁচ বছর খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে মাননীয় সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি দেশের সকল মানুষের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতে তাঁর পক্ষ থেকে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। আমরা আশা করি তিনি অতীতের অভিজ্ঞতায় আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের আস্থাভাজন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন এবং সার্বিক সহযোগিতা করবেন। আমরা আরও আশাকরি তিনি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে যে সকল ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে তাদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা এবং একটি হলিস্টিক কর্মকৌশল রচনায় নেতৃত্ব দিবেন। আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রত্যাশিত সেই শুভ কর্মযোগে সহযোগিতার আশ্বাস ব্যক্ত করছি।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে টানা চতুর্থবারের মতো শেখ হাসিনা সরকার আবার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় উন্নত বাংলাদেশ তথা ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলার যে রূপকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিকে দিয়েছেন সেখানে সর্বস্তরে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তাকে অগ্রাধিকার দেয়া অপরিহার্য। কেননা, খাদ্যের অধিকার মানুষের মৌলিক মানবাধিকার এবং বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সকল নাগরিকের জন্য সেই অধিকারের সুরক্ষা দেয়া সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। আমরা যখন খাদ্যের কথা বলি তখন অনিবার্যভাবেই খাদ্যের গুণ বিচারে নিরাপদতা ও পুষ্টিমানের নিশ্চয়তার কথা বলি। খাদ্য মানেই নিরাপদ ও পুষ্টিমান সম্পন্ন হবে এটাই সর্বজনবিদিত। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে তাই নিরাপদ ও পুষ্টিমানসমৃদ্ধ খাদ্যের উৎপাদন থেকে ভোক্তার পাত পর্যন্ত একটি মানদণ্ড অনুসরণ আবশ্যক আর সমন্বয়ের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করার দায়িত্বটি 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' অনুযায়ী গঠিত 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' এর উপর ন্যস্ত। সুতরাং এই কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আন্ত:মন্ত্রণালয় তথা সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করার ক্ষেত্রে বিরাজমান জটিলতাসমূহের নিরসন সর্বাগ্রে বিবেচনা করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ রাখছি।

বর্তমান সরকার সামগ্রিক কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে গুরুত্ব প্রদানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে। এছাড়াও সরকার ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা বলেছে। সরকার আরও চায় সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যাতে দেশে মেধাবী ও উৎপাদনশীল জনশক্তি বৃদ্ধি পায়। আগামী দিনগুলোতে জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে ঘরের বাইরে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ অবশ্যম্ভাবী বেড়ে যাবে। আমাদের দেশে হোটেল-রেস্তোরাঁ এবং ফুটপাতের খোলা খাবারে নিরাপদতার মান নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে জনস্বাস্থ্যের জন্য তা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে। অসংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঘটবে, বাড়বে সরকারের স্বাস্থ্যব্যয়। সুতরাং কৃষিখাতে যান্ত্রিকীকরণ সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের ক্ষেত্রেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি করতে হবে। ঢাকা মহানগরের ফুটপাতের অনেক দোকানে এখানে নিরাপদতার অনুশীলন কিছুটা চোখে পড়ে। আবার অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা অর্থাভাবে

বা নিরাপদতা সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞানাভাবে খাদ্য বিক্রির সময় নিরাপদতার অনুশীলন করছে না। এদের সংখ্যাই এখনও বেশি। তাই সরকারকে ভাবতে হবে কিভাবে এই উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধা দেয়া যায়, যাতে করে তারা খাদ্যপণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিরাপদতার মানদণ্ড অনুসরণ করতে পারে। সারাদেশেই এই সহযোগিতা সম্প্রসারিত করতে হবে।

যারা অসাধু, যারা ইচ্ছে করে মানুষের খাবারে নানাভাবে দূষণ ঘটায় তাদের শাস্তি দিতেই হবে। তবে আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতার নীতি অনুসরণ নিশ্চিত করা দরকার। মানুষকে কেবল শাস্তির ভয় দেখালে চলবে না। সরকারের সেটা কাম্য নয়। ভোক্তাদের সাথে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের উপায়গুলিকে সহজীকরণ এবং উৎসাহব্যঞ্জক করা দরকার। যেমন ধরা যাক একজন ভোক্তা একটি হোটেলে গিয়ে দেখলেন সেখানে খাবার পরিবেশন হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। তিনি (ভোক্তা) তখন কি করবেন? নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে কি অভিযোগ জানাতে পারবেন? তিনি যে প্রতিকার পাবেন তার নিশ্চয়তা কোথায়? অথবা একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যখন কোন দোকানে গিয়ে কাউকে জরিমানা করছেন তিনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে, খাবারটি দূষিত? কোন যন্ত্র দিয়ে তিনি সেটি পরীক্ষা করলেন? বাজারে যে কৃষিপণ্য বিক্রি হচ্ছে তা যে রাসায়নিক দূষণমুক্ত তা জানার উপায় কি? বাড়িতে কিভাবে খাবারের দূষণ হয় বা হতে পারে সে ব্যাপারে গৃহিণীদের সচেতনতা কতখানি? গণমাধ্যমে যে সকল খাদ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় তা যে নিরাপদ সেটা কিভাবে নিশ্চিত হয়েছে? বিজ্ঞাপনের ভাষা ও উপস্থাপনে জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার অপচেষ্টা নিয়ন্ত্রণের উপায়ই বা কি? আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এই সকল বিষয়ে সচেতন এবং তারা এ বিষয়গুলো প্রতিরোধে কাজ শুরু করেছেন। যেটা দরকার তা হচ্ছে, তাদের এই উদ্যোগ বা পদক্ষেপগুলো গণমাধ্যমসহ অন্যান্যদের সহযোগিতায় প্রত্যেকের ঘরে ঘরে জানানোর ব্যবস্থা করা। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে সেটা কী করে করা সম্ভব?

নিরাপদ খাদ্যের আন্দোলন বর্তমানের তো বটেই, একই সঙ্গে এটা ভবিষ্যতেরও আন্দোলন। কেননা, আমরা যদি বর্তমানে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হই, তাহলে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যে মেধাবী ও পরিশ্রমী জনশক্তি প্রয়োজন তা মিলবে না। আমাদের খাদ্য উৎপাদনে জমি কমে যাচ্ছে। আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়াতেই হবে কিন্তু সেই খাদ্যকে হতে হবে নিরাপদ। এর জন্য যুবসমাজকে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে হবে। স্বল্প আয়ের মানুষের কথা বিবেচনায় রেখে কার্যকর কৌশল গ্রহণ করতে হবে। নিরাপদ খাদ্যের প্রচেষ্টা যেন কেবল ধনীক বা সামর্থ্যবান গোষ্ঠীর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে পরিচালিত না হয়, পথের ধারের হোটেল, চায়ের দোকানগুলোতেও যেন নিরাপদ খাদ্য পাওয়া যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকেই। এর জন্য একটা সামষ্টিক উদ্যোগ লাগবে। সবাইকে নিয়ে কাজ করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। নিরাপদ খাদ্যের উৎপাদন থেকে বিপণন অব্দি যে চক্রটি রয়েছে সেখানে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করে একটা কার্যকর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হলে জনগণের পাতে নিরাপদ খাদ্য সহজলভ্য হবে।

নিরাপদ খাদ্যচক্র গড়ে তুলতে সহায়ক মনোজগত চাই। সেজন্য দেশের শিক্ষা কারিকুলামে খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে মৌল জ্ঞান লাভের সুযোগ রাখতে হবে। নিরাপদ খাদ্য আইন ছাড়াও খাদ্য উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য সম্পর্কিত তথ্য প্রচার, খাদ্য উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের দায়বদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা যাতে সঠিক তথ্য পেতে পারেন নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের চিকিৎসক সমাজকে খাদ্য নিরাপদতার এই অভিযানে সামনের সারিতে রাখা দরকার। খাদ্য অনিরাপদ হলে কেবল ওষুধ দিয়ে মানুষকে সুস্থ রাখা সম্ভব হবে না, এই কথাটা ডাক্তারদের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে প্রচার করতে হবে। শরীরের সুস্থতাকে হলিস্টিকভাবে দেখতে হবে। নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের ভূমিকা সেখানে মুখ্য। আমাদের খাবারের প্লেটে বিষাক্ত ও দূষিত উপাদান মিশে থাকবে, অজান্তে প্রবেশ করবে আমাদের শরীরে আর ধীরে ধীরে স্লো পয়জনিং এর মত করে আমাদের অকালমৃত্যু ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে এটা হতে দেয়া যায় না। তাই, চাই বাস্তবানুগ তৎপরতা। চাই সমন্বিত উদ্যোগ। একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক বা নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ যাতে ভূমিকা রাখতে পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে বিদ্যমান আইন ও বিধিসমূহের পর্যালোচনা করতে হবে। একটি টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয় এই কাজটি সম্পন্ন করতে পারে। এই টাস্ক ফোর্সে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা দরকার। সরকারের সাথে নাগরিক সমাজের নিবিড় সম্পর্ক সহজতর করতে সরকার অবিলম্বে 'নিরাপদ খাদ্য ফাউন্ডেশন' গঠন করতে পারে। আমরা অনেকদিন থেকেই সেই প্রস্তাবটি তুলে ধরছি কিন্তু এখনও সরকারের অঙ্গীকার পাইনি।

পরিশেষে বলতে চাই, করার আছে অনেক কিছুই। জাতির জনকের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩' জনগণকে উপহার দিয়েছেন। আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে তিনি আন্তরিক বলেই আমরা বিশ্বাস করি। সংশ্লিষ্টদের উচিত এই উদ্দেশ্যপূরণে করণীয়গুলো সরকার প্রধানের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরা। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কাজকে একটি কারিগরি কাজ হিসেবে বিবেচনা করে এই কর্তৃপক্ষের সদস্যগণের কাজের মেয়াদ ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা আরও বৃদ্ধি করা দরকার। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও অন্যান্য প্রশাসনিক বাস্তবতা বিবেচনায় 'নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' এর এর সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নাগরিক সমাজকে এমনভাবে উজ্জীবিত ও সম্পৃক্ত করা দরকার, যাতে করে সরকারের পক্ষে অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন করা সহজ হয়। কাজ করবে নাগরিক সমাজ তাদের নিজেদের দায়িত্ববোধ থেকে। সরকারের কাজ কেবল যথাযথ সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪ সফল হোক। সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে আসুন আমরা সবাই মিলে একযোগে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করি।

————0————

IMPORTANCE OF NUTRITION AND FOOD SAFETY IN FOOD SYSTEM

Mostafa Faruq Al Banna
Research Director (Nutrition)
FPMU, Ministry of Food

Food safety and nutrition are inextricably linked. To achieve optimal human health and wellbeing, people must be both well-nourished and free from foodborne disease. It is important to integration of food safety and nutrition in the food system process to get optimum result (Nordhagen et al., 2022). Evidence shows that improving food safety standards and regulations and enforcing their implementation is essential to safeguard the health and nutrition of the population (FAO, 2021). Improved food safety will contribute to improved nutritional status and will contribute to the reduction and prevention of many of non-communicable diseases (FAO, 2021).

Food safety is an important global issue to protect public health. Recent study conducted by WHO in 2015 shows that nearly one in ten (a total 600 million) people fall ill every year from eating unsafe food contaminated with bacteria, viruses, parasites, and toxins, as well as selected chemicals, with 420000 dying as a result. The study also showed that the most affected are low and middle-income countries with about 75% deaths from foodborne disease (WHO, 2015).

Malnutrition refers to "deficiencies, excesses, or imbalances in a person's intake of energy and/or nutrients." It encompasses undernutrition (including wasting (low weight-for-height), stunting (low height-for-age), and underweight (low weight-for-age)), micronutrient-related malnutrition (deficiencies or excesses of vitamins and minerals), overweight/obesity, and diet related non-communicable diseases (NCDs) (WHO, 2020). Evidence shows that, globally, one person in three is malnourished (IFPRI, 2015a). Evidence also shows that, if current trends continue, one person in two could be malnourished by 2030 (GloPan, 2016a).

Recent research findings show that malnutrition in all its forms affects one in three people and is associated with economic costs of up to $3.5 trillion USD per year (Global Panel, 2016), with diet-related risk factors responsible for about 22% of adult deaths (Afshin et al., 2019). At the same time, foodborne diseases are estimated to annually cause 600 million illnesses, particularly among lower-income consumers and young children in lower-income countries (Havelaar et al., 2015; Kirk et al., 2015).

Food systems include all actors and activities that play a role in production, processing, distribution, preparation, and consumption of food (HLPE, 2017). Evidence shows that, the food system must have a mandate to make nutritious, safe food accessible to all; it is currently failing to do so. Efficient and effective food-systems action to improve nutrition and reduce foodborne disease requires synergies that seek to improve access to nutrient-dense foods while simultaneously improving their safety (Nordhagen et al., 2022).

There are interlinkages between food safety and nutrition that support taking a novel view of food systems through an integrated 'food safety and nutrition' lens (Figure-1). Figure-1 presents this lens, as applied to an existing food system model derived from the USAID Bureau for Resilience and Food Security Food Systems conceptual framework (USAID, 2020) and the HLPE framework (HLPE 2017). The model food systems framework lens envisions how the food system appears when food safety and nutrition are considered explicitly throughout.

Food system frameworks, and the 'food safety and nutrition' lens seek to represent all actors and activities that play a role in production, processing, distribution, preparation, and consumption of food, directly or indirectly. Integrated food safety and nutrition issues need to be incorporated in the main components of the food system include food

supply chains (from inputs to retail), food environments (places where consumers interact with food), and consumer behaviors, as well as external drivers (higher-level and more diffuse forces that influence the system). The food system influences diets—which influence human health and other development outcomes.

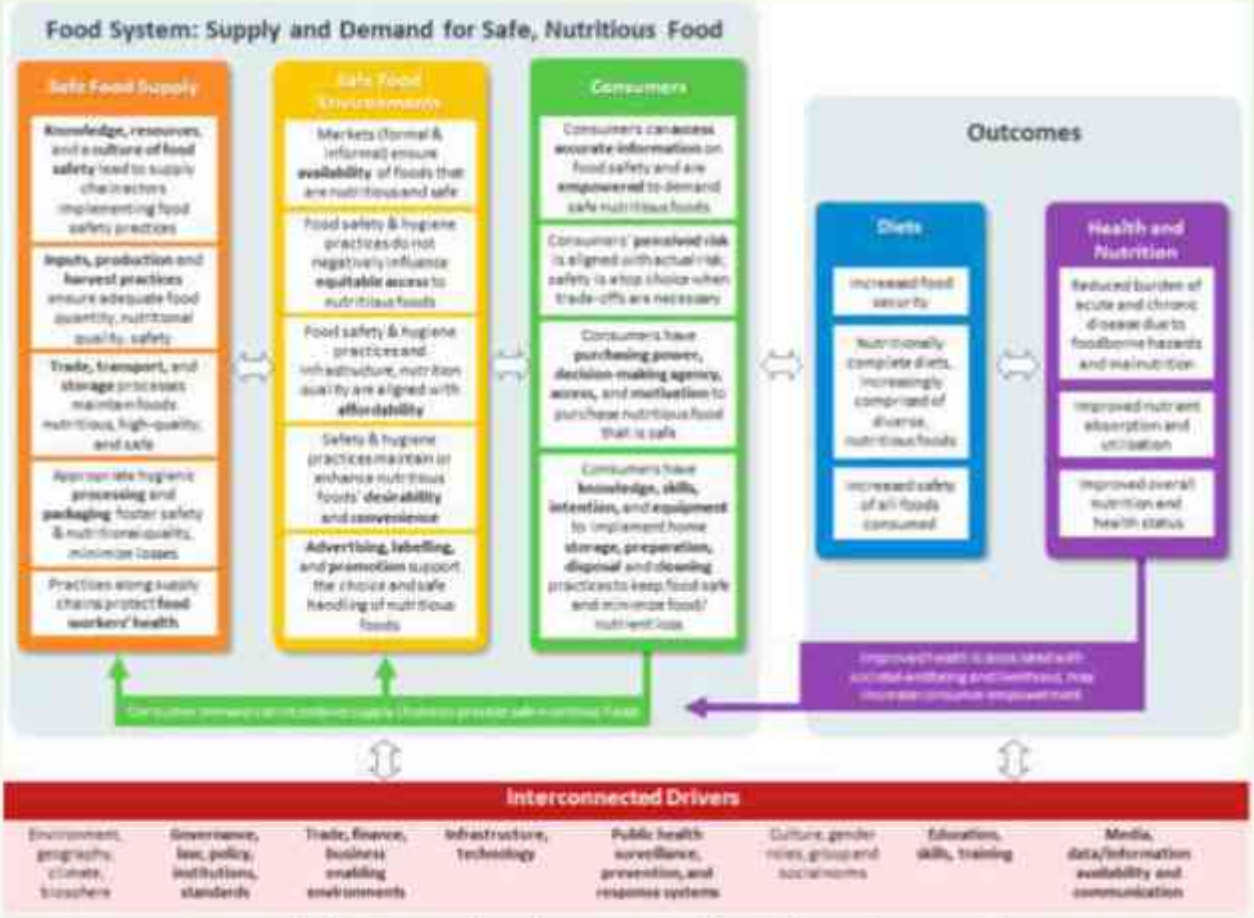

Fig. 1. The food system through an integrated "food safety and nutrition" lens.

It is important to look at the food systems through a lens considering both food safety and nutrition related issues. Food safety and nutrition objectives need to be integrated in the various components of food systems to get the optimum health and nutrition outcomes.

Ministry of Food has formulated the National Food and Nutrition Security Policy 2020 and its Plan of Action (2021-2030) in collaboration with other relevant Ministries and Agencies. Nutrition and food safety issues have been incorporated within the approach of food systems in this policy and the plan of action.

Food Safety and Nutrition issues have also been well addressed during the UN Food Systems Summit 2021 organized by the Secretary General of United Nations. One of the objective (also known as Action Track-1) of the Summit was "ensure access to safe and nutritious food for all". As the coordinating Ministry, Ministry of Food has organized different national and sub-national level dialogues to prepare a National Pathway Document for the transformation of food systems in collaboration with FAO and GAIN. In this document, food safety and nutrition issues are well addressed.

References:

1. Afshin et al., 2019. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 393, 1958–1972. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30041-8.
2. FAO (2021). Integrating food Safety and nutrition in agri-food systems. Technical Brief. 2021.
3. GloPan (2016a). Global Panel for Agriculture and Nutrition for Food Systems. Food Systems and Diet: facing the challenges of the 21th Century. Foresight Report. London, UK.
4. Global Panel (2016). The Cost of Malnutrition. Why Policy Action Is Urgent. Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition, London.
5. Havelaar et al., 2015. World Health Organization, Global estimates and regional comparisons of the burden of foodborne disease in 2010. PLoS Med. 12, e1001923 https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001923.
6. HLPE (2017). Nutrition and food systems. Rome: High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (HLPE), Committee on World Food Security.
7. IFPRI (2015a). Global Nutrition Report 2015: actions and accountability to advance nutrition and sustainable development. Washington, DC.
8. Kirk et al., 2015. World Health Organization, Estimates of the global and regional disease burden of 22 foodborne bacterial, Protozoal, and viral diseases, 2010: a data synthesis. PLoS Med. 12, e1001921 https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001921.
9. Nordhagen et al.(2022). Integrating nutrition and food safety in food systems policy and programming. Global Food Security (32), 2022.
10. USAID (2020). RFS Food Systems Conceptual Framework. Washington, DC: United States Agency for International Development (USAID) Center for Innovation and Impact.
11. WHO (2015). WHO estimates of the global burden of foodborne diseases. Foodborne diseases burden epidemiology reference group 2007-2015

    http://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/fergreport/en/
12. WHO (2020). World health organization. URL. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition.

———————— 0 ————————

প্রাণিসম্পদ ভ্যালুচেইনে খাদ্য নিরাপদতা

ড. শেখ শাহিনুর ইসলাম
উপপরিচালক
প্রাণিস্বাস্থ্য, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

খাদ্য নিরাপদতা (Food safety) মানবস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তথা প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদনে উত্তম চর্চা প্রতিপালনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদনে বিশেষ করে খামারীদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাণিস্বাস্থ্য, প্রাণিকল্যাণ, ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ পরিষেবা বিবেচনায় এনে নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদনে খাদ্য নিরাপদতার বিষয়সমূহ প্রতিপালনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যা এসডিজি এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন, ভিশন ২০৪১ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ এর সাথে সমন্বয় করে প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন ও বিপণন বলয়ের বিভিন্ন স্তরে যেমন উৎপাদন (খামার), প্রক্রিয়াজাতকরণ (জবাইখানা) এবং পরবর্তী ভোক্তাপর্যায়ে সরবরাহের ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপদতার মাপকাঠিসমূহ অনুসরণে সহায়তা প্রদান করছে। এ ছাড়া জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণ, ভেটেরিনারি এন্টিমাইক্রোবিয়ালের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রাণিজাত পণ্যে অবশিষ্টাংশ (Residues) নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে জনসাস্থ্য ঝুঁকি নিরসণে সহায়ক হচ্ছে। সে কারণে প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদনে ইপিডেমিওলজিক্যাল নজরদারি, ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ বিষয়ক কর্মপ্রয়াস খাদ্য নিরাপদতা ব্যবস্থাপণার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন।

প্রাণিসম্পদ খাতে মূলত: তিনটি ভ্যালুচেইন বিদ্যমান, যথা পোল্ট্রি, বিফ ও ডেইরি । উক্ত ভ্যালু চেইনসমূহে সংযুক্ত সকল অংশীজনদের জনসচেতনতা উন্নীতকরণসহ এর প্রতিটি স্তরে উত্তম চর্চা বাস্তবায়ন করা জরুরি। প্রতিটি ভ্যালু চেইনের জন্য প্রযোজ্য একটি খাদ্য নিরাপদতা/ফুড সেফটি বিষয়ক নির্দেশিকা (Guidelines) প্রণয়ন করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সকল ভ্যালুচেইনের জন্য উক্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করছে। যা বাংলাদেশে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে খাদ্য নিরাপদতার প্রধান শর্তাদি বাস্তবায়নে নীতি-নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রকদের সহায়তা প্রদান করবে এবং তা উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, সরবরাহ চেইনের সাথে সংশ্লিষ্ট জনবল এবং এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত সুফলভোগীদেরও কাজে লাগবে। নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এবং সরকারী বিভিন্ন সংস্থা ও রপ্তানি বাজারের চাহিদা মেটাতে নিরাপদ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ, পদ্ধতি ও চর্চার বিষয়ে সাহায্য করবে।

(ক) পোল্ট্রি ভ্যালু চেইন: বাংলাদেশে পোল্ট্রি সাপ্লাই চেইন অন্যান্য এশিয়ার দেশগুলোর মতোই একই ধরনের। এই ভ্যালু চেইনের যে সকল অংশীজন রয়েছে যেমন খামারি, পাইকারী বিক্রেতা, পরিবহনকারী, পাইকারী ও খুচরা বাজার এবং সরবরাহকারী। জীবনিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় এনে বাংলাদেশের পোল্ট্রি সেক্টরকে প্রধানত ৪টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। তন্মধ্যে সেক্টর-৩ ও ৪ অপেক্ষাকৃত কম জীবনিরাপত্তা অনুশীলন করে থাকে এবং এ দুইটি সেক্টর হতে দেশের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ পোল্ট্রি সরবরাহ করে থাকে। সাধারনত ৯৫% মুরগি প্রথাগত কাঁচাবাজারে (Live Bird Market) বিক্রি হয়। যেখানে জবাই ও মাংস প্রক্রিয়া করার কার্যক্রমে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কমতি রয়েছে। কিন্তু শতকরা ৫ ভাগের কম পোল্ট্রির মাংস ফ্রোজেন/হিমায়িত মাংস হিসেবে বিক্রি হয়। যেখানে খাদ্য নিরাপদতার সকল মাপকাঠিসমূহ/ উত্তম অনুশীলন প্রতিপালন করা হয়।

(খ) বিফ ভ্যালু চেইন: বাংলাদেশে প্রধানত দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য গরুর মাংস সরবরাহ করা হয় যথা (১) প্রথাগত (Traditional system) এবং আধুনিক (Modern system)। প্রথাগত পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের মাংসের প্রায় ৯৫% এর অধিক মাংস সরবরাহ করে থাকে। খামারে যে সকল পুরুষ বাছুর জন্মগ্রহণ করে সেগুলো জবাইয়ের জন্য লালন-পালন করে বড় করা হয়। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য বাড়ন্ত বাছুর-গরু সংগ্রহ করে লালন পালন করা হয়। গ্রাম ও শহরের প্রায় সকল জনগণ প্রথাগত পদ্ধতিতে জবাইকরা গবাদিপশুর মাংস খেতে পছন্দ করেন। এ ক্ষেত্রে জবাই ব্যবস্থাপনা সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন

অবকাঠামো, মিট ইনেসপেকশন ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে জবাই উচ্ছিষ্টাংশ অপসরণের বিষয়টি এখনও আমাদের দেশে তেমন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু আধুনিক (Modern system) জবাই ব্যবস্থাপণায় উত্তম অনুশীলন পুরোপরি প্রতিপালন করা হয়ে থাকে।

গ) মিল্ক ভ্যালু চেইন: লালনপালনকৃত গাভীর দুধ পারিবারিকভাবে ব্যবহারের পর অতিরিক্ত অংশ বিক্রি করা হয়। বাংলাদেশে >৮০% ক্ষেত্রে প্রথাগত অনিয়মিত পদ্ধতিতে এই দুধ বিক্রি করা হয় এবং প্রায় ৫% ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে প্রক্রিয়াকরণের জন্য সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত দুধ সংগ্রহকারী/গোয়ালা খামারীদের কাছ হতে দুধ সংগ্রহ করে শহরের খুচরা বাজারের বা গৃহস্থলীতে খাওয়ার জন্য বা চিলিং প্লান্টে প্রক্রিয়ার জন্য সরবরাহ করে থাকে। দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এই দুধ পাস্তুরিত/ইউএসটি মিল্ক/ অন্য প্রক্রিয়াজাত পণ্য হিসেবে শহর ও গ্রামের জনগোষ্টির মধ্যে সরবরাহের জন্য তৈরী করে থাকে। এখনও দুধ উৎপাদনে খামার পর্যায়ে উত্তম চর্চার কমতি রয়েছে। একইসাথে দুধ সংগ্রহকারী/ গোয়ালাদের উত্তম স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনে ঘাটতি রয়েছে। তবে বাণিজ্যিকভাবে গড়ে উঠা দুগ্ধ খামার হতে সংগৃহিত দুধ সাধারণত উত্তম চর্চার মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের পর বিক্রি হয়।

প্রাণিসম্পদ ভ্যালু চেইন খামার থেকে শুরু করে খাবার টেবিল পর্যন্ত উত্তম চর্চার প্রতিপালনের সাথে সম্পৃক্ত। যা অনুশীলন না করলে বিপত্তি (Hazard) অনুপ্রবেশ করতে পারে এবং এর ফলে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ঝুঁকিতে (Risk) পড়তে পারে। এছাড়া ঝুঁকি বিশ্লেষণ (Risk Analysis) ও ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট (CCP) নিরুপণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই CCP এর পাশাপাশি উত্তম খামার চর্চা (GHP) প্রতিপালন করা বর্তমান সময়ে খাদ্য নিরাপদতার ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। সে কারণে প্রাণিসম্পদ ভ্যালু চেইন এ খাদ্য নিরাপদতার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে সকল বিপত্তি অনুপ্রবেশ করতে পারে সেই সকল ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসনে করণীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এই বিপত্তিসমূহ প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন, পরিবহন, বিপণনের সময় অনুবেশ করে ঝুঁকি সৃষ্টি করে। যা প্রাণিজাত খাদ্যের নিরাপদতা নষ্ট করে এবং জনস্বাস্থ্য হুমকির কারণ হতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ (Risk Analysis):

প্রাণিসম্পদ ভ্যালু চেইনের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে হলে সম্ভাব্য বিপত্তির উৎস চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরি। একই সাথে বিপত্তির প্রভাবে ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। বিশ্ব প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থার (WOAH) মতে ঝুঁকি বিশ্লেষণের চারটি ধাপ হচ্ছে: (ক) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ (ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও শ্রেণিবদ্ধকরণ); (খ) ঝুঁকি বিশ্লেষণ (ঝুঁকি শুরু/প্রকাশ, বহিঃপ্রকাশ এবং ফলাফল পরিমাপ করা); (গ) ঝুঁকি নিরসন (ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থাগুলো বাছাই করা, সেগুলোর বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকার বিষয়গুলো নিশ্চিত করা;) এবং (ঘ) উপরোক্ত তিনটি ধাপ সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় ও ঝুঁকি সম্পর্কে পর্যাপ্ত যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন (চিত্র ১)। তাই প্রাণিসম্পদ ভ্যালু চেইনে খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিত করতে ঝুঁকি বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চিত্র ১: ঝুঁকি বিশ্লেষণ কাঠামো (সূত্র: বিশ্ব প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থা)

বিপত্তিসমূহ((Hazard):

জৈবিক বিপত্তি (Microbiological)	রাসায়নিক বিপত্তি (Chemical)	শারীরিক বিপত্তি (Physical)
পোল্ট্রি ভ্যালু চেইন		
• Campylobacter spp. • Salmonella spp. • Escherichia coli	• অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ • মাইকোটক্সিন (বিশেষ করে অ্যাফলাটক্সিন ও ওক্রাটক্সিন • ডায়োক্সিন এর মতো পলিক্লোরিনেটেড বাইফেনাইলস • অরগানোফসফরাস কমপাউন্ডস, রোডেন্টিসাইডস, রং ও লুব্রিকেন্ট • জবাইখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক, জীবানুনাশক যেমন আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, সীসা, পারদ ও ক্রোমিয়াম, ইত্যাদি ।	• প্রক্রিয়াজাত পোল্ট্রির মাংসে বিভিন্ন ক্ষতিকর বস্তু/ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় যেমন: কাঁচ, তার, ধাতব ক্লিপ, নখ, কাঠ বা বাঁশের টুকরা, স্ক্রু নাট, বোল্ট, ছোট ছোট পাথর, কাঁকর, ছুরির টুকরা, ইত্যাদি ।
বিফ ভ্যালু চেইন		
• Campylobacter spp. • Salmonella spp. • Escherichia coli • Bovine tuberculosis • Anthrax	• অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ • পেস্টিসাইড রেসিডিউ • ফুড এডিটিভস/প্রিসারভেটিভস (নাইট্রেট/ নাইট্রাইটস) • এলারজেনস	• ধাতব অংশ • কাঁচ বা প্লাস্টিকের অংশ • কাঠ/কাঠের অংশ • পোকামাকড় • ময়লা বা মাটি • চুল বা অন্যান্য ফাইবার
দুধ ভ্যালু চেইন		
• Salmonella spp. • Listeria monocytogenes • Bovine tuberculosis • Campylobacter spp. • Brucella • Escherichia coli	• পেস্টিসাইড রেসিডিউ • অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ • ফুড এডিটিভস/ কনটামিনেন্ট (কৃত্রিম গন্ধ এবং রং) • এলারজেনস	• ধাতব অংশ • কাঁচ বা প্লাস্টিকের অংশ • কাঠ/কাঠের অংশ • পোকামাকড় • ময়লা বা মাটি • চুল বা অন্যান্য ফাইবার

ঝুঁকি নিরসনে পদক্ষেপ:

পোল্ট্রি ভ্যালু চেইন	বিফ ভ্যালু চেইন	মিল্ক ভ্যালু চেইন
• উত্তম খামার চর্চা অনুশীলন; • পোল্ট্রি পরিবহনে নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ; • পোল্ট্রি বাজারজাতকরণে উত্তম চর্চা অনুশীলন; • নিরাপদ পোল্ট্রি জবাই, প্রক্রিয়াজাত ও বিতরণে উত্তম ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; • মুরগি জবাইয়ের পূর্বে ও পরে মুরগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিতকরণ; • অংশীজনদের জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ পোল্ট্রি সরবরাহে ভোক্তা-পর্যায়ে চাহিদা সৃষ্টিকরণ ।	• খামার পর্যায়ে উত্তম খামার চর্চার অনুশীলন; • গবাদিপশুকে ভেজালমুক্ত ফিড সরবরাহ; • নিয়মিত খাদ্য নমুণা ও গবাদিপশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা; • জবাইপূর্বে গবাদিশু পরিবহনে যত্নবান হতে হবে যাতে করে ধকল কম হয়; • জবাইয়ের পূর্বে ও গবাদিপশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিতে হবে এবং পরে কারকাস পরীক্ষা করে জনসাধারণের জন্য খাবারের উপযোগী কি-না তা নিশ্চিত করতে হবে; • উত্তম কসাইখানা চর্চা অনুশীলন নিশ্চিত করতে হবে । • অংশীজনদের জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ বিফ সরবরাহে ভোক্তা পর্যায়ে চাহিদা সৃষ্টিকরণ ।	• খামার পর্যায়ে উত্তম খামার চর্চার অনুশীলন; • স্বাস্থ্যবান গাভী হতে দুধ দোহন করতে হবে; • দুধ দোহনকারীর উত্তম স্বাস্থ্য চর্চা নিশ্চিত করতে হবে; • দুধ পরিবহনে যত্নবান হতে হবে যাতে করে ধুলা, বালি দুধকে সংক্রমিত না করে । কচুরিপানা / খড় সংযোগে দুধ পরিবহনে বিরত থাকতে হবে; • অংশীজনদের জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ দুধ সরবরাহে ভোক্তা-পর্যায়ে চাহিদা সৃষ্টিকরণ ।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk management of food hazards):

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান ঝুঁকি ও সাক্ষ্য-প্রমাণভিত্তিক (evidence based) তথ্য এবং দেশে বিদ্যমান খাদ্য ঝুঁকি, ঝুঁকির অনুধাবনের পথসমূহ, সরবরাহ চেইনের সাথে কিভাবে যুক্ত ও সংক্রমিত হতে পারে, ঝুঁকি প্রকাশের মাত্রা সম্পর্কে ধারণা দেয়। একই সাথে বিদ্যমান ও প্রয়োজনীয় ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থা এই সবই খাদ্য নিরাপদতাকে উন্নত করে একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় আনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবাদিপশু-পাখির রোগ বিস্তৃতির পরিধি এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্নতর হতে পারে। দেশে গবাদি পশু পাখির যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে তা আবশ্যিকভাবে সার্ভিলেন্স এর আওতায় আনতে হবে এবং গবাদিপশুর স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় যেসব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো গ্রহণের কথা বলা হয়ে থাকে সেগুলো অবশ্যই দেশে বিদ্যমান নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক আইন-বিধি, নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের অবস্থা, এই শিল্পসমূহের গতি-বিধি ও লক্ষ্য, সংশ্লিষ্ট ভ্যালু চেইন অর্থনীতি এবং প্রাণিসম্পদ খাতের আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিভিন্ন দপ্তর এবং সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন:

জাতীয় পর্যায়ে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে খামারি পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ক সেবা বিশেষ করে উৎপাদন পর্যায়ে উত্তম চর্চা প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। প্রাণিজাত খাদ্যসামগ্রী (দুধ, ডিম, মাংস, পোল্ট্রি) বাজার ব্যবস্থার সাথে জড়িত জনবলের আচারনগত পরিবর্তনে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যবিধি পালন) ব্যবস্থা নিতে হবে। আর্থিক ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ছোট ও মধ্যম আকারের খামারীদের যারা খাদ্য নিরাপদতায় উত্তম অনুশীলন করেন তাদেরকে প্রণোদনা হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। খাদ্য নিরাপদতা একটি অংশীজনদের দায়িত্ব (Shared responsibility) বিধায় প্রাণিসম্পদ সরবরাহ চেইনের অংশীজন যেমন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা/সরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ফিড মিলার, খামারী, সংগ্রহকারী, মধ্যস্বত্বভোগী, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং বাজারের ব্যবসায়ীসহ সকলের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

———— ০ ————

THE CRUCIAL NEXUS: FOOD SAFETY, HYGIENE AND SANITATION

Dr Sharmin Zaman Emon
Senior Scientist
Centre for Advanced Research in Sciences, University of Dhaka

In the intricate tapestry of our daily lives, few threads are as essential and interconnected as hygiene, sanitation, and food safety. Hygiene and sanitation play a pivotal role in ensuring food safety, a critical aspect of public health. The connection between these elements is undeniable, as poor hygiene and inadequate sanitation practices can lead to the contamination of food, resulting in widespread foodborne illnesses. Maintaining high standards of hygiene in the handling, preparation, and storage of food is crucial to prevent the transmission of harmful pathogens that can cause diseases. From the farm to the table, every step in the food supply chain must adhere to stringent hygiene and sanitation protocols (Kamboj et al, 2020).

Starting at the agricultural level, proper hygiene practices are essential to minimize the risk of microbial contamination. Farmers need to follow good agricultural practices (GAP) to ensure that crops are cultivated in a clean and sanitary environment. This includes using safe irrigation water, employing proper waste disposal methods, and preventing the contamination of soil with human or animal waste (Singh, 2021). Additionally, the use of pesticides and fertilizers should be carefully monitored to avoid residues that could compromise food safety. By maintaining high levels of hygiene on farms, the foundation for safe and uncontaminated food is laid.

As food progresses through the supply chain, including processing, packaging, and transportation, maintaining hygiene becomes even more critical. Food processing facilities must adhere to strict cleanliness standards to prevent the growth and spread of bacteria, viruses, and other pathogens. Cross-contamination is a constant threat, and stringent sanitation measures, such as regular cleaning and disinfection of equipment and surfaces, are imperative (Holm et al., 2022). Hygienic practices should also be observed in the handling of raw and cooked food to prevent the transfer of contaminants. The importance of personal hygiene among food handlers cannot be overstated, as individuals involved in food processing must follow strict hygiene protocols to prevent the spread of infections.

Proper sanitation practices extend beyond the processing facilities to encompass the transportation of food products. Vehicles used to transport food must be regularly cleaned and sanitized to prevent the contamination of goods during transit. Adequate temperature control during transportation is also crucial to inhibit the growth of microorganisms that could compromise food safety. Furthermore, the packaging materials used should be hygienic and free from any potential contaminants that could leach into the food.

Retail establishments, such as supermarkets and restaurants, play a pivotal role in ensuring the hygiene and sanitation of food products before they reach consumers. These establishments must adhere to strict guidelines in the handling, storage, and display of food items. Refrigeration units must be maintained at the appropriate temperatures to prevent the proliferation of bacteria, and the overall cleanliness of the premises should be a top priority. Additionally, food handlers in retail settings must undergo proper training in hygiene practices to minimize the risk of contamination.

Consumers, too, play a crucial role in maintaining food safety through their hygiene practices at home. Proper storage of perishable items, thorough washing of fruits and vegetables, and the use of safe cooking practices are essential to prevent foodborne illnesses. Cross-contamination can occur in the home kitchen if cutting boards, utensils, and surfaces are not adequately cleaned between handling different food items (Byrd-Bredbenner et al., 2013). Furthermore, personal hygiene, such as proper handwashing before and during food preparation, is imperative to

prevent the spread of pathogens. Moreover, demand for transparent information on food labels, including details on the source of products, production methods, and adherence to safety standards, can incentivize businesses to prioritize food safety.

The consequences of neglecting hygiene and sanitation in the realm of food safety are severe and far-reaching. Foodborne infections can cause minor gastrointestinal pain to serious, sometimes fatal disorders. Particularly vulnerable groups include the elderly, small children, and people with compromised immune systems. The economic burden of foodborne diseases is also significant, with costs associated with medical treatment, productivity loss, and the impact on the reputation of food producers and suppliers.

In addition to the immediate health risks, poor hygiene and sanitation practices in the food industry can lead to long-term environmental consequences. Improper disposal of waste, excessive use of pesticides, and contamination of water sources can harm ecosystems and contribute to the degradation of natural resources. Sustainable practices in agriculture and food production, coupled with responsible waste management, are essential to mitigate the environmental impact of the food industry.

On a global scale, the importance of hygiene and sanitation in food safety is underscored by the role they play in preventing foodborne disease outbreaks. The interconnected nature of the modern food supply chain means that a contamination incident in one part of the world can have far-reaching consequences, affecting consumers, businesses, and economies across borders. International collaboration and adherence to global food safety standards are crucial to addressing these challenges and ensuring the safety of the global food supply.

Efforts to promote hygiene and sanitation in the context of food safety are not only the responsibility of governments and regulatory bodies but also require active participation from the food industry, agricultural stakeholders, and consumers. The food industry, including producers, processors, and distributors, must prioritize investments in infrastructure, training, and technology to enhance hygiene and sanitation practices. One such example is the application of Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) systems, which offer a methodical way to recognize and manage any risks in the food manufacturing process (Certa et al., 2018). Training programs for food handlers should be comprehensive and ongoing to ensure that individuals are well-equipped to adhere to hygiene protocols and contribute to overall food safety.

To overcome hygiene and sanitation challenges and ensure food safety, a multifaceted approach is essential. Firstly, widespread awareness campaigns should educate communities on proper food handling, personal hygiene, and sanitation practices. Implementing stringent regulations and regular inspections in food production and distribution channels is crucial. Encouraging the use of modern technologies, such as advanced packaging and storage methods, can also minimize contamination risks. Additionally, investing in infrastructure for clean water supply and waste disposal systems is imperative. Collaboration between governments, industries, and communities is key to establishing a comprehensive framework that addresses hygiene issues at every stage of the food supply chain to create a robust and resilient food safety system, ultimately safeguarding public health.

References:

1. Byrd-Bredbenner, C., Berning, J., Martin-Biggers, J., & Quick, V. (2013). Food safety in home kitchens: a synthesis of the literature. International journal of environmental research and public health, 10(9), 4060-4085.
2. Certa, A., Enea, M., Galante, G. M., Izquierdo, J., & Fata, C. M. L. (2018). Food safety risk analysis from the producers' perspective: prioritisation of production process stages by HACCP and TOPSIS. International Journal of Management and Decision Making, 17(4), 396-414.
3. Kamboj, S., Gupta, N., Bandral, J. D., Gandotra, G., & Anjum, N. (2020). Food safety and hygiene: A review. International Journal of Chemical Studies, 8(2), 358-368.
4. Singh, A. (2021). A review of wastewater irrigation: Environmental implications. Resources, Conservation and Recycling, 168, 105454.
5. Holm, R., & Dunn, D. (2022). Infection Prevention and Control of the Environment. Certified Perioperative Nurse (CNOR®) Review, 261

NECESSITY OF ACCREDITED FOOD TESTING LABORATORIES IN BANGLADESH

Mohammed Abbas Alam
Assistant Director
Bangladesh Accreditation Board

FOOD safety is a scientific discipline describing handling, preparation, and storage of food in ways that prevent food borne diseases. This includes a number of routines that should be followed to avoid potentially severe health hazards.

Food safety has become an important topic as consumers in Bangladesh have become victim of serious adulteration in food. Unfortunately, food contamination and food adulteration are considered to be common occurrences in Bangladesh and food safety is frequently raised in the local media. It is treated as a matter of life and death. Standards are needed so that consumers are provided consumables that embody quality and hygiene. Government should provide with necessary support to maintain the safety of foods.

The constitution of Bangladesh gives importance to food safety. Article 15 states: "it shall be a fundamental responsibility of the state to secure provision of the basic necessities of life including food". Article 18 states: "the State shall raise the level of nutrition and improve public health as its primary duties. Both the Articles imply food safety requirements for consumers and the State should assured this through the enactment of appropriate laws.

To ensure safe and suitable food to consumers, well equipped and resourced food testing laboratories, with trained and skilled manpower are necessary.

In order to ensure access to safe food of suitable quality, properly equipped and resourced laboratories, able to undertake routine food analysis, needs to be established. Such laboratories should be equipped with appropriate laboratory instrumentation and operated by competent and trained analysts, using standard methods and operating under a laboratory quality management system.

Currently a number of Public and Private Laboratories are involved in some form of food analysis activity. These laboratories are operated by different Government Ministries, Agencies and well-known private Companies. The prime laboratories from the public sector are Bangladesh Standards and Testing Institute (BSTI), Central Disease Investigation Laboratory, The Central Food Laboratory , Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR), Armed Forces Food & Drugs Laboratory, Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI), Plant Protection Wing, Atomic Energy Commission, Fish Inspection & Quality Control, Ministry of Food & Disaster Management Laboratory and from the Private sector are Nestle BD Ltd, The ACME Laboratories, SGS BD Ltd, PRAN-RFL Group, ICDDR,B and Advanced Chemical Industries etc.

Laboratories of other agencies involved in some specific food analysis activities include Bangladesh atomic Energy Commission, Fish Inspection and Quality Control Laboratory, The department of Live Stock, The Plant Protection Wing Laboratory, The Central Laboratory of the Department of Public Health Engineering, and the Food and Drug Testing Laboratory of Dhaka Cantonment.

The Food and Agriculture Organization of the United Nations is implementing a comprehensive capacity building project titled Improving Food Safety, Quality and Food Control in Bangladesh. The project is designed to enhance food safety and to strengthen and develop national food control capacity.

I worked on the Food Safety Laboratory networking survey in Food Safety Project as a National Consultant in Food and Agriculture Organization (FAO). During my work I examined the accuracy of information delivered by laboratories. Twenty-Five (25) laboratories were surveyed on information regarding infrastructure, testing activities, laboratory staff, staff qualifications and training, laboratory equipment and instruments, laboratory reagents and chemicals, testing methods, quality assurance and lab accreditation, reporting and record keeping, laboratory waste disposal and linkage with other national and international laboratories and food regulation authorities/institution. The following are the results:

I found 80% laboratories had acceptable infrastructure such as the buildings, electricity, gas and water supply. Most of the laboratories were facing problem of power supply, back up electricity, emergency safety shower, emergency eye wash and emergency exit.

All of the laboratories had different testing activities: Physical testing, Chemical testing and Microbiological testing. Some laboratories were not capable to perform all the tests demanded by customer due to shortage of necessary equipment and lack of expert manpower, and adequate training. Some of the laboratories cannot do as much as is needed because of a lack of expertise.

In the field of quality assurance approximately 20% maintain quality according to national and international standards like accreditation, Proficiency Testing (PT), Inter Laboratory Comparison (ILC) etc.

For waste disposal of microbiological test almost 80% of the laboratories dispose of waste in autoclave. For solid waste disposal and liquid waste disposal most of the laboratories had no waste disposal procedure and stored it in a drum and then buried it and others incinerated. Almost 80% of the laboratories desire is to develop a central waste disposal treatment plant to properly treat waste disposal to save the environment from environmental pollution.

For laboratory networking, all the laboratories show their interest to build up a central laboratory networking data base system so that all the laboratories can get the information on food safety laboratory information, and capable to share their knowledge regarding food testing capacity and they can make a linkage each other for any necessary information.

Food is one of the most vital fundamental rights of the human being. By considering the above situation, to ensure the sound health of people and export, import of food and food products in the global market it is very essential to ensure the quality of food and food testing laboratories. For this, need to develop quality infrastructure, mass awareness, conformity assessment and accreditation. The government can take initiative to develop the better infrastructure by conforming the Standard, Conformity Assessment and Accreditation and central networking database system for ensuring quality of food and food testing laboratories in Bangladesh.

Reference: 1. Bangladesh Constitution
2. Food and Agriculture Organization Website
3. Bangladesh Food Safety Authority Website

———— 0 ————

চটকদার শব্দ-ফাঁদে খাদ্য কিনে প্রতারিত হচ্ছেন না-তো?

মো. শওকত আলী
স্টাফ করেসপন্ডেন্ট
দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে মেহেরপুর সদর থেকে বর্ণ বাজার (Borno Bazar) নামে খোলা একটি পেইজে খেজুরের গুড়ের একটি ভিডিও চোখে পড়লো। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিকে ভিডিওর শুরুতেই বলতে শোনা গেল, 'খেজুরের গুড় ভেজাল প্রমাণে ১ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার। ... ২৪ সেকেন্ডের এই ভিডিওর শেষদিকে বলা হলো- 'আমরা আপনাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, আমরা আপনাদেরকে যে গুড়টা সরবরাহ করছি, এটা হচ্ছে একদম নির্ভেজাল এবং হান্ড্রেড পারসেন্ট পিওর, খাঁটি খেজুরের গুড়।'

বর্ণ বাজারের প্রতিনিধি তার পাশের গুড় জাল করার উত্তপ্ত কড়াই থেকে একটি বাটিতে যখন খেজুরের গুড় নিয়ে চামচ দিয়ে নাড়ছিলেন এবং পিওর, খাঁটি কথাগুলো বলছিলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই চোখ পড়ে তার পেছনে। বেশকিছু খেজুর গাছের পাশে লাকরি স্তূপ করে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে গাছপালার নিচেই উন্মুক্ত পরিবেশে কড়াইয়ের মধ্যে খেজুর গুড় জ্বাল করা হচ্ছে।

যে গুড়টা জ্বাল করার সময় অনায়াসেই পাশ থেকে ময়লা উড়ে এসে বা চুলোর ময়লা অথবা উপরের গাছ থেকে ময়লাযুক্ত পাতা বা ডালপালা কড়াইতে পড়াটাই খুব বেশি স্বাভাবিক।

চারিদিকের ভেজালের ভীড়ে এভাবে গুড় তৈরি করে হয়তো পুরনো দিনের ঢং দেখিয়ে ভোক্তাকে বিমোহিত করা যাচ্ছে, কিন্তু উন্মুক্ত পরিবেশে এভাবে গুড় তৈরি করে সেটাকে পিওর বা খাঁটি বলার সুযোগ কতটুকু তা নিয়ে যথেষ্ট সচেতনতা এবং এই বিক্রেতার জানাশোনারও দরকার রয়েছে।

মোদ্দা কথা পিওর বলতে হলে, খেজুরের রস পরিচ্ছন্ন পাত্রে নিয়ন্ত্রিতভাবে সংগ্রহ করে তার প্রসেসিং পর্যন্ত পরিবেশটা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কোন বিকল্প নেই। যেহেতু এটা একটা খাদ্যপণ্য। এক সময় অবকাঠামোগত পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার কারণে মানুষ উন্মুক্ত পরিবেশে যেভাবে খাবার তৈরি করতো, এখন সেই অবস্থা থেকে বাংলাদেশ অনেকটাই বেরিয়ে এসেছে।

প্রতি বছর শীত আসলেই মানুষের মধ্যে খেজুরের গুড় খাওয়া নিয়ে এক ধরনের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রতিযোগিতায় মানুষকে ঠেলে দেয় এসব ব্যবসায়ীরা। কারণ তারা সঠিক পদ্ধতি না জেনেই পণ্যের মার্কেটিং করছেন বিশুদ্ধতার মোড়কে। ব্যবহার করছেন নানা চটকদার শব্দ। যা আসলে প্রতারণা, যেটাকে শব্দ দিয়ে প্রতারণা বলাটাই বেশি যৌক্তিক।

ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ায় এখন স্কুল পড়ুয়া থেকে বয়োবৃদ্ধ মানুষের হাতে হাতে স্মার্ট ফোন। স্মার্ট ফোনের ব্যাপক প্রসারের সুবাদে এখন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার না করলে নিজেকে দুনিয়া থেকেই বিচ্ছিন্ন মনে হয়। এই সুযোগটা নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। তৈরি হয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা। কোন ব্যবসায়ী যদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের পণ্যের প্রচারণা চালাতে না পারেন তবে তিনি পিছিয়ে পড়ছেন; এই প্ল্যাটফরমে ব্যবসার প্রসারের জন্য কাড়ি কাড়ি টাকাও খরচ করছেন তারা। কেউ লাইভ করছেন, পণ্যের ভিডিও প্রচার করছেন, আবার গ্রামে গিয়ে পণ্য প্রস্তুত করে সেটা খাঁটি প্রমাণের মরিয়া চেষ্টা করে যাচ্ছেন। করোনার পর থেকেই ফেইসবুক, ইউটিউবসহ নানা সামাজিক মাধ্যমে প্রতিনিয়তই চলছে শব্দ ফাঁদের নতুন নতুন কলাকৌশল ও মার্কেটিং। চলছে ভোক্তার সঙ্গে প্রতারণা।

তবে এই ধরনের খাঁটি বা বিশুদ্ধতা, অর্গানিকের মত শব্দ ফাঁদে পা দেয়া মরিয়া গ্রাহকদের ফেরানোর জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বড় ভূমিকা রাখতে পারে। সারাদেশে ব্যাপক প্রচারণার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শোধরাতে পারে ব্যবসায়ীদেরও। যেহেতু প্রতিষ্ঠানটির এখন দেশজুড়ে কর্মকর্তা রয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের এখানে ভূমিকা নেয়াটা জরুরি হয়ে পড়েছে কারণ খাদ্যপণ্য যে যেভাবেই তৈরি করুক সবকিছুতেই ট্যাগলাইন জুড়ে দেয়া হচ্ছে প্রিমিয়াম, অর্গানিক, হালাল, শতভাগ খাঁটি, বিষমুক্ত, ন্যাচারাল, ভেজালমুক্ত.....।

হাজারো ফেসবুক পেজ কিংবা গ্রুপ যেখানে প্রায় সব ধরনের খাদ্যপণ্য বিক্রি করা হচ্ছে। প্রায় সবারই ব্যবসার মূলমন্ত্র হলো এ ধরনের চটকদার শব্দ ব্যবহার করে ভোক্তাদের কাছে এসব খাদ্যপণ্য বিক্রি করা। সাধারণ ভোক্তারা অসচেতন হওয়ার কারণে তাঁদের এসব চটকদার শব্দ ফাঁদে পড়ে এসব পণ্য কিনে প্রতারিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। গণমাধ্যমে নিয়মিতই আসছে এসব প্রতারণার খবর। তবে অনেকে প্রতারণা ছাড়াই ভালো ব্যবসাও করছেন।

আমরা মূলত এসব শব্দ ব্যবহারের কারণে ধরেই নিচ্ছি খাদ্যটি আসলে প্রিমিয়াম কিংবা অর্গানিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশে প্রিমিয়াম, অর্গানিক কিংবা শতভাগ বিশুদ্ধ খাবার বাজারে নিয়ে আসা বেশ দুরূহ এবং ব্যয়বহুলও বটে। যদিও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়াম কিংবা অর্গানিক খাবার বাজারজাত করছে, তবে সেটার সংখ্যা খুবই কম।

অর্গানিক খাদ্যপণ্য বিক্রেতা একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলার সুবাদে জানা গেল, একটা পণ্য অর্গানিক হতে হলে পণ্যটি তৈরির যত ইনগ্রেডিয়েন্ট রয়েছে তার সবগুলোই হতে হবে অর্গানিক। মানে যেসব স্থান থেকে পণ্যটি সংগ্রহ করা হবে সেই স্থানের মাটি, বায়ু ও জমিতে ব্যবহৃত পানি শতভাগ নিরাপদ হতে হবে। এরপরে আসবে উৎপাদিত পণ্য। এই পণ্যে কোন ধরনের কৃত্রিম মেডিসিনের ব্যবহার থাকবে না, ফসল বা ফল, কোথাও না। শুধু যে এই জমিটাই নিরাপদ হলেও হবে না, একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে কোন জমিতে যদি কীটনাশক বা কোন মেডিসিন ব্যবহার করা হয় সেটাও অর্গানিক ফসলের মানদণ্ড পূরণ করবে না।

বাংলাদেশের চাষাবাদের জমিগুলোর যে অবস্থা, তাতে করে অর্গানিক পণ্যের চাষাবাদ করা শুধু দুরূহই না, ব্যয়বহুলও। কারণ চাষের জমিটাকে পুরোপুরিই নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে। এই অবস্থায় যে হারে অর্গানিক পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখা যায় তা আসলে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকেই নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, কারণ এই প্রতিষ্ঠানটিকেই মানুষ এখন নিরাপদ খাদ্যের নিয়ন্ত্রক হিসেবে চিনতে পেরেছে।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে ব্যবসায়ীরা এসব শব্দ ব্যবহার করে শব্দফাঁদ তৈরি করছেন আর সেই ফাঁদেই আমরা পা দিচ্ছি। সেসব প্রতারক ব্যবসায়ীদের পণ্য আমরা বুঝে, না বুঝে কিনে খাচ্ছি। ফলাফল স্বরূপ আমাদের দেহে নানা ধরনের জটিল রোগ দেখা দিচ্ছে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না। এ নিয়ে অবশ্য বিস্তর গবেষণারও দরকার, যেটার ঘাটতি রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ফাংশনাল ফুডস (যেসব খাবারের ঔষধি গুণাগুণ আছে) এর বাজার প্রসারিত হচ্ছে খুব দ্রুত। ফেসবুকে বিভিন্ন পেজে নানা ধরনের ফাংশনাল ফুডস বিক্রি হচ্ছে। যেমনটি আমরা দেখতে পাই হানিনাটস কিংবা সজিনা পাতার ক্ষেত্রে। মিক্সড ফ্রুটস, বিভিন্ন গাছের ডালে বা ফলের গুড়ো-এসব আসলে কোথায় কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে। শুধু বিক্রেতাদের শব্দফাঁদের কৌশলে এই পণ্যগুলো দেদারসে বিক্রি হচ্ছে অনলাইন মার্কেটে। আর এই সুযোগকে ব্যবহার করে প্রতারণা করছে অনেক অনলাইন ব্যবসায়ী।

এভাবে অনলাইন খাদ্য ব্যবসায়ীরা ভোক্তাদের অসচেতনতা কিংবা অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে প্রতারণা করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এভাবে জ্যামিতিক হারে বেড়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো অনলাইন খাদ্য ব্যবসার জন্য দেশে নির্দিষ্ট কোনো সরকারি নীতিমালা নেই কিংবা আইন নেই, যার মাধ্যমে এসব ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আবার যেটুকু নীতিমালা আছে, সেটা জানতে এবং মানতে নারাজ এসব অনলাইন খাদ্য ব্যবসায়ীরা।

তাই কর্তৃপক্ষের উচিত অনলাইন খাদ্যব্যবসা, জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা, যা সব ব্যবসায়ীরা মানতে বাধ্য হবেন। সবচেয়ে বড় বিষয় এখানে কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি মানাতে বাধ্য করতে হবে। তা না হলে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ তো সম্ভবই নয়, বরং দিন দিনই বাড়তে থাকবে।

স্ট্রিটফুড নামক "ভ্রাম্যমাণ মরণফাঁদ" বর্জনের সময় এখনই

নওশিন ফারজানা ইভা
ডায়েটিশিয়ান
ল্যাব এইড হাসপাতাল

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর শুরুতেই আসে খাদ্য যা শুধুমাত্র ক্ষুধা নিবারণ নয় বরং দৈনিক কর্মক্ষমতা, শারীরিক ও মানসিক এককথায় সার্বিক সুস্থতায় অপরিহার্য। এ কারণেই বোধ হয় পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণে পুষ্টিকর খাদ্যের গুরুত্ব বোঝাতে বলেছেন "Let Food Be Thy Medicine and Medicine Be Thy Food."। তবে বর্তমান সময়ে আমরা যে ধরণের খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি তা ঠিক কতটা স্বাস্থ্যসম্মত এ বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কর্মব্যস্ততা, সহজলভ্যতা ক্ষেত্রবিশেষে সঠিক জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবে খাবারের মাধ্যমেই আমরা নিজ দেহে প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছি ক্ষতিকর ও প্রাণঘাতি বিভিন্ন অনুজীবের। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১২ সালে প্রকাশিত একটি তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় তিন কোটির মত মানুষ খাদ্যবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, এমন কি এর ফলে মৃত্যুও ঘটে থাকে। এছাড়া প্রতিদিন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগের অন্যতম কারণও হচ্ছে অনিরাপদ খাদ্য ও পানি।

বর্তমানে বাংলাদেশে স্ট্রিট ফুডের জনপ্রিয়তা ব্যাপক। মুখরোচক এবং সুলভমূল্যের হওয়ায় শিশু থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী, চাকরিজিবি, স্বল্প ও মধ্যম আয়ের বিভিন্ন বয়সের মানুষের কাছেই এসকল খাবার আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। স্ট্রিটফুড সাধারণত রাস্তার পাশে অস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা ফুডকার্ট বা ভ্রাম্যমাণ দোকানগুলোতে পাওয়া যায় ,যা খুব সহজেই দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে আসে, এছাড়া বিশুদ্ধ পানির সুব্যবস্থা এখানে নেই বললেই চলে এবং এসকল স্থানে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বা পরিচ্ছন্নতা মেনে খাবার প্রস্তুত থেকে পরিবেশন নিশ্চিতকরণ প্রায় অসম্ভব। খাদ্য যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে জৈবিক উপাদান সেহেতু সঠিকভাবে (সঠিক তাপমাত্রা, ব্যবহৃত উপকরণের বিশুদ্ধতা, মানসম্মত এডিটিভস বা প্রিজারভেটিভসের ব্যবহার ইত্যাদি নিশ্চিত করে) খাদ্যপ্রস্তুত, পরিবেশন ও সংরক্ষণ না করা হলে, তা যেকোনো ক্ষতিকর জীবাণু বা অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এবং এসকল খাবার গ্রহণের ফলে খাদ্যবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। খাদ্যবাহিত এসকল অণুজীবের মাধ্যমে গ্যাস্ট্রোএন্টারটাইটিস বা প্রদাহ থেকে শুরু করে প্রাণঘাতী নিউরলজিক, হেপাটিক এবং রেনাল সিন্ড্রোম দেখা দিতে পারে।

২০১৩ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র অনুসারে, রাস্তায় বিক্রি হওয়া খাবার, যেমন: সিঙ্গাড়া, ঝালমুড়ি, চটপটি, চিতই পিঠা, জিলাপি, শসা, আমড়া, তেহারি, শরবত ইত্যাদি খাবারে ফুডবর্ন প্যাথজেনের উপস্থিতি দেখা গেছে এবং এসকল প্যাথজেন বিভিন্ন এন্টিবায়োটিকের প্রতি রেজিস্ট্যান্ট যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ ঝুঁকির কারণ হতে পারে। এছাড়া এসকল খাবারে নন-ফুডগ্রেড কেমিক্যাল এডিটিভস যেমন কালারেন্ট এবং প্রিজারভেটিভস, কন্টামিন্যান্ট, পেস্টিসাইড রেসিডিউ এর উপস্থিতিও লক্ষ করা গেছে। জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ২০১৭ পরিচালিত খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক দূষণ ও জীবাণু সংক্রমণ বিষয়ক এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, রাজধানীর ৯০ শতাংশ স্ট্রিটফুড বা রাস্তার খাবারই অনিরাপদ যা ই-কোলাই ও সালমোনেলার মতো মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর জীবাণু বহন করে। এছাড়া বিএআরসি

এর ২০১৯ সালের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকার রাস্তায় প্রাপ্ত ভেলপুরি, পানিপুরি, নুডুলস বিভিন্ন শরবত, ভর্তা ইত্যাদি খাবারে প্রাণীমলে বিদ্যমান কলিফর্ম ও ই-কোলাই ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতি দেখা গেছে যা কিনা ডায়রিয়া, কলেরাসহ নানা স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ।

সুতরাং, টেকসই জীবন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের বিকল্প নেই। অনিরাপদ খাদ্য শুধু স্বাস্থ্য ঝুঁকিরই কারণ নয় এবং জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধির বীজ। এসকল স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে মুক্তি পেতে সবার আগে প্রয়োজন খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক সরকারি/বেসরকারি প্রচারণার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ক শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্য আইন এবং প্রবিধানের যথাযথ প্রয়োগ ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা। পাশাপাশি খাদ্যপ্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণ এর সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, স্যানিটেশন এবং খাদ্যের গুণগতমান বজায় রাখার সম্পর্কিত সহজবোধ্য নীতিমালা, কঠোর প্রবিধান ও তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সড়ক বা ফুটপাতে ভ্রাম্যমাণ বা অস্থায়ী সকল খাবারের দোকানগুলোকে খাবারের মান নিয়ন্ত্রণের খাতিরে সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদন বা তদারকির আওতায় আনতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের বাস্তবতায় স্ট্রিটফুড বা রাস্তার খাবারের বিষয়টি উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। যদিও এই খাদ্য বিক্রিই একটি বিশাল শ্রেণির মানুষের উপার্জনের একমাত্র উপায় কিন্তু রাস্তার খাবারের কারণে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়বে এটাও কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এসব খাবার তৈরি ও পরিবেশন যাতে স্বাস্থ্যসম্মত হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

------------০------------

BATTLING THE SILENT CULINARY CULPRITS: THE CRUCIAL ROLE OF PEST CONTROL IN RESTAURANT KITCHENS

Md Nazmul Islam
District Food Safety Officer
Bangladesh Food Safety Authority, Cox's Bazar

Safe food is the key to building a smart Bangladesh. It is important to raise awareness about pest control issues that directly affect the safety and quality of food. Safe and healthy food is strongly associated with maintaining strict pest control measures, especially in the restaurant business, as we work towards a safer and healthier nation.

Bangladesh's rich culinary heritage, encompassing a wide array of flavors and dishes, is a source of pride for our nation. From the bustling streets of Dhaka to the serene landscapes of the countryside, our small and large restaurants play a pivotal role in bringing people together through the joy of food. However, behind the scenes, a silent threat lurks—pests. In both small eateries and large establishments alike, the presence of pests poses a significant risk to the safety and hygiene of the food we serve. Common pests such as cockroaches, rodents, and flies can contaminate food, spread diseases, and compromise the overall cleanliness of the food preparation areas.

The importance of a robust pest control program cannot be overstated. It is not merely a matter of adhering to regulations; it is about safeguarding public health and ensuring that every meal served is free from potential hazards. Small and large restaurants must recognize the critical role they play in upholding the highest standards of food safety.

Effective pest control measures help prevent the contamination of ingredients, utensils, and food preparation surfaces, ensuring that the final dish is safe for consumption. Moreover, a pest control program can protect the reputation of the food business by maintaining a clean and pest-free environment for a positive dining experience. Maintaining a stellar reputation for hygiene is crucial for attracting and retaining customers.

Adhering to pest control regulations is not just a legal requirement; it is a commitment to maintaining the integrity of

the food service industry and protecting the well-being of consumers. Proactive pest control measures can prevent damage to property and food stocks, ultimately saving on potential financial losses that may arise from pest-related issues.

Pests pose a constant threat to the hygiene and safety of food in restaurants. Implementing robust pest control measures is not only a regulatory requirement but also crucial for maintaining a clean and safe dining environment. Some effective measures to manage pests that can be taken by restaurants include:

1. Regular Inspection and Monitoring: Conducting routine inspections of the entire restaurant premises, focusing on kitchens, storage areas, and dining spaces. Using monitoring devices such as traps, Pest O Flash devices to identify, kill and track pest activity.

2. Maintaining Cleanliness: Ensuring proper waste management and disposal to eliminate potential food sources for pests. Regularly cleaning and sanitizing food preparation areas, utensils, and storage spaces.

3. Sealing Entry Points: Identifying and sealing any gaps or cracks in walls, floors, and windows is another effective way of controlling pests. Installing door sweeps and weather stripping to prevent pests from entering the premises.

4. Proper Food Storing: Storing food items in airtight containers to prevent access by pests. Rotating stock to use older products first (FIFO) and inspecting incoming supplies for signs of pests.

5. Pest-Resistant Construction: Implementing pest-resistant construction practices, such as using pest-resistant materials and ensuring proper ventilation. Regularly check for and repair any structural issues that could attract pests.

6. Staff Training: Training restaurant staff on the importance of maintaining cleanliness and reporting any signs of pests promptly. Educating staff on proper waste disposal practices and the impact of pests on food safety.

7. Integrated Pest Management (IPM): Adopting an Integrated Pest Management approach, combining preventive measures, monitoring, and targeted treatments. Work with professional pest control services to develop and implement an effective IPM plan.

8. Regular Pest Control Services: Schedule regular visits from licensed pest control professionals to assess and address pest issues. Implement preventive treatments to deter pests from infesting the premises.

9. Maintain proper lighting and ventilation: Many pests are attracted to dark, hidden areas. Proper lighting helps make these areas less attractive to pests. Good lighting allows for better visibility during cleaning.

10. Collaboration with BFSA: Collaborate with the Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) to stay informed about regulations and guidelines related to hygiene, sanitation and pest control. Participate in Training programs/ awareness campaigns organized by BFSA to promote best practices in pest management.

Let us collectively reinforce the importance of effective pest control programs in both small and large restaurants. By doing so, we contribute to a smarter, healthier Bangladesh where every meal is a celebration of safety, quality, and well-being.

———————— 0 ————————

HARMONY IN SUSTENANCE; FOOD BUSINESS OPERATOR'S PLEDGE TO FOOD SAFETY

Sk. Md. Ferdous Arafat
Law Officer
Bangladesh Food Safety Authority

In the perplexing embroidery of our daily lives, woven with the symphony of sustenance and shared moments, the significance of the food industry emerges as undeniable. At the heart of this expansive domain stand the Food Business Operators (FBOs), the custodians of nourishment, taste, and culinary experiences. Beyond the flavors and aromas that tantalize our senses, FBOs bear a profound duty; a duty that transcends mere commerce. Their responsibility extends to the very essence of our well-being, as they navigate the complexities of ensuring food safety, transparency, and ethical practices. This essay embarks on a journey to unravel the multifaceted duties of Food Business Operators, exploring the intricate web of responsibilities that define their role in shaping the integrity and sustenance of our global food supply chain.

The foundational duty of FBOs as the Food Safety Act, 2013 mentions revolve around the assurance of food safety and quality. Each morsel that graces our plates, each sip that quenches our thirst, carries with it an implicit trust, a trust that FBOs must uphold by adhering to stringent hygiene standards, rigorous quality control measures, and unwavering compliance with food safety rules & regulations. Their duty lies not only in producing food but in ensuring that every element of the production process, from farm to fork, aligns with the highest standards of safety.

Transparency, the second pillar of their responsibility, unfolds in the labels and packaging that adorn the products on our shelves which is strongly stated in packaged Food Labelling Regulations, 2017 by Bangladesh Food Safety Authority. Consumers, armed with the right to make informed choices, rely on FBOs to provide accurate and clear information regarding ingredients, nutritional content, and potential allergens. In this era of conscious consumerism, the duty to be transparent becomes a linchpin, connecting the producer to the consumer in a bond of trust and mutual understanding.

Yet, the duties of FBOs extend beyond the confines of production and labeling. Food Safety (Chemical Contamination, Toxins, Harmful Residues) Regulations, 2017 and related other Rules and Regulations stands as the sentinel for FBOs for their benefit & welfare for FBOs to enhance & consolidate their competency. Ethics, a guiding light in their responsibilities, compels them to embrace fair treatment of employees, ethical sourcing of raw materials, and the creation of a working environment that reflects respect and integrity. Their duty, in this context, transcends profit margins, weaving into the fabric of sustainability and responsible corporate citizenship.

Compliance with food safety regulations stands as a non-negotiable duty for FBOs. Governments and regulatory bodies and strongly including Bangladesh Food Safety Authority set forth guidelines to safeguard public health and maintain the integrity of the food supply chain. FBOs, as custodians of public trust, must not only comply but also stay vigilant, constantly adapting to evolving standards and subjecting themselves to regular inspections to ensure safe food for the nation.

In the globalized tapestry of the food industry, FBOs encounter an additional layer of responsibility—the duty to navigate international standards & regulations. As food products traverse borders, FBOs must possess a comprehensive understanding of global food safety and quality standards, ensuring seamless trade while meeting the diverse requirements of different markets.

Traceability emerges as a crucial aspect of their duties, gaining prominence in the context of food safety and consumer preferences. The ability to trace the origin of ingredients or products throughout the supply chain becomes instrumental in rapid response during contamination or outbreaks. FBOs must implement traceability systems that enable quick identification and removal of compromised products, safeguarding both public health and the reputation of the industry.

Environmental sustainability stands as a duty that FBOs, in contemporary times, cannot afford to ignore. The impact of food production on the environment, from resource consumption to waste generation, prompts a call for eco-conscious practices. FBOs must adopt sustainable sourcing, reduce waste, and implement eco-friendly packaging, contributing to the broader goal of creating a sustainable and resilient safe food system.

Collaboration, both within the industry and beyond, unfolds as a duty that transcends individual business interests. FBOs collaborate with regulatory agencies, industry associations, and various stakeholders to exchange knowledge, best practices, and to collectively address challenges such as emerging threats, technological advancements, and evolving consumer preferences.

The same duty also goes to Bangladesh Food Safety Authority to coordinate all the related Government agencies & those who were working with this grand duty more coordination will make more strong food safety which ensure a healthy and safe environment for food.

Educating and training personnel involved in food handling becomes a crucial duty, complementing the broader responsibilities of FBOs. Well-trained staff are essential for implementing food safety protocols, maintaining hygiene standards, and ensuring compliance with regulations. FBOs must invest in ongoing training programs to equip their workforce with the necessary skills and knowledge, fostering a culture of responsibility and awareness within their organizations.

In the grand landscape of gastronomy, Food Business Operators emerge not just as architects of culinary delights but as patrons of health, integrity, and sustainability. Their duties, woven intertwined into the fabric of our daily lives, extend far beyond profit margins and market shares. They are entrusted with the noble task of nourishing bodies, minds, and communities. From the meticulous scrutiny of production processes to the ethical treatment of stakeholders, and from compliance with regulations of Food Safety to the pursuit of environmental sustainability, FBOs stand at the crossroads of responsibility and innovation.

As we reflect on the duties of Food Business Operators, it becomes evident that their role is not merely transactional; it is transformational. They hold within their grasp the power to shape not only the flavors on our plates but also the very foundations of a healthy and sustainable future. Each decision they make, each practice they adopt, resonates far beyond the confines of their establishments, influencing the well-being of individuals and the resilience of the entire food industry.

In concluding this exploration of their versatile duties, let us acknowledge the profound impact FBOs have on our lives. The duty they bear is not a burden but a privilege—a privilege to contribute to the alimentation, joy, and well-being of individuals and communities. As we savor the fruits of their labor, let us also recognize and appreciate the diligence, perseverance, responsibility, and innovation embedded in their duties. In the symphony of culinary experiences, Food Business Operators compose a melody of health, trust, and sustainability—a melody that resonates long after the last bite is savored.

———— 0 ————

খাদ্য সরবরাহ পরিসেবা (Food Delivery Services): সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য সমাধান।

এস এম শিপন
গবেষণা কর্মকর্তা (গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা)
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের তরুণ এবং মধ্যবয়সী মানুষের মধ্যে বাইরের খবার (Take-Away Food) খাওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশের ৪২.৬৮% (TBS News, 2023) মহিলা বিভন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকায় তারা রান্না-বান্নার কাজে নিয়মিত সময় ব্যয় করতে পারছেন না বা রান্না-বান্না থেকে আগ্রহ হারাচ্ছে। একারণে বিভিন্ন প্রকার খাবার সরবরাহকারী সেবার (Food Delivery Services) মাধ্যমে ভোক্তা খাবার কিনে খাচ্ছে। যদিও ডোরস্টেপ ডেলিভারির সুবিধা ভোক্তার ডাইনিং এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে তথাপি এক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপদতার বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই নিবন্ধটি মূলত হোটেল- রেস্তোরাঁ থেকে রান্নাকরা খাবার সরবরাহ পরিসেবাসমূহের নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলো অন্বেষণ করবে, সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করবে এবং রেস্তোরাঁর রান্নাঘর থেকে ভোক্তার টেবিলে খাবারের নিরাপদ বিতরণ নিশ্চিতের ক্ষেত্রে সমাধানের প্রস্তাব করবে।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণঃ

খাদ্য সরবরাহ পরিসেবাসমূহের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো বিতরণ করা খাবারের সঠিক তাপমাত্রা বজায় রাখা। উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকির খাবারসমূহের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ করার জন্য তাপমাত্রার একটি নির্দিষ্ট ব্যাপ্তি (৪°C এর কম এবং ৬০°C এর বেশি) বজায় রাখা প্রয়োজন। রেস্তোরাঁ থেকে গ্রাহকের অবস্থান পর্যন্ত পরিবহণের সময় তাপমাত্রার উঠানামা করার সুযোগ থাকে। এ সময় গরম খাবারকে গরম এবং ঠান্ডা খাবারকে ঠান্ডা রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ যা ডেলিভারি পরিসেবাগুলোকে অবশ্যই সমাধান করতে হবে।

সম্ভাব্য সমাধানঃ

বিশেষায়িত প্যাকেজিং (Gel packs, water blankets, insulated coolers) এবং থার্মাল ব্যাগ ব্যবহার করে তাপমাত্রা সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জসমূহ প্রশমিত করা যেতে পারে।

- এছাড়া সরবরাহের সময় ডেলিভারি রুট (route) পরিবর্তন করে যতটা সম্ভব কম দূরত্বের রাস্তা ব্যবহার করে পরিবহণের সময় কমানো যায়, যা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সহায়ক হবে।

পারস্পারিক-দূষণ (Cross-Contamination)

সরবরাহের সময় Cross-Contamination এর মাধ্যমে ক্ষতিকর জীবাণু এক খাবার থেকে অন্য খাবারে স্থানান্তরিত হতে পারে যা ফুড ডেলিভারি পরিসেবার জন্য একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়ায়। খাদ্য সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি একই সাথে একাধিক অর্ডার সরবরাহ করে থাকেন। এক্ষেত্রে যদি সঠিক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা না হয় তবে অনিচ্ছাকৃতভাবেও অনেকসময় Cross-Contamination হতে পারে। একই ডেলিভারি গাড়িতে কাঁচা এবং রান্না করা খাবার একত্রে পরিবহণ করলে দূষণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

সম্ভাব্যঃ

নিষ্পত্তিযোগ্য গ্লাভস (disposable gloves) ব্যবহার, নিয়মিত হাত ধোয়া এবং ট্রানজিটে কাঁচা ও রান্না করা খাবার আলাদাকরাসহ ডেলিভারি কর্মীদের জন্য কঠোর স্বাস্থ্যবিধি প্রোটোকল প্রয়োগ করা হলে ক্রস-দূষণের ঝুঁকি অনেকটা প্রশমিত করা সম্ভব্য।

প্যাকেজিং উদ্বেগঃ

খাদ্য সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত প্যাকেজিংয়ের ধরণ খাদ্য নিরাপদতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপর্যাপ্ত প্যাকেজিংয়ের কারণে খাদ্যের গুণগতমান এবং নিরাপদতা নষ্ট হতে পারে। অধিকন্তু, ক্ষতিকারক রাসায়নিক যুক্ত অথবা পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী এমন প্যাকেজিং সামগ্রীর ব্যবহার নিয়ে ইতোমধ্যে উদ্বেগ দেখা গেছে।

সম্ভাব্যঃ

- খাদ্য সরবরাহকারী পরিসেবাসমূহকে উচ্চমানের, ফুটো প্রতিরোধী (leak preventive) এবং পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিংয়ে আগ্রহী হতে হবে।
- প্যাকেজিং সামগ্রীর সঠিক ব্যবহার এবং নিষ্পত্তি (disposal) সম্পর্কে ভোক্তাদের শিক্ষিত করা টেকসই এবং নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

খাদ্য অ্যালার্জেন ব্যবস্থাপনাঃ

ফুড অ্যালার্জি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ভোক্তার অ্যালার্জিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দ্রুত গতির খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে রেস্তোরাঁ কর্তৃক ডেলিভারি কর্মী এবং ভোক্তাকে অ্যালার্জেনের ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। Take Away খাবারের ক্ষেত্রে রেস্তোরাঁ থেকে খাবার সরাসরি ভোক্তা পর্যায়ে পরিবহন করা হয়। এক্ষেত্রে প্যাকেজিং করা গেলেও লেবেলিং করা সম্ভব হয় না। সুতরাং উক্ত খাবারে কোনো অ্যালার্জেন আছে কি-না তা ভোক্তা পর্যায়ে জানানো সম্ভব হয় না।

সম্ভাব্যঃ

- রেস্তোরাঁ, ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম এবং গ্রাহকদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম তৈরি করা অ্যালার্জেন সম্পর্কে অবগত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- ভোক্তা কর্তৃক খাবার অর্ডার করার সময় তার কোনো খাবারে অ্যালার্জি আছে কি-না তা অবগত করা এবং তাদের অর্ডারের অবস্থার রিয়েল টাইম আপডেট প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগত সমাধান অ্যালার্জেন ব্যবস্থাপনায় সহায়ক হতে পারে।

ডেলিভারি কর্মীদের প্রশিক্ষণঃ

ডেলিভারি কর্মী কর্তৃক খাবারের সঠিক পরিচালনা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত নির্দেশনাসমূহ সঠিকভাবে মেনে চলার জন্য কর্মীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

সম্ভাব্যঃ

খাদ্য নিরাপদতা, গ্রাহক মিথস্ক্রিয়া এবং Emergency response সংক্রান্ত মডিউলসহ ডেলিভারি কর্মীদের জন্য চলমান প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের কাজ ফলপ্রসু করা যাবে।

খাদ্য সরবরাহ পরিসেবাকে আইনের আওতায় আনাঃ

খাদ্য ডেলিভারি সেবাসমূহকে একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক সংস্থার অধীনে পরিচালিত করতে হবে। খাদ্য সরবরাহ পরিসেবার জন্য খাবার পরিবহন ও সংরক্ষণ পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত আইন ও বিধি সমূহ সঠিকভাবে প্রতিপালন করা চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়। সময়মত খাবার সরবরাহ এবং বিধি-বিধান প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে একটি সুক্ষ ভারসাম্য প্রয়োজন, যা অনেক ডেলিভারি পরিসেবার জন্য কঠিন হয়ে যায়।

সম্ভাব্যঃ

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা, নিয়মিত অডিট করা এবং জড়িত সকল স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে উক্ত চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করা সহজতর হবে। তবে আশার কথা হলো বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে খাদ্য সরবরাহ পরিসেবাসমূহকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

রিয়েল টাইম মনিটরিং এবং ট্রেসএবিলিটিঃ

ডেলিভারি প্রক্রিয়ায় খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিত করার জন্য রিয়েল টাইম মনিটরিং এবং ট্রেসেবিলিটি প্রয়োজন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ডেলিভারি প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে খাবারের অবস্থান, তাপমাত্রা এবং অর্ডারটি কিভাবে ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে তা ট্র্যাক করা।

সম্ভাব্যঃ

জিপিএস ট্রাকিং, টেম্পারেচার সেন্সর এবং ব্লকচেইনের মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে রিয়েল টাইম মনিটরিং এবং ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করা যেতে পারে।

জনসচেতনতা ও শিক্ষাঃ

ভোক্তা সচেতনতা খাবার সরবরাহ শিল্পে খাদ্য নিরাপদতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিরাপদ খাবার পরিচালন পদ্ধতি, মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ বুঝতে পারা এবং খাদ্যঝুঁকি সম্পর্কে ভোক্তাদের শিক্ষিত করতে পারলে নিরাপদ ফুড ডেলিভারি সিস্টেম চালু রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু এ সংক্রান্ত বিষয়ে সকল ভোক্তাকে শিক্ষিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সম্ভাব্যঃ

খাদ্য সরবরাহকারী প্লাটফর্মগুলোকে জনসচেতনতা প্রচারে বিনিয়োগ করতে হবে এবং নিরাপদ খাদ্যের সর্বোত্তম অনুশীলন এবং নিরাপদ খাবার বিতরণে তাদের অবদান সম্পর্কে ভোক্তাদের অবগত করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, খাদ্য সরবরাহকারী প্লাটফর্মসমূহ ব্যবসা এবং দায়িত্বের সংযোগস্থলে অবস্থান করছে। যদিও এই পরিসেবাসমূহের উত্থানের কারণে আমাদের খাবার খাওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছে তবে অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা অপরিহার্য। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ শিল্প এই চ্যালেঞ্জসমূহ অতিক্রম করতে পারে এবং ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ এবং উপভোগ্য খাবারের সরবরাহ চালিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এবং সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করণে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ

The Business Standard (2023), "অধিক মহিলা কর্মক্ষেত্রে যোগদান করছেন" প্রকাশকাল ২৯ মার্চ, ২০২৩; https://www.tbsnews.net/bangladesh/more-women-joning-workforce-607426

———— 0 ————

TRACEABILITY: AN APPROACH IN THE SUPPLY CHAIN FOR SAFE FOOD

Shahriar Ahmed
Regulatory Affairs Associate
Unilever Consumer Care Limited

Traceability in the food supply chain is a critical component of ensuring food safety, quality, and accountability. It involves the ability to track and trace the movement of food products and their ingredients from their origin through various stages of production, processing, distribution, and retail until they reach the consumer. The primary goal of traceability is to ensure the safety and quality of food products, prevent foodborne illnesses, and respond effectively to recalls or contamination incidents. Food traceability is important for several reasons as it plays a crucial role in ensuring the safety, quality, and transparency of the food supply chain.

Why Traceability is Important?

Food safety: Traceability plays a pivotal role in identifying the source of contamination or foodborne illnesses enabling swift actions to prevent further spread and protect public health.

Quality Assurance: Assuring the quality by tracing the journey of a food product. Stakeholders can monitor and maintain product quality ensuring that it meets the established standards and expectations.

Consumer Confidence: Traceability enhances transparency in the supply chain and increases consumer trust in food products or brands as they can access information about the origin and handling of the purchased products.

Regulatory Compliance: Like many other countries, Bangladesh have strict regulations in place that mandate traceability as a part of food safety requirements.

Food Traceability: Global Regulatory Aspects

Compliance is not only a legal necessity but also an ethical responsibility. Several countries and regions have established regulations and guidelines related to traceability in the food supply chain. For example, in the United States the *Food Safety Modernization Act (FSMA)* places a significant emphasis on traceability requiring food businesses to establish systems that can trace the source of contaminated products within 24 hours. *EU regulations* mandate traceability at all stages of the food supply chain with specific requirements for labeling, record-keeping and information sharing among suppliers. *The Safe Food for Canadians Act* in Canada outlines traceability requirements for various food commodities with a focus on rapid recall and risk assessment. *Food Safety and Standards (Food Recall Procedure) Regulation, 2017* in India describes the guidelines for FBO's to recall the food from the market. One of the key frameworks and initiatives related to traceability in the food industry is the *Global Food Safety Initiative (GFSI)*; a collaborative platform created by food industry stakeholders to establish a harmonized approach to Food Safety Management Systems (FSMS) and reduce food safety risks globally. GFSI benchmark standards often include specific requirements related to traceability. These requirements can encompass documenting, product movements, labeling, batch identification, and record keeping facilitating product traceability. Compliance with GFSI Benchmark standards can help meet these regulatory requirements to extend a little bit more about regulatory compliance.

Food Traceability: Local Regulatory Aspect

Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) published the Recalling of Substandard, Hazardous and Toxic Substances Containing Food Regulation, 2021 to serve the purpose of Food Safety Act 2013 and public health concern. According to this regulation, subjects to take as a concern for recalling the foods from the supply chain are as follows: 1) If the food doesn't meet the national standard or any standard defined by the BFSA or containing toxic or non-permitted, excessive limit of chemicals or microorganisms or harmful microorganisms or any other food hazard. 2) Any kind of misinformation regarding the food, i.e. allergens, antibiotics, GMO etc. which may create health risks for the consumer. 3) Any kind of technical or process deviation which may cause the food to be unsafe for consumption or may pose health risk. Food Business Operator (FBO's) is responsible for tracing the product and recall within 2 (two) working days and communicating where necessary. This is why it's important that FBO's should have an established method for traceability and recall plan to comply with the regulation.

Establishment and Maintenance of an Effective Traceability System: Procedures and Documents Required

1. **Supplier approval and verification procedures:**
   - -Document supplier evaluation criteria including quality and traceability standards.
   - -Maintain records of approved suppliers and their contact information.
   - -Establish procedures for periodic supplier audits and inspections.
2. **Incoming goods inspection:**
   - -Develop procedures for inspecting incoming raw materials and products.
   - -Record information such as supplier details, lot numbers and inspection results.
   - -Implement a quarantine process for non-conforming items.
3. **Inventory control and management:**
   - -Maintain an inventory management system that tracks product movement within the facility
   - -Record product receipt, storage and dispatch details including dates and quantities.
   - -Implement a First In First Out (FIFO) and/or First Expired First Out (FEFO) inventory rotation system
4. **Batch or lot numbering:**
   - -Assign unique batch or lot numbers to each production run.
   - -Document the production date expiration.
   - -Date and ingredients used for each batch.
   - -Maintain records of batch production including any adjustments or deviations.
5. **Product labels and packaging:**
   - -Develop labeling procedures that include traceability information i.e. batch number and date codes.
   - -Ensure accurate labeling of allergen information and nutritional facts.
   - -Retain samples of product labels and packaging for reference.
6. **Production records:**
   - -Maintain detailed production records including recipes, formulations, and processing steps.
   - -Record the start and end times of each production run.
   - -Document any deviations from Standard Operating Procedures (SOPs).

7. **Distribution and shipment records:**

-Keep records of products shipped to customers including shipment dates and quantities.

-Document the vehicle and driver information for each shipment

-Implement procedures for verifying the condition of products upon receipt by customers.

8. **Recall and traceability testing:**

-Establish procedures for conducting traceability tests and mock recalls.

-Document the results of traceability.

-Tests and evaluates the effectiveness of recall procedures.

9. **Document retention and archiving:**

-Define a document retention policy for maintaining records for a specified period

-Ensure secure storage of records to prevent loss or tampering.

10. **Regulatory compliance documentation**

-Maintain records of compliance with relevant food safety regulations and standards.

-Keep copies of permits certifications and inspection reports.

11. **Training and competency records:**

-Document employee training on traceability procedures and food safety practices.

-Maintain records of employee qualifications and competencies.

12. **Incident and complaint handling:**

-Develop procedures for handling customer complaints and incidents.

-Document investigations corrective actions and preventive measures taken.

13. **Supplier and customer communication:**

-Keep records of communication with suppliers and customers regarding product information, recalls and quality issues.

14. **Technology systems:**

-implement traceability software or systems to automate data capture and retrieval processes.

-Ensure data integrity and regular system backups by implementing these procedures and maintaining the associated documents.

-Introduction of blockchain technology to build the modern era of food traceability system.

Food businesses can establish and maintain an effective traceability system that enhances food safety, quality, and compliance throughout the supply chain. It's important to adapt these procedures to meet specific regulatory requirements and the unique needs of an organization. Regular Audits and reviews can help ensure the effectiveness of the traceability system. Traceability is a cornerstone of food safety and quality in the modern food supply chain. It not only helps protect public health but also ensures the integrity of the products we consume. Traceability is not just a theoretical concept but a practical necessity for ensuring food safety and quality in today's globalized food supply chain.

———————— 0 ————————

THE ROLE OF PACKAGING: A FOOD SAFETY PERSPECTIVE

Nazimul Islam
General Manager
Product Development & Quality Control, ACI Foods Ltd & Rice Unit

Food is basically composed of moisture, protein, fat, carbohydrate or sugar, Vitamins and minerals. The above-mentioned elements in food are the source of energy and make food essential for life. At the same time, they also make food accessible or vulnerable to microorganisms. packaging not only plays a significant role in maintaining the quality of the food by preventing it from bacterial contamination but is also essential for providing the quality food to the consumers. Packaging of food protects the food products from physical, chemical and biological deterioration and also makes it easier to transfer and keep for a longer time. The basic properties necessary for the packaging materials are as given in figure:

In addition to preservation, food packaging used for containing the food provides information about the ingredients and nutritional values of its contents and provide convenience for consumers such as easy opening.

What materials are used?

Packaging materials come in different shapes and have various functions. It is essential for the packaging material to have a balance between its shape and its function. Selection of the ideal packaging material for a certain type of food depends on the functions that the packaging should serve.

- There are various forms of metal food packaging, such as cans, tubes, containers, films, caps, and closures.
- There are two types of glass packaging most widely used for foods and drinks: narrow-neck bottles and wide-opening jars and pots.

- Wood is used for crates and kitchen tools.
- Paper is usually used for temporary food containment and protection due to its high permeability and inability to be sealed with heat. Paper is sometimes used as a part of multilayer structures.
- Plastics/ flexible packaging are the most common and most wide-ranging materials used for food packaging.

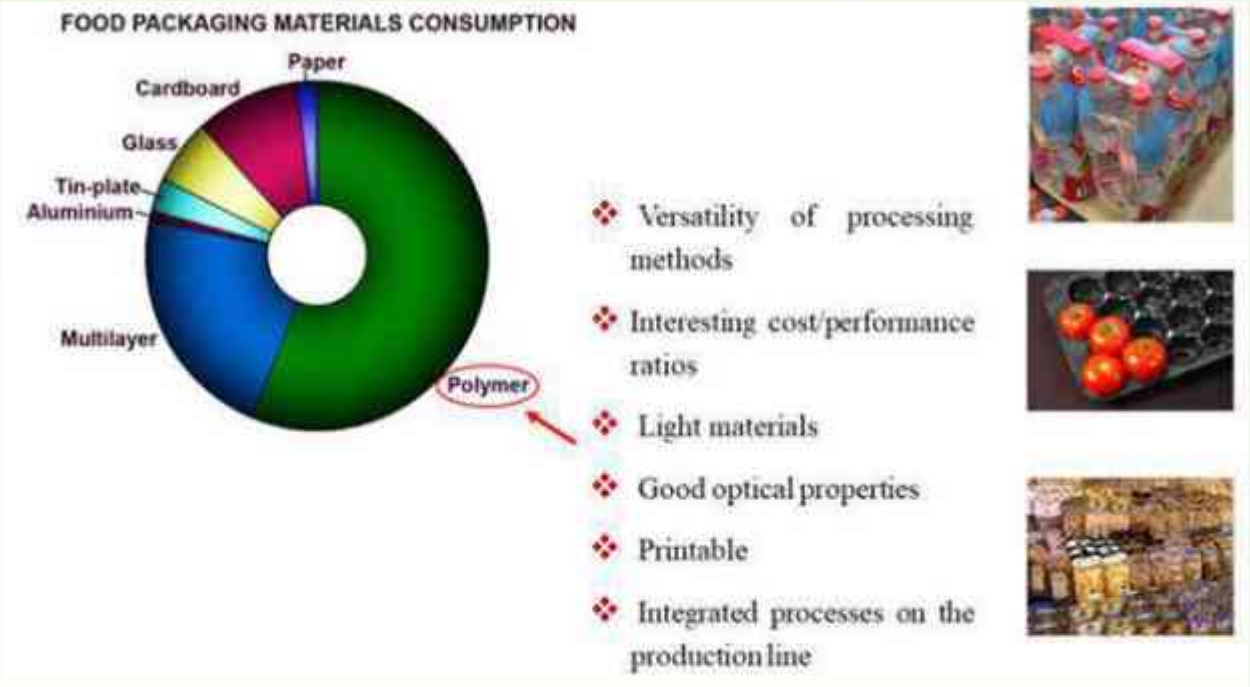

Migration from packaging materials from food

The migration phenomenon in packaged foods may happen in two directions simultaneously, i.e., from packaging material to the food product and vice versa. In the former case, the molecularly diffused low-molecular weight substances such as additives and oligomers from the packaging films are transferred into the foods. In the latter scenario, the mass transfer of food color, aroma, flavor, and nutrients happens from the food product to the packaging and results in a strong impact on the organoleptic properties. So, presently solvent less or biodegradable packaging materials are recommended to use food packaging. The polymer packaging and food interface suggesting chemical migration is diagrammed in Fig.

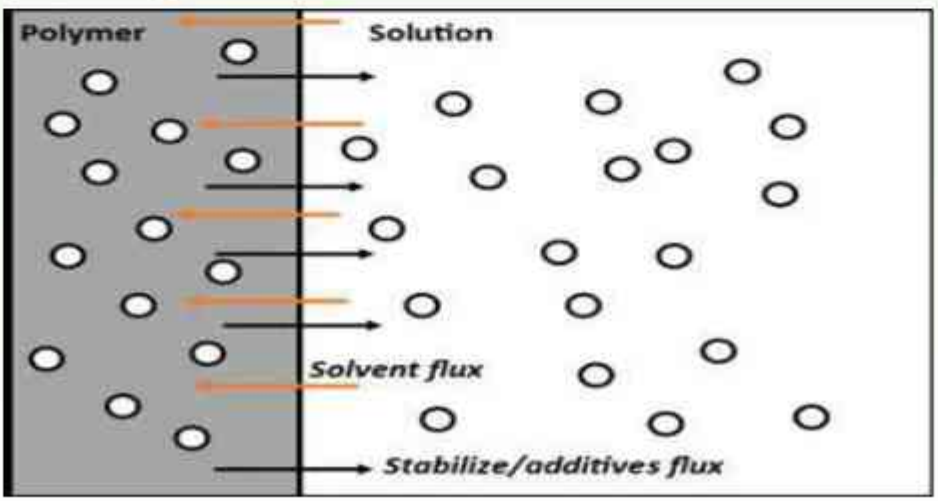

Proper food packaging is about waste reduction

Apart food safety, we can also reduction food waste by developing proper packaging materials based on product characteristic. Food packaging's impact on the environment must consider the positive benefits of reduced food waste throughout the supply chain. Significant food wastage has been reported in many countries, ranging from 25% for food grain to 50% for fruits and vegetables. Inadequate preservation/protection, storage, and transportation have been cited as causes of food waste. Packaging reduces total waste by extending the shelf-life of foods, thereby prolonging their usability.

Slow poisoning by using newspaper or used paper to pack street foods

From village to town, newspaper, used paper and recycle poly is extensively used in Bangladesh to serve the street food. Since all are made by recycling materials, so food may be contaminated with metallic contaminants and harmful chemicals through packaging migration system which can cause digestive problems and also lead to severe toxicity.

Newspapers should not be used to wrap, cover, and serve food or to absorb excess oil from fried food. There is an urgent need to discourage the use of newspapers as a food packaging material by creating awareness among businesses, especially unorganized food business operators and consumers on its harmful effects.

The chemicals used in those inks is harmful to health. As the food items gets mixed with the chemicals that is present in the paper. The toxic substance can affect the brain and other organs. It can even lead to Cancer depending up on where the toxic substance reaches and get stored in the body.

Usually, these chemicals are acts as a slow poison and doesn't immediately affect the body. But it gets accumulated in our body as an unfiltered waste and will have most serious effect all at once.

Initiatives by Bangladesh Food Safety Authority (BFSA)

Bangladesh Foods Safety Authority (BFSA) has taken some great initiatives related to street food packaging which were highly appreciated. They circulated general notices with pictorial instructions and visited street food market frequently. Due to these initiatives the mass people are now aware about the importance of food packaging. Declaration of Nutrition facts, allergen substances, Ingredients and packaging material composition are very significant to ensure food safety. Bangladesh Food safety authority is doing some remarkable activities to ensure the implementation of this.

How it's done at ACI Foods Limited

ACI Foods Ltd is a Food Safety Management System (FSMS) ISO 22000:2018 certified company. That's why all production process lines in the company are operated based on HACCP and GMPs standards. Food grade packaging materials are used and all packaging guideline are properly maintained for ensuring food safety and meet consumers requirements.

ACI Foods Laboratory has been enlisted in BFSA's laboratory information repository. This Laboratory can be used by any company in Bangladesh to ensure safe food by performing physical, chemical, and microbiological tests with professional foods and chemical technologists.

—————— 0 ——————

ফটো স্টেশন

শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৯'- এর শুভ উদ্বোধন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা।

পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করার লক্ষ্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত 'পারিবারিক নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৯' উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২১' এর উদ্বোধন ও দিক্-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা।

বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা মিলনায়তনে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২২'- এর উদ্বোধন ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি।

রাজধানীর বিআইআইএসএস অডিটোরিয়ামে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩'- উদ্বোধন ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি।

নোয়াখালী জেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে 'স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা' বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন খাদ্যসচিব ও বিএফএসএ চেয়ারম্যান।

রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ আইএফসি কর্তৃক আয়োজিত '১০ম আন্তর্জাতিক ফুড সেফটি ফোরাম'-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

২২ জুন ২০২৩ তারিখে রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও এ আয়োজিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা'- শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন।

আইএফসি কর্তৃক আয়োজিত '১০ম আর্ন্তজাতিক ফুড সেফটি ফোরাম'-এ প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি।

'Harmonization of Food Safety Standard and Regulations of Bangladesh' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মাহবুব হাসান, সম্মানিত মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

নিরাপদ ইফতার প্রস্তুত ও বিক্রয়ের লক্ষ্যে রাজধানীর সাত মসজিদ রোড এলাকায় ব্যবসায়ীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের শুভেচ্ছাদূত ও মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ফেরদৌস আহমেদ, এমপি।

খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগ ও পরামর্শ থাকলে কল করুন টোল ফ্রি ১৬১৫৫ নাম্বারে

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি জনসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচারের লক্ষ্যে শুভেচ্ছাদূত হিসেবে নিয়োগলাভের পর গণমাধ্যমের সাথে কথা বলছেন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক ও মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ফেরদৌস আহমেদ, এমপি।

রাজধানীর চকবাজার এলাকায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে 'নিরাপদ ইফতার'-শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে উপস্থিত ছিলেন বিএফএসএ শুভেচ্ছাদূত ও মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ফেরদৌস আহমেদ, এমপি।

২৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. দৈনিক সমকাল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "নিরাপদ খাদ্য: আন্তসংস্থা সমন্বয় ও চ্যালেঞ্জ" শিরোনামে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

বিএফএসএ প্রশিকক্ষে আয়োজিত 'Advocacy Workshop on Co-ordination in Enforcement and Monitoring of Market and Food Establishment'- শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

খাদ্য নিরাপদতা ও টেকসই খাদ্য উৎপাদনে দুই দেশের অংশীদারত্বকে আরও জোরদার করতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও ডেনিশ ভেটেরেনারি এন্ড ফুড এডমিনিশট্রেশন।

খাবার প্রস্তুতকালে নিরাপদতার মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সেন্টমার্টিন দ্বীপের বিভিন্ন খাদ্যকর্মীদের মধ্যে এপ্রোন, গ্লাভস ও ক্যাপ বিতরণ করেন জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

খাদ্যপণ্য রপ্তানি সহজীকরণের লক্ষ্যে ই-হেলথ সার্টিফিকেশন সিস্টেমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান ও অন্যান্যরা।

'Inception Workshop and Award Giving Ceremony'- তে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ফলপ্রসূ গবেষণার জন্য গবেষকদের নিকট চেক হস্তান্তর করেন জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

এমিরেটিস অধ্যাপক ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ এবিএম আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে পাঠ্যপুস্তকে নিরাপদ খাদ্যের অর্ন্তভুক্তির জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সভার কার্যক্রম চলাকালে।

সাতক্ষীরা জেলায় নিরাপদ মধুর উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক জনসচেতনতামূলক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

'পবিত্র মাহে রমজানে নিরাপদ ইফতার প্রস্তুত, বিক্রয় ও পরিবেশন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুর কাইউম সরকার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর ২০২৩-২৪' অনুষ্ঠানে গাজীপুর জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার-এর নিকট চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখানোর জন্য জনাব মোখলেসুর রহমান, সাতক্ষীরা জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার-কে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২৩ প্রদান করছেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

শাহবাগে অবস্থিত জাতীয় জাদুঘরের এর সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মুল্যায়নকৃত খাদ্যস্থাপনার গ্রেড প্রদান অনুষ্ঠানে একজন প্রতিনিধির নিকট গ্রেডিংযুক্ত স্টিকার প্রদান করছেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্যস্থাপনায় গ্রেডিং প্রদান বিষয়ক সেমিনারে গ্রেডিংপ্রাপ্ত খাদ্যস্থাপনার প্রতিনিধির নিকট এ+ যুক্ত স্টিকার হস্তান্তর করছেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে মাস্তুল ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মাস্তুল স্কুল ও এতিমখানায় অবস্থানরত বাচ্চাদের মধ্যে নিরাপদ খাবার বিতরণ ও হাত ধোয়া প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

১৪ ডিসেম্বর 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএফএসএ'র অন্যান্য কর্মকর্তারা।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও জাইকা'র ভূমিকা শীর্ষক সভা শেষে জাইকা প্রতিনিধির নিকট শুভেচ্ছাস্মারক তুলে দিচ্ছেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত "পর্যটন বিকাশে নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত নলেজ শেয়ারিং বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নবযোগদানকৃত নবম গ্রেডের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব
মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

চট্টগ্রাম ভেটেরেনারি এন্ড এনিমাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান" কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

চট্টগ্রাম ভেটেরেনারি এন্ড এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে কর্তৃপক্ষের সচিব জনাব আব্দুন নাসের খান-এর সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন।

ড্রাগন ফলে বৃদ্ধি প্রবর্ধক এর ব্যবহার এবং এর সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকি নির্ণয়ে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
জনাব আবু নূর মোঃ শামনুজ্জামান, সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে রাজধানীর একটি খাদ্যস্থাপনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ইশরাত সিদ্দিকা।

ভ্রাম্যমান মোবাইল ল্যাবরেটরির মাধ্যমে তাৎক্ষণাৎ সংগ্রহকৃত খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা করছেন জনাব অভিরূপ সাহা, চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

পোড়াতেল সংগ্রহ করে কিটের মাধ্যমে তাৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের রাজবাড়ী জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার জনাব রফিকুল ইসলাম।

জনাব মোঃ আতিকুর রহমান মজুমদার, পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর নেতৃত্বে রাজধানীতে পথখাবারের দোকান পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক জনাব দিপু পোদ্দার।

পবিত্র মাহে রমজানে পুরান ঢাকার চকবাজার এলাকায় ইফতার বাজার পরিদর্শন করছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষর সদস্য জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমদ-সহ অন্যান্যরা।

পবিত্র মাহে রমজানে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'নিরাপদ ইফতার' কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর পান্থপথে ইফতার বাজার মনিটরিং শেষে বিএফএসএ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে বিশিষ্ট অভিনেতা ও চিকিৎসক ডাঃ এজাজুল ইসলাম।

বিএফএসএ কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে 'Personal Management Information System (PMIS)' শীর্ষক ইনহাউজ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহা: হারুণ-অর-রশীদ, যুগ্ম-সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে রাজধানীর একটি খাদ্যস্থাপনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে কাগজপত্র পরীক্ষা করছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব উম্মে সালিক রুমাইসা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ভোক্তা অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও সিটি কর্পোরেশনসহ আটটি সংস্থার সমন্বয়ে অনুষ্ঠেয় সমন্বিত বাজার মনিটরিং কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জনাব আখতার মামুন, পরিচালক, বিএফএসএ।

মোটেল সৈকত, চট্টগ্রামে আয়োজিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত সিএমপি কমিশনার জনাব কৃষ্ণ পদ রায়-কে ফুল দিয়ে বরণ করছেন কর্তৃপক্ষের মনিটরিং অফিসার ইসফাক ওয়াহেদ বিন রহিম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ ও সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে রাজধানীর একটি খাদ্যস্থাপনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান।

পারিবারিক পর্যায়ে গৃহিণী পর্যায়ে খাদ্যের নিরাপদতা নিয়ে আয়োজিত উঠান বৈঠকে আলোচনা করছেন সিলেট জেলার নিরাপদ খাদ্য অফিসার জনাব সৈয়দ সরফরাজ হোসেন।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের আয়োজনে ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় 'জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব নুরেআলম মিনা, পুলিশ কমিশনার, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ।

পর্যটন-নগরী কক্সবাজারে পথখাবার বিক্রেতাদের মাঝে নিরাপদভাবে খাবার প্রস্তুত ও বিক্রয়ের লক্ষ্যে এপ্রোন, গ্লাভস ও ক্যাপ বিতরণ করে জাইকার অর্থায়নে পরিচালিত STIRC প্রকল্প। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুন নাসের খান, সচিব, বিএফএসএ।

নেত্রকোণা জেলায় অবস্থিত ষড়ঋতু ক্যাফে এন্ড রেস্টুরেন্টে মনিটরিং শেষে খাদ্য ব্যবসায়ীদের জন্য পালনীয় নির্দেশনা সংবলিত পোস্টার প্রদান করেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মানিত সদস্য জনাব নাজমা বেগম, এনডিসি

Amari
DHAKA
UNPARALLELED ASIAN HOSPITALITY IN THE HEART OF DHAKA
SCAN FOR OFFER DETAILS
Amari Dhaka; Owned by Karishma Services Ltd (A sister concern of Doel Group); 47, Road 41, Gulshan 2, Dhaka 1212, Bangladesh; www.amari.com/dhaka; 02550598620
CASCADE
DECK 41
breeze
FIT CENTRE
HI-TECH MEETING & EVENT HALLS
LEVEL - 13 BUFFET RESTAURANT
LOBBY LEVEL 24/7 OPEN CAFE
LEVEL - 15 ROOFTOP RESTAURANT & BAR
LEVEL - 17 THAI SPA
LEVEL - 17 HIGHLY EQUIPPED
LEVEL - G & 14

শেখ হাসনাই রূপকার
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক উপহার
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নিরাপদ খাদ্য ও সুস্থ জীবন কার্যক্রম
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এবং নিখাদ অর্গানিক এগ্রো লিমিটেডের মধ্যে ব্যাংকের গ্রাহকদের নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্যপণ্য উৎপাদনে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের গ্রাহকদের নিরাপদ এবং বিষমুক্ত খাদ্যপণ্য উৎপাদনে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। নিখাদ অর্গানিক এগ্রো লিমিটেডের মাধ্যমে নিরাপদ এবং বিষমুক্ত খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সহ সকল খাদ্য সচেতন নাগরিক, কৃষক ও বিক্রেতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাংক
ওয়েবসাইট: www.pallisanchaybank.gov.bd

DHAKA REGENCY
PREMIER CLUB
Royal Member
Think Privilege, Think Premier Club
A Destination of Indulgence
AT DHAKA REGENCY
Dhaka Regency Premier Club- Country's Largest Hotel Loyalty Program
An Exclusive Privilege Program of Dhaka Regency Hotel & Resort
Membership Services
01713332540 | premierclub@dhakaregency.com

Khana's
SERVING SAFE FOOD
FOR MORE THAN A DECADE
Khana's | All Rights Reserved

EXPERIENCE OUR
GLOBAL FLAVOURS
ELEVATE YOUR CULINARY JOURNEY WITH METICULOUSLY
CRAFTED DISHES AND IMPECCABLE SERVICE AT ELEMENTS
À LA CARTE | BUFFET | LIVE STATIONS | PRIVATE DINING
CALL FOR RESERVATIONS:
LIVE THE INTERCONTINENTAL LIFE
INTERCONTINENTAL
Elements

KFC
"it's finger lickin' good"
KFC
KFC
order online
kfcbd.com
kfcbangladesh
kfcbd_official
kfcbangladesh
KFC Bangladesh App

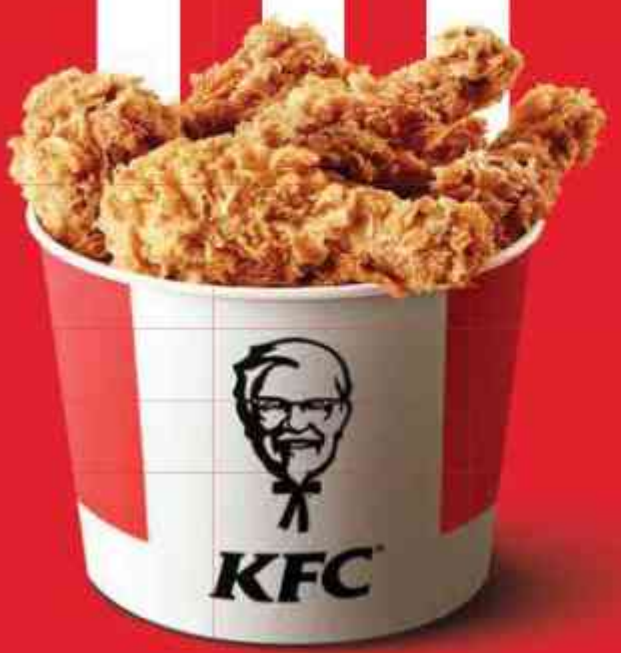

আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য
সেরা মানের উপাদানে তৈরি
রাঁধুনী
গুঁড়া মশলা
বিশ্বস্ত উৎস আর সযত্নে বাছাই করা
সেরা উপাদানে তৈরি রাঁধুনী গুঁড়া মশলায় নিশ্চিত হয়
আপনার ও আপনার পরিবারের সুস্বাস্থ্য।
স্কয়ার
রাঁধুনী
খাঁটি মান, খাঁটি স্বাদ

Whatever our fishes consume,
Whatever the chickens and cows eat,
Whatever the plants get as medicine,
So matters the food you take for treat.

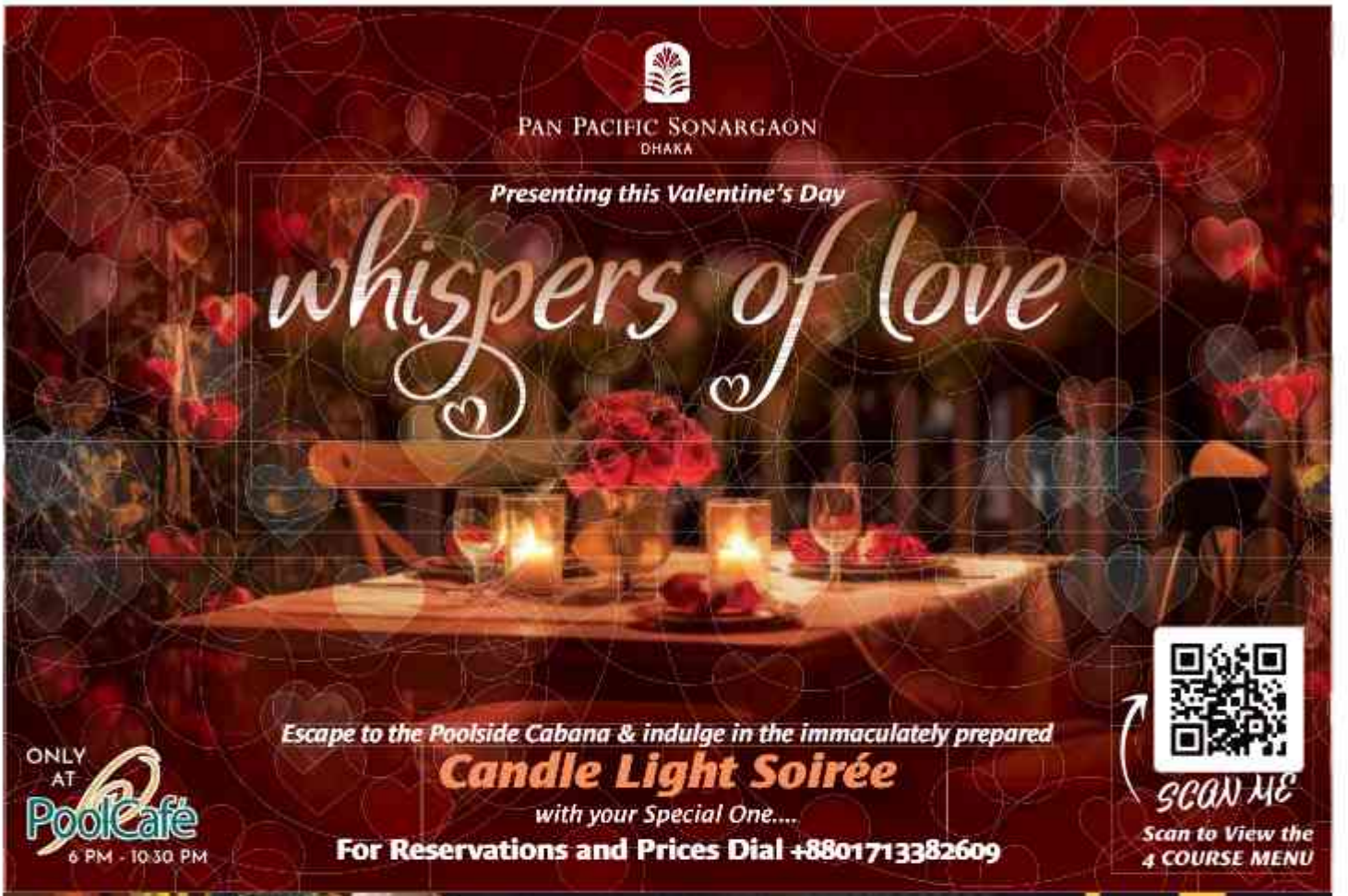

PAN PACIFIC SONARGAON
DHAKA
Presenting this Valentine's Day
whispers of love
Escape to the Poolside Cabana & indulge in the immaculately prepared
Candle Light Soirée
with your Special One....
For Reservations and Prices Dial +8801713382609
ONLY AT
PoolCafé
6 PM - 10:30 PM
SCAN ME
Scan to View the
4 COURSE MENU

OCEAN PARADISE
Hotel & Resort
A+
Excelent
ACHIEVING
excellence
THROUGH TEAMWORK

ভালো কিছু যখন চাই তখনই
আড়ং ডেইরি
ইউ এইচ টি দুধ
UHT Milk
/AarongDairyBRAC
09613 456 456

Freshly BAKED
BREAD & Beyond
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত
Your Favorites, One App Away!
Ordering made simpler & easier with our user-friendly app.
NO ADDED PRESERVATIVES
A+
Excellent
DOWNLOAD OUR APP
Available on the App Store
GET IT ON Google Play
breadandbeyondbd.com
Call us: +8801841321026

CP

C.P. Bangladesh Co., Ltd.

CP Product Meets World-Class Safety Standards

C.P. Bangladesh Co., Ltd. strives for excellence in the production process of CP product, ensuring it adheres to international safety and quality standards. By choosing only high-quality, traceable raw materials, C.P. Bangladesh Co., Ltd. ensures that every CP product maintains superior quality, cleanliness, and safety, always prioritizing consumer health.

The company's commitment to safety starts with stringent control throughout the entire production process, from sourcing raw materials and ingredients to distribution. Emphasizing "food quality and safety," the production uses advanced technology ensuring traceability and instilling confidence in every hygienic and safe product delivered.

CP FIVE STAR BUSINESS

CP Five Star Business is the management of CP Five Star sale points in franchise format, in order to create jobs and build careers to individuals who wants to operate their own business. Further, the Company has expanded CP Five Star business to Vietnam, India, Laos, Cambodia, Philippines, Malaysia, Bangladesh, Myanmar, Pakistan.

The company's has certifications such as GMP, HACCP Food safety (FSSC 22000), HALAL indicative of quality and safety standards being met.

নবাবী ভোজ

স্বাদের আভিজাত্য...

স্বাদের আভিজাত্য

খাবারের গুনগত মান

এবং

পরিমানের ক্ষেত্রে

আমরা আপোষহীন

Baily Road Branch - 1

15 New Bailey Road, 6 Natok Saroni,
Siddheswari, Dhaka - 1000

Baily Road Branch - 2

A.Q.P Shopping Mall. 143/2 New Bailey Road,
33 Natok Saroni, Siddheswari, Dhaka - 1000

Mohammadpur Branch

Nurani Tower, Plot # 24/B, Block # C,
Ring Road, Mohammadpur, Dhaka - 1207

Lalbagh Branch

50 Lalbagh,
In front of Kella Mosjid
of North side of Kella Parking, Dhaka - 1211

01730-599099 nawabivojbd contact@nawabivoj.com www.nawabivoj.com

স্বাদ আর স্বাস্থ্যে
আস্থা রাখি মার্কস - এ

MARKS
Full Cream Milk Powder

সময় যেমনই হোক, আমাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা
আপনাদের ভালো রাখতে, আপনাদের সাথে থাকতে

নেস্‌লে বাংলাদেশ নিশ্চিত করে

✔ আধুনিক প্রোডাকশন কোয়ালিটি ✔ আন্তর্জাতিক মান ✔ সঠিক পুষ্টিমান

Maggi | It all starts with a NESCAFÉ | NIDO | KOKO KRUNCH | Nestlé Everyday

Nestlé Ceregrow | Nestlé MILO | KitKat

Good food, Good life

BENGAL MEAT
One Stop
Protein Solution
Poultry
Mutton
Fish
Order at
bengalmeat.com
or Scan

কিষোয়ান™

ফ্রুটেক্স

সফট্ ড্রিংক পাউডার

নো ক্লান্তি নিমেষেই স্বস্তি...

স্বাদ : অরেঞ্জ ও ম্যাংগো

+8801755679797
+8801755695520

কিষোয়ান গ্রুপ
প্রধান কার্যালয়: আস-সালাম টাওয়ার(৫ম তলা), ৫৭,আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

GARDEN PACKED
Original
Finlay
SINCE 1896
ফিনলে
ইংলিশ ব্রেকফাস্ট টি
কড়া স্বাদে ও সতেজ সুবাসে
চুমুকেই চমৎকার
একটি দিন
অর্ডার করতে
স্ক্যান করুন
GARDEN PACKED
Finlay
English
BREAKFAST
TEA
STRONG TASTE & RICH AROMA
/finlaytea
ফিনলে চা আসল চা

বিশ্বের ১ নম্বর পিৎজা ব্র্যান্ড

Domino's Pizza

নিয়ে এলো

Domino's

Oregano-Rice Meal

রাইস, সালাদ, কোক
কমপ্লিট মিল

মাত্র ৳২৭৯ থেকে শুরু

পাওয়া যাচ্ছে ৬ টি ভিন্ন স্বাদে

ডাউনলোড করুন

Google play

Download on the App Store

Frutika®
ফ্রুটস মানেই ফ্রুটিকা
বাংলাদেশের একমাত্র অ্যাসেপ্টিক পদ্ধতিতে তৈরি
প্রিজারভেটিভ মুক্ত ফ্রুট ড্রিংক
Frutika
Mango Fruit Drink
Frutika
Red Grape Fruit Drink
Frutika
Pulpy
Orange Fruit Drink

COCA-COLA® and CONTOUR BOTTLE are the registered trademarks of The Coca-Cola Company. This is a carbonated beverage.

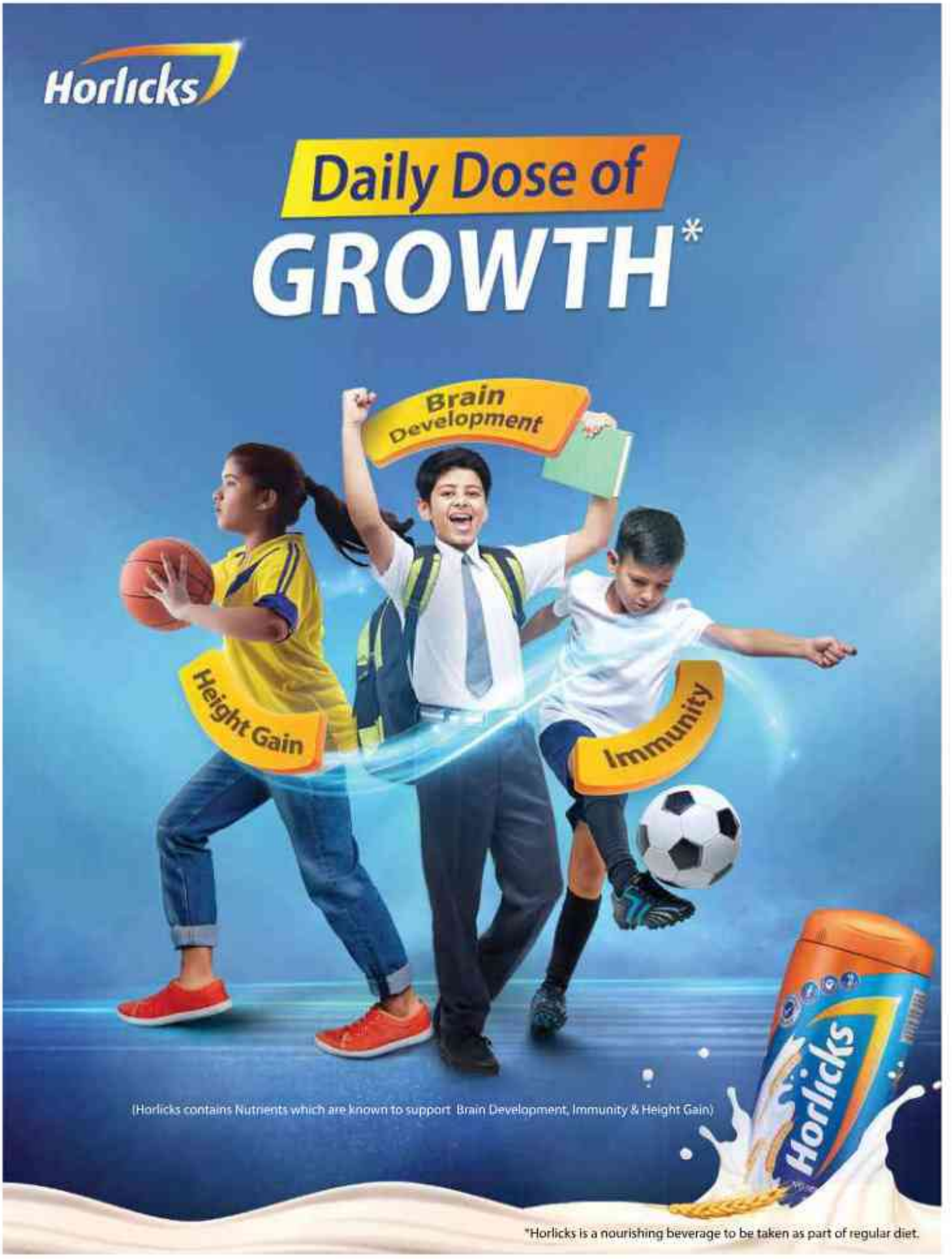

Horlicks
Daily Dose of
GROWTH*
Brain Development
Height Gain
Immunity
(Horlicks contains Nutrients which are known to support Brain Development, Immunity & Height Gain)
Horlicks
*Horlicks is a nourishing beverage to be taken as part of regular diet.

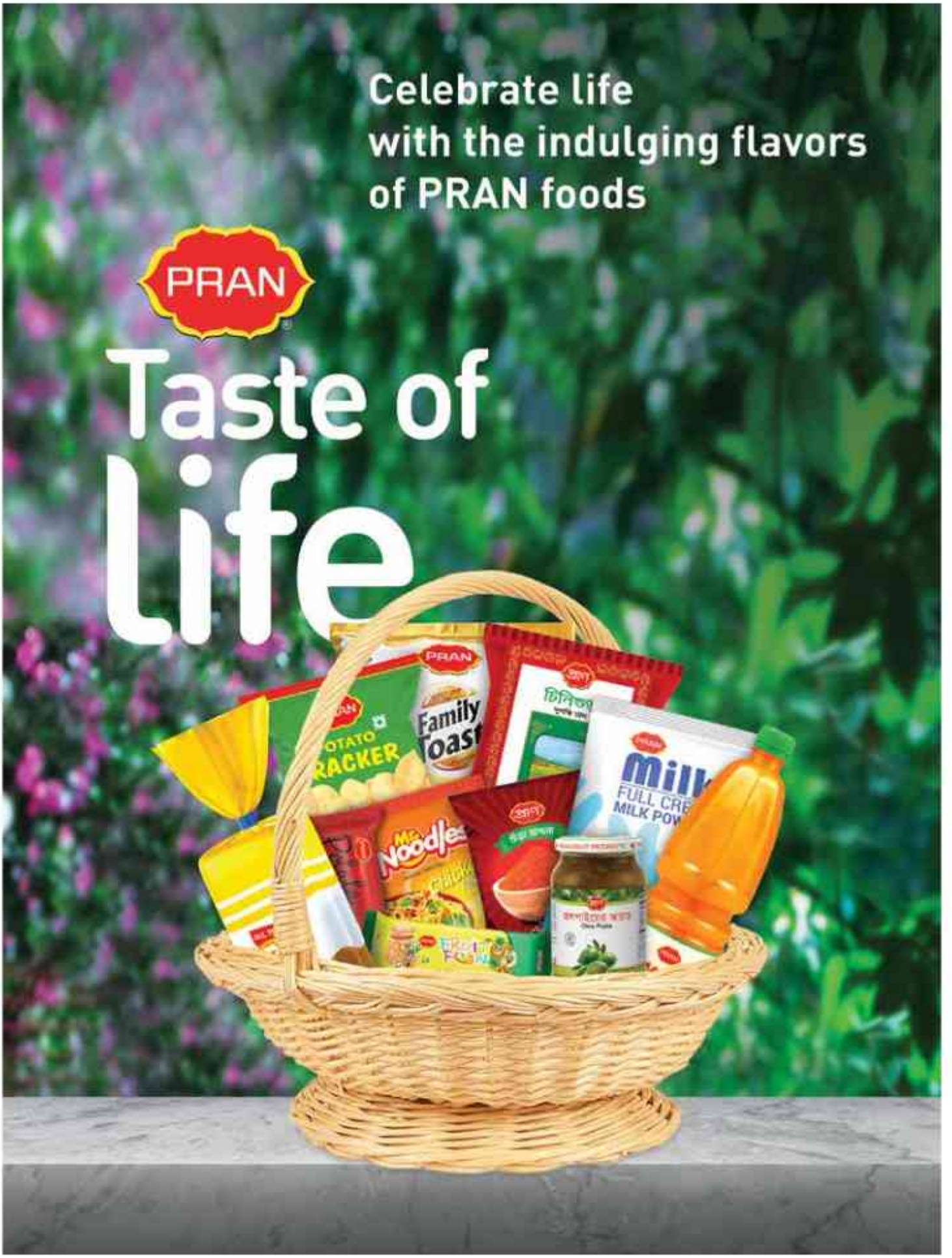

Celebrate life
with the indulging flavors
of PRAN foods
PRAN
Taste of
life

X-group Chain Restaurant and Hospitality Management

Price Quality Service

Since 1992

Jashim Uddin Ahmed

Chairman & Managing Director

About Us

Since 1992, **X-group Chain Restaurant and Hospitality Management** has been a symbol of excellence, renowned for quality food and service. We have 16 branches located all over the prime areas of Dhaka City, each exquisitely designed to blend authenticity with cultural taste. We offer a culinary journey encompassing Thai, Chinese, Indian, Traditional & Continental cuisines. Elevate your events in our well equipped meeting spaces and embrace the trend of ordering food online, with our own food app and delivery system, Foodbite.bd Online. We prioritize towards Halal procedure by maintaing food safety guideline and ensuring your good health.

Our Achivement

A+

খাদ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ মান

উত্তম Excellent

All of our banches are A+ grade Certified by Bangladesh Food Safety Authority (BFSA)

All of our branches are Halal Certified by Islamic Foundation Bangladesh

All of our home made products are BSTI certified, ensuring top-quality standards and compliance.

Our Sister Concerns

Our Contact Details

01755636335-36-37

admin@x-grouprestaurant.com

www.x-grouprestaurant.com

House No 59/A, Road No 27 (Old) and 16 (New), Sat Masjid Road, Dhanmondi, Dhaka, Bangladesh.

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

খাদ্য নিরাপদ রাখার ৫ চাবিকাঠি
মেনে চলি, সুস্থ থাকি

ব্যাকটেরিয়া প্রতিহত করি

প্রচারে ঃ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য